কল্যাণ প্রাপ্তির উপায়

॥ শ্রীহরিঃ ॥

বিষয়-সূচী

বিষয় পৃষ্ঠা সংখ্যা

বিষয়		পৃষ্ঠা সংখ্যা

॥ শ্রী হরিঃ ॥

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

জ্ঞানীর অনির্বচনীয় স্থিতি

অসত্য, হিংসা এবং মৈথুন প্রভৃতি কর্ম স্বীয় বুদ্ধিদ্বারা খারাপ জেনেও মন থেকে যেমন মুছে ফেলা যায় না, ঠিক তেমনি বুদ্ধি বিবেচনায় সংসারকে কল্পিত রূপে নির্ণয় করা সত্ত্বেও মন তা মেনে নেয় না। সাধক এমন অবস্থায় উপনীত হয় এবং এই অবস্থাকে এভাবে ব্যক্ত করা হচ্ছে যে "আমার বিচার বুদ্ধিতে সংসার কল্পিত, এর পর আগে গিয়ে, যখন মনও এই যুক্তিতে বাঁধা পড়ে যায় তখন সংসার কল্পিত ভাবের রূপ গ্রহণ করে। কিন্তু ইহাও কল্পনা ভিন্ন অন্য কিছু নয়। এরপর যখন অভ্যাস বশতঃ এরূপ স্থিতি প্রত্যক্ষভাবে প্রতীয়মান হয়, তখন সাধকের কাছে সংসার চিত্র কখনও কখনও আকাশে তিরবরের ন্যায় (অর্থাৎ আলনা দিয়ে সূর্যরশ্মী এলে তাতে ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র কণিকার ন্যায় ভাসমান যে সকল পদার্থ দেখা যায় তাকে তিরবর বলা হয়) অনুভূত হয় এবং কখনো তা হয় না। আকাশে তিরবর দেখার সময় তিনি জ্ঞানতঃ অনুভব করেন যে "বাস্তবে আকাশে কোন বিকার নেই, বিকারহীন ভাবেই ইহা ভাসমান।" যে সাধকের কাছে ভাসমান বা অভাসমান সমভাবে অনুভূত হয় — সাংসারিক সত্ত্বা তাঁর কাছে কোন সময়েই সত্যরূপে প্রতীয়মান হয় না। এই অবস্থার নাম হচ্ছে "অকল্পিত স্থিতি"। সাধকের এরূপ অবস্থা জ্ঞানের তৃতীয় ভূমিকায় হয়ে থাকে, কিন্তু এই অবস্থাতেও এই স্থিতির জ্ঞাতা এক "ধর্মী" থেকে যায়। এই তৃতীয় ভূমিকায় সাধনের প্রগাঢ়তার জন্য সাধকের ব্যবহারিক কাজ-কর্মে ভূল হওয়া সম্ভব। কিন্তু ভগবদ্-প্রাপ্তিরূপ চতুর্থ ভূমিকায় সাধারণতঃ কোনও ভূল ভ্রান্তি হয় না, সেই অবস্থায় তাঁর দ্বারা ন্যায়যুক্ত সমস্ত কার্য

সুচারুরূপে স্বাভাবিকভাবে সঙ্কল্প ব্যাতিরেকে হতে থাকে । যেমন শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন –

যস্য সর্বে সমারম্ভাঃ কামসংকল্পবর্জিতাঃ ।
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্মাণং তমাহুঃ পণ্ডিতং বুধাঃ ॥

"যার সম্পূর্ণ কার্য্য কামনা এবং সংস্কল্প রহিত, জ্ঞানরূপ অগ্নিদারা ভস্মিভূত কর্মযুক্ত সেই পুরুষকে জ্ঞানীগণও পণ্ডিত বলে থাকেন ।" পঞ্চম ভূমিকায় ব্যাবহারিক কার্য্যে ভূল হতে পারে, কিন্তু তৃতীয় ভূমিকাযুক্ত পুরুষের অবস্থা সাধনরূপা এবং পঞ্চম ভূমিকায় অবস্থিত পুরুষের স্থিতি হচ্ছে স্বাভাবিক । তৃতীয় ভূমিকার পরে "সাক্ষাৎকার" হয়ে থাকে । একে মুক্তি বলা হয়ে থাকে । জৈন মতাবলম্বী কেউ কেউ মৃত্যুর পরে মুক্তি হয়ে থাকে বলে মানে, কিন্তু আমাদের বেদান্তের সিদ্ধান্তে জীবন্মুক্তিও মানা হয়েছে, মৃত্যুর পূর্বেও জ্ঞান হতে পারে । এই অবস্থায় তাঁর শরীর এবং শরীরদ্বারা কৃত কর্ম সমূহ কেবলমাত্র লোক দেখানোর জন্যই সম্পাদিত হয়ে এক লৌকিক ব্যাপার হয়ে রয়ে যায় । ওতে কোন ধর্মী থাকে না । যদি কেউ বলে যে ওতে যখন চেতনই থাকছে না তাহলে, ক্রিয়া কি ভাবে হচ্ছে ? এর উত্তরে বলা যায় যে, সমষ্টিগত চেতন ত কোথাও চলে যায় নি, ব্যষ্টি-ভাব থেকে সরে তার স্থিতি শুদ্ধ চেতনে হয়ে গেছে । সমষ্টি-চেতনের সত্তা-স্ফূর্তিতে ক্রিয়া হয়ে থাকে, এতে কোন বাধা পড়ে না । এরপর কেউ যদি আবার প্রশ্ন করে যে, চেতন তো জড় পদার্থে এবং মৃতের দেহেও রয়েছে, ওদের মধ্যে ক্রিয়া কেন হয় না ? এর উত্তর হচ্ছে ওদের মধ্যে ক্রিয়া না হবার কারণ হচ্ছে অন্তঃকরণের অভাব । যদি যোগীব্যক্তি এক চিত্তের একাধিক কল্পনা করে কোন মৃতদেহে কিংবা জড় পদার্থে চিত্তের প্রবেশ করিয়ে দেয় তাহলে ওর মধ্যেও ক্রিয়া হওয়া সম্ভব ।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, জ্ঞানী কে ? তাহলে এর উত্তরে কিছুই বলা যায় না । যদি শরীরকে জ্ঞানী বলা হয়, তাহলে জড় শরীরের জ্ঞানী হওয়া সম্ভব নয়, যদি জীবকে জ্ঞানী বলেন তাহলে জ্ঞানোত্তরকালে সেই চেতনের "জীব সংজ্ঞা" থাকে না, আর যদি শুদ্ধ

চেতনকে জ্ঞানী বলেন তাহলে শুদ্ধ চেতন তো কখনও অজ্ঞানী হয় নি। কাজেই জ্ঞানী কে, তা বলতে পারা যায় না।

জ্ঞানীর কল্পনা হচ্ছে অজ্ঞানীর অন্তঃকরণে, শুদ্ধ চেতনের দৃষ্টিতে দ্বিতীয় কোন পদার্থই নেই। জ্ঞানীর যখন দৃষ্টিই নেই, তা হলে সৃষ্টি আর কিভাবে থাকতে পারে! অজ্ঞানীগণ এভাবে কল্পনা করে থাকেন যে, এই শরীরে যে জীব ছিল সে সমষ্টিগত চেতনে একীভূত হয়ে গেছে, সমষ্টি চেতনের যে অংশ অন্তঃকরণে আরোপিত হয়ে রয়েছে সেই অন্তঃকরণ সহিত সেই চেতনের অংশের নাম হচ্ছে জ্ঞানী। বাস্তবিক দৃষ্টিতে জ্ঞানীর সত্যকার সংজ্ঞা কেউ বাণীদ্বারা বলতে পারে না, কেননা জ্ঞানীর দৃষ্টিতে জ্ঞানীপনাও থাকে না। জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর সংজ্ঞা শুধুমাত্র লোকশিক্ষার জন্য রয়েছে এবং কেবলমাত্র অজ্ঞানীদের মনেই এর কল্পনা করা হয়ে থাকে। যেমন, গুনাতীত পুরুষদের "লক্ষণ" বর্ণনা করা হয়ে থাকে। কিন্তু যে বস্তুত তিন গুণের অতীত তার আবার লক্ষণ (চিহ্ন) কি ? অন্তঃকরণ থেকে লক্ষণের (চিহ্ন) উদ্ভব এবং অন্তঃকরণ থেকে উদ্ভূত ক্রিয়া হচ্ছে ত্রিগুণাত্মিকা। আসল কথা হল এই যে, গুনাতীতকে বোঝাবার জন্য অন্তঃকরণের ক্রিয়ার লক্ষণের বর্ণনা করা হয়ে থাকে। যেমন শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে ঃ

প্রকাশং চ প্রবৃত্তিং মোহমেব চ পান্ডব।
ন দ্বেষ্টি সংপ্রবৃত্তানি ন নিবৃত্তানি কাঙ্ক্ষতি ॥

এর পরের ২৩, ২৪ এবং ২৫ নং শ্লোকেও গুনাতীতের লক্ষণ (চিহ্ন) নির্দেশ করা হয়েছে। উপরিউক্ত ২২ শ্লোকের "প্রকাশ" শব্দের দ্বারা অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয় সমূহে উজ্জ্বলতা, প্রবৃত্তি শব্দের দ্বারা চেষ্টা এবং মোহ দ্বারা নিদ্রা, আলস্য (প্রমাদ কিংবা অজ্ঞান নহে) অথবা সাংসারিক জ্ঞানে সুসুপ্তির ন্যায় অবস্থা বোঝা উচিত। অন্তঃকরণে কোন "ধর্মী" না থাকার জন্য "দ্বেষ" এবং "আকাঙ্খা" আর কার হবে ? যেহেতু রাগ-দ্বেষ এবং হর্ষ-শোক হয় না কাজেই ইহা প্রমানিত হয় যে ওতে কোন "ধর্মী" থাকে না। যদি জড় অন্তঃকরণের সঙ্গে সমষ্টিগত চেতনের

সংযোগ থাকত তা হলে তো জড় অন্তঃকরণেও রাগ-দ্বেষ প্রভৃতি বিকার হওয়া সম্ভব হত, কিন্তু সমষ্টিগত চেতনের সঙ্গে অন্তঃকরণের সম্বন্ধ থাকে না, শুধুমাত্র তার সত্ত্বা স্ফূরণের ফলে সচেষ্ট হয়। যে পর্য্যন্ত সাংসারিক চিত্র রয়েছে ততক্ষণ পর্য্যন্ত এ সমস্ত লক্ষ্য করা হয় এবং তা সাধকের পক্ষে আদর্শ উপায়স্বরূপ, সেইজন্য শাস্ত্রে এ সমস্তের উল্লেখ রয়েছে।

গুনাতীতের বাস্তবিক অবস্থা অন্য কেউ জানতে পারে না এবং বলতেও পারে না, এ হচ্ছে স্বয়ংবেদ্য (অর্থাৎ নিজে থেকে নিজে জানার মত) স্থিতি। কিন্তু যদি কেউ এভাবে পরীক্ষা করে যে, আমার মধ্যে জ্ঞানীর লক্ষণ আছে কি নেই ? তাহলে বোঝা উচিত যে তার জ্ঞান নেই, লক্ষণসমূহ খোঁজ করার ফলে এটা প্রমানিত হয় যে তার স্থিতি শরীরে রয়েছে। সেই জ্ঞানীর সত্ত্বা ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন, তা না হলে কে অনুসন্ধানকারী এবং স্থিতি-ই বা কার ? যদি অনুসন্ধানই করতে হয় তাহলে শুধুমাত্র শরীরেই কেন খুঁজবে, পাষাণ বা বৃক্ষের মধ্যে তা কেন খুঁজবে না ? শুধুমাত্র শরীরে খোঁজার ফলে শরীরে তার অহংভাব প্রমানিত হয়। এর দ্বারা তো সে নিজে নিজেই ক্ষুদ্রতা প্রাপ্ত হয়ে রয়েছে। অবশ্য যদি সাধক নিজেকে শরীর থেকে আলাদা ভেবে (দ্রষ্টা হয়ে) পাথর এবং বৃক্ষসমূহের সঙ্গে নিজের শরীরের সাদৃশ্য মনে করে বিচার-বিবেচনা করে তাহলে এর ফলে তাঁর লাভ হতে পারে। যেমন শ্রীমদ্ভগদ্গীতায় বলা হয়েছে ঃ

নান্যং গুনেভ্যঃ কর্তারং যদা দ্রষ্টানুপস্যতি ।
গুনেভ্যস্চ্য পরং বেত্তি মদ্ভাবং সোহধিগচ্ছতি॥ (গীতা১৪/১৯)

যে কালে দ্রষ্টা তিন গুন ভিন্ন অন্য কাউকে কর্ত্তা দেখে না, অর্থাৎ গুণই গুণে ঘটেছে এরূপ দেখে থাকে এবং তিনগুণের অতীত আমী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে তত্ত্বের সঙ্গে জানে, সেই কালে সেই পুরুষ আমার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়ে যায়।

কিন্তু যে বলে–"আমার জ্ঞান হয় নি", সেও জ্ঞানী নয়, কেননা সে স্পষ্ট বলছে। যে বলে–"আমার জ্ঞান হয়ে গেছে" তাকেও জ্ঞানী

বলে মানা উচিত নয়, কেননা এরূপ বলার ফলে জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় – এই তিন পদার্থ প্রমাণিত হয়, আর যে এরূপ বলে যে, "জ্ঞান হয়েছে কি না আমি জানি না" সেও জ্ঞানী নয়, কেননা জ্ঞানোত্তরকালে এই ধরনের সন্দেহ থাকতে পারে না। তা হলে জ্ঞানী বলতে আসলে কি ? এর উত্তর পাওয়া যায় না। সেইজন্য এই স্থিতিকে অনির্বচনীয় বলা হয়।

জ্ঞানের দুর্লভতা

কোন শ্রদ্ধাবান পুরুষের সামনেও বাস্তবিক দৃষ্টিতে মহাপুরুষের দ্বারা একথা বলা যায় না যে "আমি জ্ঞান প্রাপ্ত হয়েছি", কেননা এই কথা দ্বারা জ্ঞানে দোষ ঘটে। বাস্তবিক পক্ষে পূর্ণ শ্রদ্ধাবানের পক্ষে মহাপুরুষের কাছে এ ধরণের প্রশ্নই করা যেতে পারে না যে "আপনি জ্ঞানী কি না ?" যেখানে এ ধরণের প্রশ্ন করা হয় সেখানে শ্রদ্ধায় ত্রুটি রয়েছে বলে বোঝা উচিত এবং মহাপুরুষের নিকট এ ধরণের প্রশ্ন করলে প্রশ্নকর্ত্তার কিছু ক্ষতিই হয়। যদি মহাপুরুষ এরূপ বলেন যে আমি জ্ঞানী নই তাহলেও শ্রদ্ধা কমে যায়। আসলে, আমি অজ্ঞানী বা আমি জ্ঞানী এই দুইয়ের মধ্যে কোনটাই মহাপুরুষের পক্ষে বলা সম্ভব হয়, যদি তিনি নিজেকে অজ্ঞানী বলেন তাহলে মিথ্যা বলার দোষ এসে যায় এবং যদি জ্ঞানী বলেন তাহলে ভেদ দৃষ্টির দোষ হয়। সেজন্য তিনি এরূপও বলেন না যে আমি ব্রহ্মকে জানি কিংবা এরূপ বলেন না যে আমি জানি না। যিনি ব্রহ্মকে জানেন তার দ্বারা এরূপ বলা সম্ভব নয়। কিন্তু তিনি যে জানেন না, তাও নয়। শ্রুতি বলছে ঃ–

নহেং মন্যে সুবেদেতি নো ন বেদেতি বেদ চ।
যো নস্তদ্বেদ তদ্বেদ নো ন বেদতি বেদ চ ॥
যস্যামতং তস্য মতং মতং যস্য ন বেদ সঃ।
অবিজ্ঞাতং বিজানতাং বিজ্ঞাতমবিজানতাম্ ॥

(কেনিয়োপনিষদ্ ২/২-৩)

সেইজন্য একে অনির্বচনীয় স্থিতি বলা হয় ; এজন্য বেদে দু-ভাবেই বলা হয়েছে এবং এজন্য মহাপুরুষগণ এরূপ বলেন না যে আমার প্রাপ্তি হয়েছে। এই সম্বন্ধে তারা স্বয়ং নিজের দিক থেকে কিছুই না বলে বেদ শাস্ত্রের দিকে সংকেত করে থাকেন। কিন্তু এও বলেন না যে আমার প্রাপ্তি হয় নি। প্রকৃতপক্ষে এরূপ বলা উত্তম আচরণযুক্ত

আচার্য্য কিংবা শীর্ষ স্থানীয় পুরুষদের পক্ষেও যোগ্য নহে । কেননা এর ফলে তাঁর অনুগামীদের পক্ষে ব্রহ্ম-প্রাপ্তিকে অত্যন্ত কঠিন মনে করে নিরাশ হওয়া সম্ভব । যেমন, আজ যদি কোন পরম সম্মানীয় পুরুষ এরূপ বলেন যে আমার প্রাপ্তি হয়নি, আমি স্বয়ং প্রাপ্তির জন্য উৎসুক, তা এরূপ বলার ফলে তাঁর অনুগামীগণ হয় এরূপ মনে করবেন যে, যখন এঁরই প্রাপ্তি ঘটেনি তা হলে আমাদের কিভাবে হবে, কিংবা এরূপ বুঝে নেন যে, সম্মানীয় পুরুষের বাক্য এই অংশে হয় অযথার্থ কিংবা আসল স্থিতিকে এ লুকোচ্ছে, এবং এই ধরণের দোষারোপনের ফলে সেই লোকদের শ্রদ্ধা কিছু কমতে পারে । অতএব এ বিষয়ে শুধু মৌন থাকা উচিত । এই সমস্ত কথায় বিচার-বিবেচনা করলে এটিই প্রমাণিত হয় যে মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে জ্ঞানী কিংবা অজ্ঞানী, কোন শব্দেরই প্রয়োগ তাদের নিজের মুখ থেকে হতে পারে না । এ সত্ত্বেও মহাপুরুষ যদি অজ্ঞানী সাধককে সজ্ঞান করার জন্য তাকে জ্ঞানোপদেশ দেবার সময় তাঁর ভাবনা অনুসারে নিজের মধ্যে জ্ঞানীর কল্পনা করে নিজেকে জ্ঞানী শব্দ দ্বারা সম্বোধন করেন তাহলেও এতে কোন ক্ষতি নেই, বাস্তবিক পক্ষে তাঁর এরূপ বলাও সাধকের দৃষ্টিকোন থেকেই হয়ে থাকে এবং এরূপ সেই সাধকের সামনেই বলা সম্ভব যে পূর্ণ শ্রদ্ধাবান এবং পরম বিশ্বাসী, মহাপুরুষের শব্দ শোনামাত্র যে সেরূপ হতে পারে এবং মহাপুরুষ যে স্থিতির বর্ণনা করেন সেই স্থিতিতে স্থিত হয়ে যায় । এই পরিপ্রেক্ষিতে বলা যেতে পারে যে যার পূর্ণ শ্রদ্ধা-বিশ্বাস রয়েছে, কিন্তু সেরকম স্থিতি হচ্ছে না, তাহলে সে নিরীহ শ্রদ্ধাবান সাধক কি করবে ? এ ঠিক, কিন্তু সাধকের জন্য এটা পরম আবশ্যক যে এরূপ শোনামাত্র সে এক ব্রহ্মে বিশ্বাসী হয়ে শুধু তাঁর প্রাপ্তির জন্য পূর্ণমাত্রায় তৎপর হয়ে যায়, যে পর্য্যন্ত তাঁর প্রাপ্তি না হয় ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁর জন্য পরম ব্যাকুল থাকে । যেমন সন্ধান জানে এমন কারও দ্বারা যদি কোন লোক জানতে পারে যে তার বাড়িতে ধন পোঁতা রয়েছে তাহলে সে তা খুঁড়ে বের করার জন্য ব্যাকুল হয়ে পড়ে । যদি সেই সময় তার কাছে বাইরের কোন লোক বসে থাকে তাহলে সে অন্তর থেকে এটাই চায় যে, এই সব লোক কখন

সরবে, কখন আমি একলা হব এবং কখন এই পোঁতা ধন বের করে হস্তগত করব। এই প্রকারে সাধক এরূপ ভাবে যে আমার সাধনায় বাধাদানকারী আসক্তি এবং অজ্ঞানতা দোষ কখন দূর হবে এবং কখন আমি আমার পরম ধন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হবো। যতই দেরী হতে থাকে, ততই তার ব্যাকুলতা এবং উৎকণ্ঠা উত্তরোত্তর প্রবল হতে থাকে এবং সে সেই বিলম্ব সইতে পারে না। যদি এই ধরনের সাধকের সামনে মহাপুরুষ স্পটতঃ নিজকে জ্ঞানী বলে স্বীকার করে নেন তাহলেও কোন ক্ষতি নেই, কিন্তু এর চেয়ে নিম্নশ্রেনীর সাধক এবং অপূর্ণ প্রেমীদের সামনে এরূপ বললে সেই মহাপুরুষের তো কোন ক্ষতি হয় না, কিন্তু অনধিকারী হবার জন্য সেই শ্রবণকারীর পারমার্থিক বিষয়ে ক্ষতি হতে পারে। যদি এই সমস্ত কথা সকলের সামনে স্পষ্ট করে বলার মত হোত তাহলে শাস্ত্রে একে পরম গোপনীয় বলা হত না এবং শুধু অধিকারীগণকেই বলা উচিত এরূপ বিধান থাকত না।

যদি কেউ প্রশ্ন করে যে মহাপুরুষের পরীক্ষা কি ভাবে করা যাবে এবং পরীক্ষা ছাড়াই যদি কোন অযোগ্য ব্যক্তিকে গুরু বা উপদেশক মানা হয় তাহলে এতে বরঞ্চ উলটো ক্ষতির কথা শাস্ত্রে বলা হয়েছে। যদিও এই প্রশ্ন এবং শাস্ত্রের কথন ঠিক, কিন্তু যার সঙ্গ করলে পরমাত্মায়, সেই মহাপুরুষে এবং শাস্ত্রে শ্রদ্ধা উৎপন্ন হয়, তাকে গুরু বা উপদেশক মানলে কোন ক্ষতি নেই। যদি কেউ পূর্ণ নাও হন, তাহলেও তাঁর যতদূর জ্ঞান (জানা) রয়েছে ততদূর তিনি পৌঁছে দিতে পারেন (এই দৃষ্টিতে মহাপুরুষের সঙ্গকারী সাধকদের সঙ্গ করাও উত্তম এবং লাভদায়ক) এর পরে পরমাত্মা স্বয়ং ব্যবস্থা করে থাকেন। সাধকের পরমাত্মা-পরায়ণ হওয়া প্রয়োজন, শুধুমাত্র শ্রীপরমাত্মার শরণ নিলেই সব কিছু হতে পারে। শ্রীভগবান বলেছেন :-

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥

অর্থাৎ "অনন্য ভাবে আমাতে স্থিত হয়ে যে ভক্তজন আমার পরমেশ্বরের নিরন্তর চিন্তন করতে করতে নিস্কামভাবে ভজনা করে থাকে সেই নিত্য একীভাবে আমাতে স্থিত পুরুষদের যোগক্ষেম আমি স্বয়ং বহন করে থাকি ।" সংসারেও এরূপ দেখা যায় যে যদি কেউ কারও ওপর নির্ভর হয়ে যায় তাহলে তার সমস্ত দায়িত্ব সেই নিয়ে নেয়, যেমন, বাচ্চাছেলে যে পর্য্যন্ত মাতৃপরায়ণ থাকে, সে পর্য্যন্ত তার রক্ষার এবং দেখাশোনার সব দায়িত্ব মা নিজের উপর নিয়ে থাকে । যে পর্য্যন্ত ছেলে বড় হয়ে স্বতন্ত্র না হয়ে যায়, যে পর্য্যন্ত মাতা-পিতার প্রতি তাঁর নির্ভরতা থাকে এবং সে পর্য্যন্ত মাতা-পিতার উপরই তাঁর পূর্ণ দায়িত্ব ন্যস্ত থাকে । এরূপে কেবলমাত্র এক পরমাত্মার শরণ নিলেই সকল কার্য্য সিদ্ধ হতে পারে । কিন্তু শরণ নেওয়া হচ্ছে সাধকের কাজ । শরণ গ্রহণ করার পর স্বয়ং প্রভু তার সমস্ত দায়িত্বের ভার গ্রহণ করে থাকেন । অতএব কল্যাণকামী প্রত্যেক সাধকের উচিত পরমাত্মার শরণ গ্রহণ করা ।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

ভ্রম অনাদি এবং সান্ত

আত্মা স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ হবার দরুণ তাঁর জ্ঞানলাভ নিষ্প্রয়োজন এবং তার প্রাপ্তিতে কোন পরিশ্রম কিংবা যত্ন (প্রচেষ্টা) করবারও আবশ্যকতা নেই। কোন অপ্রাপ্ত বস্তুকে লাভ করার জন্য পরিশ্রম এবং প্রয়াস করার প্রয়োজন হয় কিন্তু এখানে তো শুধুমাত্র নিত্যপ্রাপ্ত ব্রহ্মের অপ্রাপ্তির যে ভ্রম রয়েছে, শুধু সেই ভ্রমকে মেটানোই হচ্ছে কর্তব্য। বাস্তবে ব্রহ্মে এই ভ্রম নেই। এই ভ্রম হচ্ছে তারই মধ্যে যে এই সংসারের বিকারকে নিত্য বলে মানে। বাস্তবে ব্রহ্মে ভুল না হবার দরুণ তা মেটাবার জন্য পরিশ্রম করাও হচ্ছে ভ্রম, কিন্তু যে পর্য্যন্ত ভুল রয়েছে সে পর্য্যন্ত ভুল কে মেটাবার জন্য সাধনা করা উচিৎ, অবশ্যই সেই সকল পুরুষদের, যারা এই ভুলে রয়েছে। যে এই ভুল মেনে রেখেছে তার ক্ষেত্রে এটা অনাদিকাল থেকে রয়েছে। এরূপ বলা হয়ে থাকে যে, যা অনাদিকাল থেকে রয়েছে তার অন্ত হয় না। কিন্তু এটা ঠিক নয়। কেননা, ভুল লুপ্ত হবার জন্যই রয়েছে, যদি ভুল থেকে থাকে তাহলে তার অন্ত হওয়াও আবশ্যক। যদি এরূপ মানা হয় যে, এটা সান্ত (অন্ত) নয়, তাহলে তো কাহারও "প্রাপ্তি" হতে পারে না। কাজেই এ অবশ্যই অনাদি এবং সান্ত। যদি এরূপ মানা হয় যে এই ভুল অনাদিকাল থেকে নয়, পরে (কালক্রমে) হয়েছে ; তাহলে এতে তিনটি দোষ এসে যায় — প্রথমত, তাহলে "প্রাপ্ত" পুরুষদের পুনরায় ভুলে পড়ে যাওয়া সম্ভব, দ্বিতীয়তঃ সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরে দোষ আসে এবং তৃতীয়তঃ নূতন জীবসমূহের সৃষ্টি হওয়া সম্ভব। এই কারণে এটা নিঃসন্দেহে অনাদি এবং সান্ত বলে স্থিরকৃত হল। বাস্তবে কালের কল্পনাও হচ্ছে মায়ার মধ্যে, কেননা ব্রহ্ম হচ্ছে শুদ্ধ এবং কালাতীত। বেদ, শাস্ত্র এবং তত্ত্ববেত্তা মহাপুরুষদেরও এই উক্তি যে, এক শুদ্ধবোধ জ্ঞানস্বরূপ

পরমাত্মা ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই, কিন্তু কোনও ব্যক্তিদ্বারা "সংসার অসৎ" এরূপ বলা উচিৎ নয় ; কেননা বাস্তবে এরূপ (বাক্যের দ্বারা) বলা যায় না। সংসারকে অসৎ মানলে সংসারের রচয়িতা সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর, বিধি-নিষেধাত্মক শাস্ত্র, লোক-পরলোক এবং পাপ-পুণ্য ইত্যাদি ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয় এবং এই সকলকে ব্যর্থ বলা কিংবা মানার অধিকার নেই। যে বাস্তবিকতায় শুদ্ধব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কিছুরই অত্যন্ত অভাব রয়েছে তার দ্বারা তো কিছু বলা যেতে পারে না, সেখানেই বলা হতে পারে, যেখানে অজ্ঞান রয়েছে এবং যেখানে বলতে পারা যায় সেখানে স্রষ্টা সংসার এবং শাস্ত্র প্রভৃতি সবই সত্য এবং এই সকলকে সত্য বলে মেনে নিয়েই শাস্ত্রানুকুল আচরণ করা উচিৎ। সাত্বিক আচরণ এবং ভগবানের বিশুদ্ধ ভক্তির ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে যে সময় ভ্রম মিটে যায় সেই সময় সাধক কৃতকৃত্য হয়ে যায়। এটাই হচ্ছে পরমাত্মা-প্রাপ্তি।

॥ শ্রী হরি ॥

নিরাকার-সাকার তত্ত্ব

এক শুদ্ধ ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর যা কিছু বিরাজমান বাস্তবে তার অস্তিত্ব নেই, কেবল স্বপ্নের ন্যায় প্রতীত হচ্ছে। বেদ, বেদান্ত এবং উপনিষদের এই হচ্ছে সর্ব্বোচ্চ সিদ্ধান্ত, এই হচ্ছে স্বামী শ্রীশংকরাচার্য্য মহারাজের মত এবং এটাই হচ্ছে বাস্তবিক ন্যায়সিদ্ধ সিদ্ধান্ত, কিন্তু এই কথাটি এত মহৎ এবং গোপনীয় যে, অকস্মাৎ লঘুভাবে তা প্রকাশ করা অনুচিত। এই সিদ্ধান্তের বক্তা এবং শ্রোতা খুব অল্প লোকই হয়ে থাকেন, এ বলার সেই অধিকারী যে স্বয়ং এই স্থিতিতে রয়েছে এবং শোনবারও সেই অধিকারী, যে শোনার সঙ্গে সঙ্গে এই স্থিতিতে অবস্থান করে। যে এই ধরনের নয়, তার বলারও অধিকার নেই এবং শোনারও অধিকার নেই। যাদের রাগ-দ্বেষ হয়, যারা সাংসারিক লাভ-ক্ষতিতে সুখী-দুঃখী হয়, যারা সুখ-দুঃখকে ভিন্ন-ভিন্ন অনুভব করে এবং যারা বিষয়লোলুপ এবং ইন্দ্রিয়পরায়ণ ; তাদের তো এই সিদ্ধান্তের উপদেশের ফলে উল্টো ক্ষতিও হতে পারে। তারা এরূপ ভেবে নেন যে, যখন সংসার হচ্ছে স্বপ্নের ন্যায় কাজেই অসত্য, ব্যাভিচার, হিংসা, ছলনা, কপটতা প্রভৃতি সমস্তই হচ্ছে স্বপ্নবৎ। যা খুসি কর, কোন ক্ষতি হবে না। এরূপ ভেবে নিয়ে তারা পরিশ্রমসাধ্য সৎকর্মের পরিত্যাগ করে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাপাচারণে লেগে পড়ে ; কেননা সৎকর্ম সমূহ করার চাইতে তা পরিত্যাগ করা এবং পাপকর্মে প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ। সেইজন্য অনধিকারীর কাছে এই সিদ্ধান্তের উপদেশ না দেবার জন্য শাস্ত্রের আজ্ঞা রয়েছে ; কেননা অনধিকারী ব্যক্তিগণ এই সিদ্ধান্তকে যথাযথভাবে না বুঝে সৎকর্ম পরিত্যাগ করে, জ্ঞানের প্রাপ্তি তাদের হয় না, ফলে তারা উভয়ভ্রষ্ট হয়ে যান। এই শ্লোকটি অতি প্রসিদ্ধ যে :—

ব্রহ্মজ্ঞান উপজ্যো নহীঁ, কর্ম দিয়ে ছিটকায় ।
'তুলসী' ঐসী আত্মা, সহজ নরকমেঁ জায় ॥

অর্থাৎ সন্ত তুলসীদাসজী মহারাজ বলেছেন যে, ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করেই কর্মত্যাগ করে এরূপ জীবকে নরকে যেতে হবে ।

এইজন্য শ্রীভগবান গীতায় বলেছেন ঃ-

ন বুদ্ধিভেদং জনয়েদজ্ঞানাং কর্মসংঙ্গিনাম ।
যোষয়েৎ সর্বকর্মাণী বিদ্বান্ যুক্তঃ সমাচরন্ ॥

"জ্ঞানী পুরুষের উচিৎ যে, কর্মে আসক্তিযুক্ত অজ্ঞানীদের বুদ্ধিতে বিভেদ অর্থাৎ কর্মে যেন অশ্রদ্ধা উৎপন্ন না করান, উপরন্তু নিজে পরমাত্মার স্বরূপে স্তিতি হয়ে সমস্ত কর্ম নিজে করতে থেকে তাদের দিয়েও যেন সেরূপ কর্ম করান ।

জ্ঞানী এবং অজ্ঞানীর কর্মে ইহাই তফাৎ যে জ্ঞানীর কর্ম অনাসক্ত ভাবে স্বাভাবিকরূপে হয়ে থাকে এবং অজ্ঞানীর কর্ম হয় আসক্তি নিয়ে । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে ঃ-

সক্তাঃ কর্মণ্যবিদ্বাংসো যথা কুর্বন্তি ভারত ।
কুর্য্যাদ্বিদ্বাংস্তরথাসক্তশ্চিকীর্ষু লোকসংগ্রহম্ ॥ (গীতা ২/২৫)

"হে অর্জুন, কর্মে আসক্তিযুক্ত অজ্ঞানীগণ যে ভাবে কর্ম করেন, সেইরূপে আসক্তি না রেখে জ্ঞানীগণও যেন লোকশিক্ষার জন্য কর্ম করেন ।"

লোকে বলতে পারেন যে, যখন এক শুদ্ধ ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই তাহলে এর ফলে সৃষ্টি এবং সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বরেরও অনস্তিত্ব স্বীকৃত হয় এবং যদি তাই হয় তাহলে তাদের প্রতিপাদনকারী প্রমাণভূত শাস্ত্র এবং প্রত্যক্ষ দৃষ্টিগোচর এই সৃষ্টির কি দশা হবে ? এর উত্তর এই যে, যেমন আকাশ হচ্ছে নিরাকার, আকাশে কোথাও কোন আকার নেই, কিন্তু কখনও কখনও আকাশে টুকঁরো মেঘ চোখে পড়ে যায় ; সেই টুকরো মেঘ আকাশেই উৎপন্ন হয়, ওতেই চোখে পড়ে, এবং শেষে ওই আকাশেই তা মিশে যায় । আকাশের বাস্তবিক স্থিতিতে কোন তফাৎ

নেই, কিন্তু আকাশের যেটুকু অংশ মেঘ দ্বারা আবৃত হয়, সেই অংশে তা এক বিশেষরূপে দেখা যায় এবং তাতে বৃষ্টি প্রভৃতির ক্রিয়াও হয়ে থাকে।

এরূপ, কেবলমাত্র এক অনন্ত শুদ্ধ ব্রহ্মের যেটুকু অংশ মায়া দ্বারা আচ্ছাদিত দেখা যায় সেই অংশের নাম হচ্ছে সগুণ ঈশ্বর, বাস্তবে এই সগুণ ঈশ্বর শুদ্ধ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু নয়, মায়ার ফলে ভিন্ন দেখানোর জন্য সগুণ ঈশ্বকে লোক ভিন্ন বলে মনে করে। এই ভিন্নরূপে দর্শন-ই হচ্ছে সগুণ চৈতন্য, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর ; একেই আদিপুরুষ, পুরুষোত্তম এবং মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর বলা হয়। আকাশের অংশে মেঘের ন্যায় এই সগুণ চৈতন্যে যে সৃষ্টি দেখা যায়, তা হচ্ছে মায়ার কাজ। মায়া সৃষ্টিবর্ত্তা ঈশ্বরের শক্তির নাম। যেমন অগ্নি এবং তার দাহিকা শক্তি, সেইরূপ সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর আর তার শক্তি হচ্ছে মায়া। একেই প্রকৃতি বলা হয় এবং এরই নাম অজ্ঞান।

এই মায়া কি এবং কিভাবে উৎপন্ন হয় ? এটি এক ভিন্ন বিষয়, অতএব এ বিষয়ে এখানে কিছু না লিখে শুধু মুল-বিষয়েই লেখা হচ্ছে। এই বর্ণনা দ্বারা এটা বোঝা উচিৎ যে, নিরাকার আকাশের ন্যায় সেই সর্বব্যাপী অনন্ত চেতনের নাম হচ্ছে শুদ্ধ ব্রহ্ম, বাস্তবিকপক্ষে আকাশের দৃষ্টান্তও একদেশীয় ; কেননা আকাশের সীমাও আছে এবং এর আকার না থাকলেও এতে শব্দরূপী এক গুণও রয়েছে ; কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্ম তো অসীম, অনন্ত, নির্গুণ, অনন্য, সেইজন্য ইহা অনির্বচনীয়। সেইজন্য এর উপদেশ সমূহ পালনের একমাত্র অধিকারী সেইই হতে পারে যে উহা ধারণে সমর্থ। শুদ্ধব্রহ্মের স্বরূপ সম্পর্কে এটাই উপরিউক্ত বিশ্লেষণ।

এই শুদ্ধ ব্রহ্মের যে অংশ (আকাশে মেঘে আবৃত অংশের ন্যায়) আলাদা দেখায়, উহাই হচ্ছে মায়াবিশিষ্ট সৃষ্টিকর্ত্তা সগুণ ঈশ্বর এবং সেই পরমাত্মার এক অংশে সমগ্র ব্রহ্মান্ডের স্থিতি রয়েছে। অস্তু

এরপরে সাকার ঈশ্বর অর্থাৎ অবতারের বিষয়ে আলোচনা হচ্ছে। সগুণ ঈশ্বর প্রয়োজনানুযায়ী নিজের মায়াকে বশীভূত করে ভিন্ন ভিন্ন রূপে অবতীর্ণ হন। কখনও মনুষ্যরূপে, কখনও বরাহরূপে, কখনও

নৃসিংহ রূপে, আবার কখনও মৎস্যরূপে, কচ্ছপরূপে, হংসরূপে আবার কখনও অশ্বরূপে মানবকুলকে দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করে থাকেন। কিন্তু উনার এরূপ সংসারে প্রকট হওয়া প্রাকৃতিক জীবসমূহের সদৃশ হয় না। ঈশ্বরের অবতীর্ণ হবার সময় এবং হেতু সম্বন্ধে ভগবান গীতায় বলেছেন ঃ–

যদা যদা হি ধর্মষ্য গ্লানির্ভবতি ভারত।
অভ্যুত্থানমধর্মষ্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামী যুগে যুগে॥ (গীতা ৪/৭-৮)

"হে অর্জুন, যখন ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখনই আমি নিজরূপ প্রকট করি। আমি সাধু-পুরুষদিগকে উদ্ধার করার জন্য এবং পাপকারীদের বিনাশ করার জন্য এবং ধর্মস্থাপন করবার জন্য যুগে যুগে আবির্ভুত হই।"

এই সময় পৃথিবীতে এমন কোন অবতার চোখে পড়ে না যে বলতে পারে যে, আমি সাধু-পুরুষদের উদ্ধারের জন্য অবতার নিয়েছি। সংসারে সাধু অনেক দেখা যেতে পারে কিন্তু সেই সাধুগণের উদ্ধার করার জন্য অবতীর্ণ হয়ে আসা কাউকে দেখা যায় না যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের ন্যায় এরূপ বলতে পারে যে ঃ-

সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥
(গীতা ১৮/৬৬)

"সকল ধর্ম্মের আশ্রয়কে ছেড়ে কেবল এক বাসুদেবরূপ আমারই অনন্যভাবে শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি চিন্তা করো না।"

এভাবে একমাত্র নিজের শরণে নিয়েই সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেবার মত কথা বলার কোন অবতার এই সময় সংসারে নেই।

কিছু পূর্বে জনৈক ভদ্রলোক আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পৃথিবীতে তো পাপ অনেক বেড়ে গেছে, ভগবানের অবতার নেবার সময় কি এখনও হয় নি ? যদি হয়ে থাকে তাহলে ভগবান কেন অবতার নিচ্ছেন না ? আমি ওনাকে বলেছিলাম যে, আমি জানি না। এটা তো কোন কথা হল না যে আমি সব কিছুরই জ্ঞাতা ; ভগবান কেন অবতার নিচ্ছেন না, এটা ভগবানই জানেন। অবশ্য যদি কেউ আমাকে জিজ্ঞাসা করে যে, ভগবান অবতার নিলে তুমি প্রসন্ন হবে কি না, তাহলে আমি এটাই বলবো যে ভগবান অবতার নিলে আমি খুব প্রসন্ন হব, কেননা এই সময় যদি ভগবান অবতার রূপে অবতীর্ণ হন তাহলে আমারও তাঁর দর্শন লাভ হতে পারে। যদি কেউ সরলতাবশে জিজ্ঞাসা করে যে, তোমার অনুমানে ভগবানের অবতার নেবার সময় এখনও হয়েছে কিনা ? তাহলে আমি আমার অনুমান দ্বারা ইহাই বলতে পারি যে সম্ভবতঃ সেই সময় এখনও আসেনি, যদি সেই সময় এসে থাকত তাহলে ভগবান অবতীর্ণ হয়ে যেতেন। কলিযুগে যে ধরণের যা কিছু হওয়া উচিৎ এখনও পর্য্যন্ত তার চেয়ে বেশী কিছু হচ্ছে না। ভগবানের অন্যান্য অবতার গ্রহণের সময় যে ধরণের অত্যাচার বেড়েছিল, ধর্ম এবং ধর্মপ্রাণ ঋষিগণের যেরূপ দুর্দশা হয়েছিল, সেরকম এখনও হয় নি। ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের সময় তো রাক্ষসদের দ্বারা নিহত ঋষিসমূহের হাড়ের স্তুপ জমে গিয়েছিল।

প্রশ্ন ঃ- ঋষিগণের কি রাক্ষসদের বধ করার সামর্থ ছিল না ? যদি ছিল তাহলে তারা রাক্ষসদের বধ করেন নি কেন ?

উত্তর ঃ- ঋষিগণের মধ্যে রাক্ষসদের বধ করার সামর্থ ছিল, কিন্তু তারা নিজেদের তপোবল ক্ষীণ করতে চান নি। যে সময় বিশ্বামিত্র দশরথ মহারাজের কাছে এসে যজ্ঞের রক্ষার জন্য শ্রীরাম-লক্ষ্ণণকে চাইলেন, সেই সময়েও তিনি এ কথাই বলেছিলেন যে, "যদিও আমি স্বয়ং রাক্ষসদের বধ করতে পারি, কিন্তু এতে আমার তপক্ষয় হবে, যা আমি চাই না। শ্রীরাম-লক্ষ্ণণ দ্বারা রাক্ষসদের বধ করা হলে আমার যজ্ঞের রক্ষাও হবে এবং তপোবলও সুরক্ষিত থাকবে। শ্রীরাম-লক্ষ্ণণ

সহজেই রাক্ষসদের মারতে পারবেন, আমি একথা জানি, কিন্তু তুমি জান না। মহারাজ দশরথ মোহবশে শ্রীরাম-লক্ষ্মণকে সাধারণ বালক মনে করে পুত্র-স্নেহের বশীভূত হয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন যে – "মহারাজ, আমি নিজে আপনার সঙ্গে যেতে প্রস্তুত, একমাত্র রাবনকে বাদ দিয়ে বাকি সমস্ত রাক্ষস আমি বধ কবতে পারি। আপনি রাম-লক্ষ্মণকে না নিয়ে, আমাকে নিয়ে চলুন।" রাজাকে এভাবে মোহাচ্ছন্ন দেখে শ্রীবশিষ্ঠ মহারাজ, যিনি ভগবান শ্রীরামের প্রভাবকে তত্ত্বের সঙ্গে জানতেন, দশরথকে বুঝিয়ে বললেন যে, "রাজন্, তুমি কোনও প্রকারের চিন্তা করিও না, এরা কোন সাধারণ বালক নয় এদের কোনও ভয় নেই, তুমি প্রসন্নভাবে এদের বিশ্বামিত্রের সঙ্গে পাঠিয়ে দাও।" এ প্রসঙ্গে এটা বোঝা যায় যে, যদিও ঋষিগণ সামর্থবান্ ছিলেন, কিন্তু নিজের তপোবলকে কাজে লাগাতে চাইতেন না।

মনে হচ্ছে, কলিযুগে এখনও এমন সময় উপস্থিত হয়নি যাতে ভগবানকে অবতার ধারণ করতে হয়, এবং ভগবান বিনা কারণে অকস্মাৎ অবতার গ্রহণ করেন না। প্রথমে তো তিনি কারক পুরুষগণকে আপন অধিকার দিয়ে পাঠান, যেমন মালিক নিজের দোকান সাম্লানোর জন্য বিশ্বাসী কর্মচারীকে পাঠায়। কিন্তু যখন তিনি দেখেন যে গোমস্তাকে দিয়ে কাজ হবে না, তখন তিনি স্বয়ং আসেন। এরূপে যখন কারক পুরুষদের পাঠানোর পরেও ভগবানকে নিজের অবতার গ্রহণ করার আবশ্যকতা প্রতীত হয় তখন তিনিই স্বয়ং আবির্ভুত হন। কারক পুরুষ তাদের বলা হয় যারা ভগবদ্ কৃপায় নিজের পুরুষার্থের দ্বারা এই শ্লোক অনুযায়ী :–

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্ ।
তত্র প্রয়াত গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ ॥ (গীতা ৮/২৪)

ভিন্ন-ভিন্ন দেবতাদের দ্বারা ক্রমে অগ্রসর হয়ে শেষে ভগবানের সত্যলোকে পোঁছে যান। এই সত্যলোকে গমনকারী মহাত্মাগণকে অর্ভ্যথনা জানানোর জন্য ভগবানের পার্ষদ (অমানব পুরুষ) বিমান নিয়ে

সম্মুখে উপস্থিত হন এবং খুব আদর-যত্ন সহকারে ভগবানের সেই পরম-ধামে নিয়ে যান। এই ধাম প্রলয়কালে বিনাশ হয় না, সেখানে কোন প্রকারের দুঃখ কিংবা শোক নেই। একবার যে সেই ধামে পৌঁছে যায় তার আর কর্ম-বন্ধনযুক্ত জন্ম হয় না। সম্ভবতঃ এই লোককে শ্রীবিষ্ণুর উপাসকগণ বৈকুণ্ঠ, শ্রীকৃষ্ণের উপাসকগণ গোলোক এবং শ্রীরামের উপাসকগণ সাকেত লোক বলে অভিহিত করেন। এই লোকে পৌঁছে যাওয়া মহাত্মাগণ মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত পরমসুখে দিনাতিপাত করে পরিশেষে শুদ্ধব্রহ্মে প্রশান্তি লাভ করেন। এদের মধ্যে থেকে যদি কোন মহাপুরুষ সৃষ্টিকর্তা ভগবানের প্রেরণায় অথবা নিজের ইচ্ছায় শুধুমাত্র জগতের হিতের জন্য সংসারে আসেন, তাহলে তাদের কারক পুরুষ রূপে অভিহিত করা হয়। এই ধরনের পুরুষদের স্পর্শ, ভাষণ এবং চিন্তনের ফলেও শ্রদ্ধাবান লোকের উদ্ধার হতে পারে। শ্রীবশিষ্ঠদেব এবং শ্রীবেদব্যাস মহারাজ প্রভৃতিরা এই ধরনের মহাপুরুষগণের মধ্যে ছিলেন। শুধুমাত্র জগতের উদ্ধারের জন্যই এই সকল মহাপুরুষেরা জগতে আবির্ভুত হন। যেমন কোন কারাগারে পড়ে থাকে কয়েদিদের মুক্ত করার জন্য কোনও বিশেষ অবসরে রাজার প্রতিনিধি অধিকার নিয়ে কারাগারে যান এবং সেখানে গিয়ে বন্ধনে পড়ে থাকা কয়েদীদের বন্ধন থেকে মুক্ত করে স্বতন্ত্রভাবে ফিরে আসেন। জেলে কয়েদিরাও যায় এবং রাজার প্রতিনিধিও যায়। পার্থক্য এইটুকুই যে, কয়েদি নিজের দুস্কর্মের ফল ভোগের জন্য পরবশ (পরাধীন) হয়ে জেলের বন্ধনে যায় এবং রাজার প্রতিনিধি স্বতন্ত্রভাবে দয়ার বশে বন্ধনে পড়ে থাকা কয়েদিদের মুক্ত করার জন্য জেলে যান। এইরূপ কারক পুরুষও কেবলমাত্র বন্ধনে পড়ে থাকা জীবদের মুক্ত করার জন্য অবতীর্ণ হন। অবতার এবং কারক-পুরুষদের মধ্যে পার্থক্য এই যে অবতারী কখনও জীবভাবকে একেবারে প্রাপ্ত হয়নি এবং কারক-পুরুষ কোনও কালে জীবভাবকে প্রাপ্ত হয়েছিল কিন্তু ভগবদ্-কৃপায় এবং নিজের পুরুষার্থের দ্বারা ক্রমমুক্তির মাধ্যমে এই স্থিতি প্রাপ্ত হয়েছেন। জগতে এই সময় অবতার এবং

কারক-পুরুষ তো দেখা যায় না, জীবন্মুক্ত মহাত্মা অবশ্য পাওয়া যেতে পারে।

দুই প্রকারের মুক্তি হয় সদ্যোমুক্তি এবং ক্রমমুক্তি। যে এই দেহতেই অজ্ঞান থেকে সর্বথা পৃথক হয়ে নিত্য, সত্য, আনন্দ বোধস্বরূপে স্থিত হন, যাদের সমগ্র কর্ম জ্ঞানাগ্নি দ্বারা ভস্ম হয়ে যায় এবং যার দৃষ্টিতে এক অনন্ত এবং অসীম পরমাত্মার সত্তা ভিন্ন জগতের আলাদা সত্তার অভাব অনুভূত হয়, এইরূপ মহাপুরুষকে জীবন্মুক্ত বলা হয়, — এরই নাম সদ্যোমুক্তি এবং যে উপযুক্ত ক্রম দ্বারা লোকান্তরের মধ্যে দিয়ে পরমধাম পর্য্যন্ত পোঁছে যান, তা হল ক্রমমুক্তি। এই মুক্তির চারটি ভেদ রয়েছে, যথা — সামীপ্য, সারুপ্য, সালোক্য এবং সাযুজ্য। ভগবান সমীপে নিবাশ করার নাম হচ্ছে সামীপ্য, ভগবানের স্বরূপ প্রাপ্ত করার নাম হচ্ছে সারূপ্য, ভগবানের লোকে নিবাস করার নাম হচ্ছে সালোক্য এবং ভগবানের সঙ্গে মিশে যাবার নাম হচ্ছে সাযুজ্য। যারা দাস-দাসী অথবা মাধুর্য্য ভাবের দ্বারা ঈশ্বর ভজনা করেন তাদের সামীপ্য-মুক্তি, যারা মিত্রভাবে ভজনা করেন তাদের সারূপ্য-মুক্তি, যারা বাৎসল্য ভাবে ভজনা করেন তাদের সালোক্য-মুক্তি এবং যারা বৈরীভাবে কিংবা জ্ঞান-মিশ্রিত ভক্তিদ্বারা ভগবানের উপাসনা করেন তাদের সাযুজ্য-মুক্তি প্রাপ্ত হয়ে থাকে।

এরূপ মহাপুরুষ এই সময়ে জগতে রয়েছেন। জীবন্মুক্ত তাকেই বলা হয় যে পূর্বে জীবভাবকে প্রাপ্ত ছিল এবং পরে পুরুষার্থের দ্বারা মুক্ত হয়েছে। যেমন শ্রীশুকদেব এবং রাজা জনক প্রভৃতি।

জীবসমূহে প্রথম শ্রেণীতে এমন কিছু মহাপুরুষ রয়েছেন যারা জীবভাব থেকে মুক্ত হয়ে গিয়েছেন। দ্বিতীয়তঃ এমন লোক এই সময় দেখা যেতে পারে, যারা দৈব-সম্পত্তির আশ্রয় নিয়ে লক্ষ্যে স্থিত রয়েছেন এবং মুক্তির অতি সন্নিকটে পোঁছে গেছেন, এই জন্মেই তাদের মুক্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা অথবা কারও আরও এক জন্মধারণ করতে হতে পারে। এরূপ পুরুষও জীবন্মুক্ত-র ন্যায় কাম-ক্রোধ এবং শোক-হর্ষের প্রায়ই বশীভূত হন না।

প্রশ্ন ঃ প্রাচীনকালে ঋষি এবং মহাত্মাগণের মধ্যে হর্ষ-শোক হয়েছিল, — এ ধরনের কথা গ্রন্থে দেখা যায়। এর কারণ কি ?

উত্তর ঃ যাদের রাগ-দ্বেষ বশতঃ হর্ষ-শোক জনিত বিকার হয় তাদের জীবন্মুক্ত বলে ধরা যাবে না, কিন্তু যদি কর্তব্যের খাতিরে লোক মর্য্যাদার জন্য কোনও অংশে মহাত্মাদের মধ্যে হর্ষ-শোকের ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়, তাহলে এতে কোন ক্ষতি নেই। ভগবান রামচন্দ্র তো সীতা হরণের পর এবং লক্ষণের শক্তিবান লাগার পর খুবই বিলাপ (শোক) করেছিলেন, তাও এমন শব্দে এবং এরূপ ভাবনায় যে তা দেখে-শুনে বড়দেরও মোহের ন্যায় লেগেছিল, কিন্তু ভগবানের তা কেবলমাত্র ব্যবহার (আচরণ) ছিল এবং তার মধ্যে আরও একটি বিলক্ষণ দিক ছিল। ভগবান শ্রীরাম, সীতা ও লক্ষণের জন্য ব্যাকুলভাবে বিলাপ করে জগতকে মহান্ প্রেমের এবং নিজের মৃদু স্বভাবের এক অতি উচ্চ শিক্ষা দিয়ে গেছেন। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় ভগবান নিজ স্বভাব এরূপ ভাবে বিশ্লেষণ করেছেন যে ঃ

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

যে আমাকে সেভাবে ভজনা করে, আমিও তাকে সেই ভাবেই ভজনা করে থাকি। এর অনুসরণ করে ভগবান শ্রীরাম সীতার জন্য বিলাপ করতে করতে বৃক্ষশাখা, পল্লব প্রভৃতির কাছে বারে বারে সংবাদ জানতে চেয়ে ইহা প্রমাণ করে দিয়েছেন যে, যে ভাবে এই সময়ে রাবণের হাতে কুক্ষিগত সীতা প্রেমে নিমজ্জিত হয়ে "রাম, রাম", বলে আহ্বান করছেন ; ঠিক তেমনই রামচন্দ্রও সীতার প্রেমের বাঁধনে আবদ্ধ হয়ে প্রেমে বিহ্বল হয়ে "সীতা, সীতা" বলে তাকে আহ্বান করেছেন। এভাবে লক্ষণের জন্য বিলাপ করে শ্রীরামচন্দ্র এটাই প্রমাণ করেছেন যে, রামের জন্য লক্ষণ যেরূপ ব্যাকুল হতে পারে, রামও আজ লক্ষণের জন্য সেরূপ ব্যাকুল। এ থেকে আমাদের এই শিক্ষা গ্রহণ করা উচিৎ যে, ভগবানকে আমরা যে ভাবে ভজনা করব, ভগবানও সেইভাবে আমাদের ভজনা করবার জন্য প্রস্তুত রয়েছেন। এটা তো হল ভগবানের কথা,

ঋষি-মহাত্মাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু লোক-ব্যবহারে হর্ষ-শোকের ন্যায় ভাব হতে পারে।

জীবন্মুক্ত এবং মুক্তির সমীপে পৌঁছে যাওয়া পুরুষদের সম্বন্ধে বলা হল। এবার সংসারে পূণ্যাত্মা সকাম যোগীও রয়েছেন যারা —

ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্ ।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ত্ততে ॥ (গীতা৮/২৫)

এই শ্লোক অনুযায়ী ভিন্ন-ভিন্ন দেবতাদের দ্বারা অগ্রসর হয়ে চন্দ্রমার জ্যোতিকে প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে নিজের শুভ কর্মের ফলভোগ করে পুনরায় ফিরে আসেন।

পূর্বকালে এমনও যোগী হতেন যারা আট প্রকারের কিংবা এর কোনও এক বা একাধিক সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছেন। বর্ত্তমানকালে এই বিদ্যা প্রায় লুপ্ত হয়ে গেছে। আসলে শুধু সিদ্ধিপ্রাপ্তি হলেই পরম কল্যাণ হয় না। সিদ্ধিদ্বারা সাংসারিক সুখ পাওয়া যেতে পারে কিন্তু মোক্ষ পাওয়া যায় না। সেইজন্য শাস্ত্রকারগণ এই সিদ্ধিসমূহকে মোক্ষের বাধক এবং জাগতিক সুখের সাধনা বলে স্বীকার করেছেন। কিন্তু উপরে বর্ণিত মুক্তির মার্গে স্থিত যোগী যেহেতু মোক্ষরূপ পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হন সেইজন্য তাদের স্থান এদের চেয়ে উঁচুতে।

প্রশ্ন ঃ আট ধরণের সিদ্ধি কি কি ? কিভাবে প্রাপ্ত হওয়া যায় এবং এদের দিয়ে কি কি কাজ করা যায় ?

উত্তরঃ সিদ্ধি সমূহের নাম হচ্ছে, অনিমা, গরিমা, মহিমা, লঘিমা, প্রাপ্তি, প্রকাশ্য, ইশিত্ব এবং বশিত্ব। অষ্টাঙ্গযোগ সাধনার ফলে এদের প্রাপ্তি হয়, এবং এই সিদ্ধিসমূহ দ্বারা এই সমস্ত কাজ হতে পারে ঃ-

অনিমা- নিজের স্বরূপ কে অণুর-সমান করে ফেলা, যেমন শ্রীহনুমান লংকায় প্রবেশ করার সময় করেছিলেন।

গরিমা- শরীরকে ভারী ওজনশালী করে ফেলা, যেমন কুরুক্ষেত্রে যুদ্ধে কর্ণের তীর থেকে অর্জুনকে বাঁচাবার জন্য সারথীরূপে রথে বসে

থাকা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ করেছিলেন এবং নিজের ভারে অশ্বযুক্ত রথকে মাটিতে বসিয়ে দিয়েছিলেন।

মহিমা– শরীরকে অতি বিশাল করা, যেমন শ্রীবামন ভগবান করেছিলেন।

লঘিমা– শরীরকে অত্যন্ত হাল্কা করে ফেলা।

প্রাপ্তি– ইচ্ছা মত পদার্থসমূহ প্রাপ্ত করে নেওয়া, যেমন ভরদ্বাজ মুনি ভরতের আতিথ্যের সময় করেছিলেন।

প্রকাশ্য– কামনা অনুসারে কার্য্য হয়ে যাওয়া।

ইশিত্য– ঈশ্বরের সমান সৃষ্টি রচনার কাজে সামর্থ্য অর্জন করা।

বশিত্য–নিজের প্রভাবে ইচ্ছানুযায়ী যে কাউকে বশ করে নেওয়া।

এই হচ্ছে আটটি সিদ্ধি। আজকাল এই সমস্ত সিদ্ধিপ্রাপ্ত পুরুষ দেখা যায় না। মুখ নিঃসৃর্ত বানী সত্যে পরিণত হয় এ ধরণের উপসিদ্ধিসমূহ প্রাপ্ত পুরুষ অবশ্য কোথাও পাওয়া যেতে পারে।

প্রশ্নঃ সত্যবাদির মুখ নিঃসৃত সব কথা কি সত্যে পরিণত হয়?

উত্তরঃ অবশ্যই সত্য হয়। উপনিষদ এবং পুরাণ প্রভৃতিতে এর অনেক প্রমান রয়েছে, যার দ্বারা প্রমাণিত হয় যে প্রাচীনকালে এরূপ হত। ছোট্ট ঋষিকুমার রাজা পরীক্ষিতকে অভিশাপ দিয়েছিলেন এবং সেই অনুসারে ঠিক সময়ে সর্প এসে পরীক্ষিতকে দংশন করেছিল, যখন রাজা নহুষ ইন্দ্রপদে আরুঢ় হয়ে ঋষিগণকে নিজের পালকী বাহনের কাজে লাগিয়েছিল এবং কামান্ধ হয়ে ইন্দ্রানীর নিকট গমনে উদ্যত হল, তখন "শ্রীঘ্রং সর্প" বলে ঋষিকে পদাঘাত করেছিল, তখন ঋষি বললেন যে তুমি সর্প হয়ে যাও এবং তৎক্ষণাৎ সে সর্প হয়ে গিয়েছিল। প্রার্থনা করার ফলে আবার তাকে এই বর দেওয়া হয় যে দ্বাপরযুগে ভীমকে ধরার ফলে যুধিষ্ঠিরের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবে এবং তখন তোমার উদ্ধার হবে এই বাক্যও সত্যে পরিণত হয়েছিল। অতএব এটাই প্রমাণিত হল যে, সত্যবাদীর মুখ থেকে নিঃসৃত প্রতিটি শব্দই সত্য হয়। অবশ্য, যদি কোন সত্যবাদী জেনে-শুনে কখনও অসত্য বলে, তাহলে সেই শব্দ

সত্য হয় না। যেমন, মহারাজ যুধিষ্ঠির জেনে-শুনে অশ্বথামার মৃত্যুর কথা সন্দিগ্ধভাবে বলেছিলেন, এতে অশ্বথামা মরেনি। কিন্তু যদি কেউ কেবলমাত্র সত্য কথাই বলেন তাহলে তার বাণী সত্যে পরিণত হবে এতে কোন সন্দেহ নেই।

আজকাল এই ধরণের কিছু পুরুষও দেখা যেতে পারে যারা মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে প্রায় বশীভূত করেছেন, যাদের মাসাধিকাল পর্যন্ত স্ত্রীর সঙ্গে এক শয্যায় শুলেও কামোদ্রেক হয় না, যে কোন ধরনের ভোজন পদার্থ সামনে এলেও কোন প্রভাব পড়ে না, ক্রোধ এবং শোকের ভয়ংকর কারণ উপস্থিত হলেও ক্রোধ এবং শোক হয় না। কিন্তু এমন কোন্ মহাপুরুষ আমার চোখে পড়ে নি যার দর্শন, স্পর্শ, ভাষণ কিংবা চিন্তন মাত্রে উদ্ধার পাওয়া সম্ভব, যেমন শ্রীনারদ মহারাজের দর্শন এবং উপদেশের ফলে লক্ষাধিক প্রাণী উদ্ধার প্রাপ্ত হয়েছেন, শ্রীশুকদেব মুনীব উপদেশের ফলে লক্ষ লোকের কল্যাণ হয়েছে, জীবন্মুক্ত আচার্য্যগণের চিন্তনের ফলে অনেক শিষ্যগণ উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়েছেন এবং বঙ্গভূমির শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভুর দর্শন্, স্পর্শ এবং উপদেশের ফলে হাজারো লোকের কল্যাণ হয়েছে। এটুকু অবশ্য বলতে পারি যে মানুষ চাইলে এমন অবস্থায় উপনীত হতে পারে যে তাঁর, দর্শন, স্পর্শ, ভাষণ বা চিন্তা করলেই লোকে উদ্ধার পেতে পারে।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

কল্যাণের তত্ত্ব

সর্ব প্রকারের দুঃখ বিকার, গুণ এবং কর্মসমূহ থেকে চিরদিনের জন্য বিমুক্ত হয়ে পরম বিজ্ঞান আনন্দময় কল্যাণ স্বরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়াই হল পরম কল্যাণ। একেই কেউ মুক্তি, কেউ পরম পদের প্রপ্তি, কেউ নির্বাণপদের প্রাপ্তি আর কেউ মোক্ষ নামে অভিহিত করে থাকেন। এই স্থিতিকে প্রাপ্তির অধিকার প্রতিটি মানুষের রয়েছে। শ্রীভগবান্ বলেছেন ঃ–

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥

(গীতা ৯/৩২)

'আমার শরণ গ্রহণ করে স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রাদিক এবং পাপযোনি বিশিষ্ট (অন্ত্যযাদি) প্রভৃতি কেই হোক না কেন, সবাই পরমগতিকে প্রাপ্ত হয়। অতএব যে পুরুষ পরমাত্মার ভজন-ধ্যানদ্বারা এভাবে সংসার থেকে বিমুক্ত হয়ে পরম পদ প্রাপ্ত হন, তাঁরই মানব জীবন কৃতার্থ।

এ বিষয়ে লোকে ভিন্ন-ভিন্ন ভ্রমাত্মক কথা বলে থাকেন যার মধ্যে এই তিনটি প্রধান ঃ–

(১) "বর্তমান দেশ-কালে অথবা এই ভূমির উপরে মুক্তি সম্ভব নয় এবং গৃহস্থ তথা নীচবর্ণের মুক্তি হয় না।

(২) "মুক্ত পুরুষ দীর্ঘকাল পর্য্যন্ত মুক্তির সুখ উপভোগ করার পর পুণরায় সংসারে জন্ম গ্রহণ করেন।"

(৩) "জ্ঞান দ্বারা মুক্তি হয়। কাম, ক্রোধ, অসত্য, চুরি এবং ব্যাভিচার প্রভৃতি বিকার সমূহ থাকলেও জ্ঞান হয়ে গেলে মানুষ জীবন্মুক্ত হতে পারে। উপযুক্ত বিকার হচ্ছে অন্তঃকরণের ধর্ম এবং যে পর্য্যন্ত

অন্তঃকরণ রয়েছে সে পর্য্যন্ত প্রারব্ধ অনুসারে এই সমস্ত বিকার থাকাও অনিবার্য্য ।"

বাস্তবে এই তিনটি মতের কোনটিই সত্য নয়, লাভদায়ক নয় এবং যুক্তিযুক্তও নয় । বরং এরূপ মানলে খুবই ক্ষতি এবং লোকেদের মধ্যেও ভ্রম ছড়ানো হয় ; সেইজন্য এখানে এই বিষয়ে ক্রমশঃ আলোচনা করা হচ্ছে ।

(১) মুক্তির কারণ হচ্ছে আত্মজ্ঞান এবং সেই আত্ম সাক্ষাৎকারের জন্য নিস্কাম কর্মযোগ, ধ্যানযোগ এবং জ্ঞানযোগ প্রভৃতি প্রত্যেক দেশ কালের উপযোগী সুসাধ্য উপায় বেদ-শাস্ত্রে দর্শানো হয়েছে ।

কোন বিশেষ যুগ, দেশ, বর্ণ কিংবা আশ্রম মাত্রকেই মুক্তির কারণ হিসাবে মানা হয় নি । সাধন সম্পন্ন হলে প্রত্যেক দেশ কালে এবং প্রত্যেকটি বর্ণ আশ্রমে মুক্তিলাভ হতে পারে । উপরিউক্ত গীতার শ্লোকেও এই নির্ণয় করা হয়েছে । মুক্তির জন্য শ্রুতি, স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে কোথাও কলিযুগ, ভারত ভূমি অথবা কোনও বর্ণাশ্রমের নিষেধ করা হয় নি । আজ পর্য্যন্ত যে সব সাধু মহাত্মা হয়েছেন, তাদের জীবন চরিত্রেও এটাই প্রমাণিত হয় যে কোন দেশ, ভূমি, বর্ণ এবং আশ্রমে থেকে সাধনা করলেই মুক্তি হতে পারে । বিষ্ণুপুরাণের একটি প্রসঙ্গ হচ্ছে এই যে ঃ–

"এমন সময় কখন, যে সময়ে ধর্মের স্বল্প অনুষ্ঠান মহতী ফল দেয়," এই বিষয়ে একবার ঋষিদের মধ্যে আলোচনাচক্র হল, শেষে তারা এই প্রশ্নের নির্ণয়াত্মক উত্তর পাবার জন্য ভগবান ব্যাসদেবের নিকটে গেলেন । ব্যাসদেব সেই সময় ভগবতী ভাগীরথীতে স্নানরত ছিলেন, ঋষিগণ তার প্রতীক্ষায় জাহ্নবীতটে বৃক্ষের ছায়ায় উপবিষ্ট রইলেন । কিছুক্ষণ পরে ব্যাসদেব মুনিদের শুনিয়ে শুনিয়ে ক্রমশঃ এরূপ বললেন যে, "কলিযুগেই শ্রেষ্ঠ" । শূদ্র ! তুমি সাধু, তুমি ধন্য, হে স্ত্রীগণ ! তোমরা ধন্য, তোমাদের চেয়ে অধিক ধন্য আর কে ? এতে মুনিরা খুব আশ্চর্য্য হলেন এবং তারা কৌতুহলবশে ব্যাসদেবের কাছে এর মর্মার্থ জানতে চাইলেন । ব্যাসদেব বললেন যে এটাই হচ্ছে তোমাদের বিবদমান প্রশ্নের উত্তর । এই তিনটিতে মনুষ্য অল্প আয়াসেতেই পরমগতি

লাভ করতে পারে। অন্য যুগে, অন্য বর্ণে এবং অন্য পুরুষদের ক্ষেত্রে তো অনেক সাধনা করলে তবে কিছু হয়ে থাকে, কিন্তু –

স্বল্পেনৈব প্রযত্নেন ধর্মঃ সিদ্ধ্যতি বৈ কলৌ ।
নরৈরাত্মগুণাম্ভোভিঃ ক্ষালিতাখিলকিল্বিষৈঃ ॥
শূদ্রৈশ্চ দ্বিজশুশ্রূষাতৎপরৈর্মুনসত্তমাঃ ।
তথা স্ত্রীভিরনায়াসং পতিশুশ্রূষয়ৈব হি ॥
ততস্ত্রিতয়মপ্যেতন্মম ধন্যতমং মতম্ ।

(বিষ্ণুপুরাণ৬/২/৩৪-৩৬)

হে মুনিগণ, কলিযুগে মনুষ্য সদ্‌বৃত্তির অবলম্বন করে অল্প প্রয়াসের ফলেই সমগ্র পাপ থেকে মুক্ত হয়ে ধর্মের সিদ্ধি লাভ করে। শূদ্র দ্বিজসেবা দ্বারা এবং স্ত্রীগণ কেবল মাত্র পতির সেবা দ্বারা অল্পায়াসেই উত্তম গতি লাভ করতে পারে। এইজন্য আমি এই তিনকে ধন্যতম বলেছি।" এতে এটা প্রমাণিত হল যে, বর্ত্তমান দেশে-কালে এবং স্ত্রী শূদ্রের পক্ষে মুক্তির পথ আরও সুগম।

যদি কিছুক্ষণের জন্য এরূপ মেনে নেওয়া হয় যে, বর্ত্তমান দেশ-কালে এবং প্রত্যেক বর্ণাশ্রমে মুক্তি হয় না, লোকে ভুল করে উৎসাহ-পূর্বক মুক্তির সাধনে লেগে রয়েছেন, তাহলেও এটা মেনে নেওয়া যায় না যে, এই ভুলের ফলে তারা নিজের কোন লোকসান করছেন। মুক্তি যদি নাও হয়, তবুও সাধনার কিছু না কিছু উত্তম ফল অবশ্যই হবে। সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি হবে, অন্তঃকরণের শুদ্ধি হবে এবং দৈব সম্পত্তির গুণের বিকাশ হবে। যখন মুক্তি হয়-ই না, তখন তো সাধক এবং অসাধক দুইয়ের কারো হবে না, কিন্তু সাধনার ফলে সাধকের মধ্যে সদ্‌গুণের বৃদ্ধি হবে এবং সাধনহীন মনুষ্য রিক্ত থেকে যাবে। তা ছাড়া যদি বর্ত্তমান দেশ-কালে প্রত্যেক মনুষ্যের মুক্তি হয়ে থাকে তাহলে সাধকের তো মুক্তি হয়ে যাবে। কিন্তু যে সাধনহীন সে সর্বদা বঞ্চিত রয়ে যাবে। সে যদি সাধনায় প্রবৃত্তই না হয়, তাহলে তার কিসের মুক্তি ? অতএব সেই ব্যক্তি ভ্রমবশে এই পরমলাভ থেকে বঞ্চি হয়ে বারে বারে

সংসারের আবর্তন চক্রে ঘুরতে থাকবে। অতএব এই যুক্তিতেও প্রত্যেক দেশ-কালে এবং প্রত্যেক বর্ণাশ্রমে মুক্তি সুগম এরূপ মেনে নেওয়া যথাযথ, শ্রেয়স্কর এবং যুক্তিযুক্ত।

(২) শ্রুতি, স্মৃতি এবং উপনিষদ প্রভৃতি সদ্‌গ্রন্থে কোথাও মুক্ত পুরুষদের পুনরাগমন সম্বন্ধীয় প্রমাণ পাওয়া যায় না। তাদেরই পুনরাগমন হয়ে থাকে– যে সকল সকামী পুণ্যাত্মা পুরুষ নিজের পুণ্যবলে স্বর্গাদি লোকে যায়। শ্রীভগবান বলেছেন–

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপা পূতপাপা
যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক
মশ্নন্তি দিব্যান্ দিবি দেব ভোগান্॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং
ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি।
এবং ত্রয়ী ধর্ম্মমনুপ্রপন্না
গতাগতং কামকামা লভন্তে॥ (গীতা৯/২০-২১)

মুক্ত পুরুষদের সম্বন্ধে তো শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি গ্রন্থে স্থানে স্থানে তাদের পুণরায় সংসারে ফিরে না আসারই প্রমাণ রয়েছে। শ্রী ভগবান্ গীতায় বলেছেন –

আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জুন।
মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জন্ম ন বিদ্যতে॥ (গীতা ৮।১৬)

"হে অর্জুন! ব্রহ্মলোকসহ সমস্ত লোকই পুনরাবর্তনশীল। কিন্তু হে কৌন্তেয়! আমাকে প্রাপ্ত হলে আর পুনর্জন্ম হয় না।"

"ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে" (ছান্দো ৮।১৫।১)
ইমং মানবমাবর্ত নাবর্তন্তে (ছান্দো ৪। ১৬।৬)
তেষামিহ ন পুনরাবৃত্তিঃ (বৃহ৹ ৬।২।১৫)

প্রভৃতি শ্রুতি সমূহ প্রসিদ্ধ। এই সকল শাস্ত্র-বচনের দ্বারা এটা স্পষ্টই প্রমাণিত হয় যে মুক্ত জীবসমূহের পুনরাগমন কখনও হতে পারে

না। জীবন্মুক্ত পুরুষদের দ্বারা লোকদৃষ্টিতে উপযুক্ত কার্যসমূহ সম্পাদিত হলেও বাস্তবিকপক্ষে সেই সকল কার্যপ্রণালীর সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্কই নেই।

যষ্য সৰ্ব্বে সমারম্ভাঃ কামসঙ্কল্পবর্জিতাঃ
জ্ঞানাগ্নিদগ্ধকর্ম্মানং তমাহু পণ্ডিতং বুধা ঃ। (গীতা ৪।১)
যস্য নাহংকৃতো ভাবো বুদ্ধির্যষ্য ন লিপ্যতে ।
হত্বাপি স ইমাল্লোঁকান্ ন হন্তি ন নিবধ্যতে ॥ (গীতা ১৮।১৭)

এ ছাড়া সেই মুক্ত পুরুষের দৃষ্টিতে এক বিশুদ্ধ বিজ্ঞান-আনন্দঘন পরমাত্ম-তত্ত্ব ভিন্ন আর কিছুই থাকে না।

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ (গীতা ৭।১৯)

তার দৃষ্টিতে সমস্ত কিছুই হচ্ছে একমাত্র বাসুদেব। সেইজন্য তাকে মুক্ত বলা হয়। এরূপ পুরুষের কোন কালে এই মায়াময় সংসারের সঙ্গে পুনঃ সম্বন্ধ হয় না, কেননা তার দৃষ্টিতে সংসারের চিরকালের জন্য আত্যন্তিক অভাব প্রকটিত হয় এবং এই অবস্থায় তার পুনরাগমন কি করে সম্ভব ?

যদি কেউ এই কুতর্ক করে যে, যদি মুক্ত পুরুষগণের পুনরাগমন না হয় তাহলে মুক্ত হতে হতে একদিন জগতের সমস্ত জীবই মুক্ত হয়ে যাবে, তাহলে তো তখন সৃষ্টির সত্তাই মিটে যাবে। এর উত্তর হচ্ছে এই যে প্রথমে তো এরূপ হওয়া সম্ভব নয়, কেননা –

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ ॥ (গীতা ৭।৩)

"সহস্র সহস্র মানুষের মাঝে কেউ কেউ মোক্ষ প্রপ্তির জন্য যত্ন করে থাকে, যত্নকারী যোগীদিগের মধ্যে কোনও পুরুষ আমাকে (পরমাত্মাকে) তত্ত্বগতভাবে জানে।" এই অবস্থায় সমস্ত জীবের মুক্তি অসম্ভব, যেহেতু জীবের সংখ্যা অগুন্তি। তবুও যদি কোনও দিন "সম্পূর্ণ সংসারের সমস্ত জীব কোনও রকমে মুক্ত হয়ে যায়" তাহলে এতে

ক্ষতিই বা কি ? মহামনীষীগণ এ ব্যাপারে সাধ্যতীত প্রয়াস চালিয়েছেন, মহাত্মাগণ এখনইও সযত্ন প্রয়াসে রত এবং ভবিষ্যতেও এ ধরণের প্রচেষ্টায় যত্নবান থাকবেন । যদি কোনও দিন তাদের এই সাধ্যাতীত প্রয়াস হয় করে এবং জাগতিক জীবসমূহের মুক্তি ঘটে, তাহলে খুবই ভাল । এতে সিদ্ধান্তে কোন অন্তরায় সৃষ্টি হয় না । তর্কের খাতিরে যদি মেনে নেওয়া হয় যে, মুক্ত পুরুষগণের পূর্ণজন্ম হয় এবং যারা পূর্ণজন্ম মানে না তারা ভূল করছে, কিন্তু এই ভুলের মাশুল কি তাদের গুনতে হবে ? এই সিদ্ধান্ত অনুসারে যে পুনরাগমন মানে সেও ফিরে আসবে এবং যে মানে না সেও ফিরে আসবে । দুজনের ক্ষেত্রে ফল একই । কিন্তু কদাচিৎ যদি এই সিদ্ধান্ত সত্য হয় যে, "মুক্ত পুরুষদের পুনরাগমন হয় না"– তাহলে তো যে পুনরাগমন মানে, তার তো খুব ক্ষতি হবে, কেননা অপুনরাগমন স্বরূপ মুক্তিকে স্বীকার না করার ফলে তাঁর তো সেই মুক্তি হতেই পারে না । সেই ব্যক্তি ভূল বশতঃ পরমার্থ থেকে বঞ্চিত হবে এবং যে পুনরাগমন মানে না সে মুক্ত হয়ে যাবে । সুতরাং পুনরাগমন না মানাই যুক্তিযুক্ত, লাভজনক এবং সর্বোত্তম সিদ্ধি লাভের প্রকৃষ্ট পন্থা ।

(৩) শ্রুতি-স্মৃতি এবং উপনিষদ প্রভৃতি কোনও প্রামানিক সদ্-গ্রন্থ দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয় না যে, কাম-ক্রোধ প্রভৃতি বিকার থাকতে জীবন্মুক্তি হতে পারে । শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় তো খুবই স্পষ্ট করে কাম-ক্রোধ এবং লোভকে নরকের দরজা রূপে চিন্তিত করা হয়েছে ।

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতং ত্রয়ং ত্যজেৎ ॥
(গীতা ১৬।২১)

শ্রীগীতায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ এবং অর্জুনের প্রশ্নোত্তরে ইহা স্পষ্ট বিদিত হয় যে সমস্ত পাপের বীজ হচ্ছে "কাম" এবং আত্মজ্ঞান দ্বারা একে বিনষ্ট করার পরেই সাধক মুক্তির অধিকারী । তৃতীয় অধ্যায়ের ৩৬ থেকে ৪৩ নং শ্লোক পর্য্যন্ত এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বর্ণনা করা হয়েছে । যে পর্য্যন্ত কাম-ক্রোধ এবং হর্ষ-শোক প্রভৃতি বিকার থেকে মানুষ রেহাই

না পাবে, সে পর্য্যন্ত কি করে তার মুক্তি হতে পারে ? মুক্ত পুরুষদের সঙ্গে বাস্তবে সংসারের কোন সম্বন্ধ থাকে না। গীতায় বলা হয়েছে –

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে॥
নৈব তস্য কৃতেনার্থো নাকৃতেনেহ কশ্চন।
ন চাস্য সর্ব্বভূতেষু কশ্চিদর্থব্যপাশ্রয়ঃ॥ (গীতা ৩।১৭-১৮)

তাঁর অন্তঃকরণ মল-বিক্ষেপ এবং আবরণ থেকে সর্বথা রহিত হয়ে শুদ্ধ হয়ে যায়, এই স্থিতিতে কাম-ক্রোধ এবং হর্ষ-শোকাদি বিকার তার মধ্যে কি ভাবে থাকতে পারে ? শ্রীভগবান বলেছেন ঃ–

লভন্তে ব্রহ্মনির্ব্বাণমৃষয়ঃ ক্ষীণকল্মষাঃ।
ছিন্নদ্বৈধা যতাত্মানঃ সর্ব্বভূতহিতে রতাঃ॥
কাম ক্রোধবিযুক্তানাং যতীনাং যতচেতসাম্।
অভিতো ব্রহ্মনির্ব্বানং বর্ত্ততে বিদিতাত্মনাম্॥
(গীতা ৫।২৫-২৬)

"হর্ষশোকৌ জহাতি", "তরতি শোকমাত্মবিৎ" প্রভৃতি শ্রুতিসমূহও এ বিষয়ের প্রমান হিসাবে সুপ্রসিদ্ধ। শাস্ত্রসমূহের সর্বত্র এই সুরের অনুবর্ণনা শোনা যায়। শ্রীপরমাত্মার সাক্ষাৎ লাভের পর যখন সমস্ত বিকারের মুল এই জড় আসক্তি (মায়ার) অত্যন্ত অভাব হয়ে যায় তখন তার কার্য্যরূপ অন্যান্য বিকার কিভাবে টিকে থাকতে পারে ? এই শাস্ত্রবচনের দ্বারা এটাই প্রমানিত হয় যে, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের অন্তঃকরণে বিকার সমূহের অস্তিত্ব স্বীকার করা কখনও উচিত নয়।

যদি এটা মেনে নেওয়া যায় যে, জীবন্মুক্তির পরেও কাম-ক্রোধ প্রভৃতি বিকারসমূহের লেশমাত্র অবশিষ্ট থেকে যায়, এবং যারা এই অবশেষ থাকাকে না মানেন, তারা ভ্রম বশতঃই কাম-ক্রোধাদি বিকার সমূহের শিকড় উপড়ে ফেলার চেষ্টার ব্যাপৃত থাকেন, এ ক্ষেত্রে চিন্তা করা উচিত যে, এই ভুলের ফলে তাদের কোন ক্ষতি হচ্ছে কিনা ? পক্ষপাত না করে যদি বিচার করা হয় তাহলে জানা যাবে যে– কাম-ক্রোধাদি বিকার সমূহের বিনাশের উপায় যে করে না, তার চাইতে যে

বিনাশের উপায় করে সে অধিক বুদ্ধিমান, কেননা উপায় করার ফলে তাদের বিকার সমূহ বিনষ্ট হবে এবং এর ফলে তারা অন্ততপক্ষে জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের মধ্যে অবশ্যই উত্তম বলে গন্য হবেন। একজন অত্যন্ত ক্রোধসম্পন্ন তথা কামুক এবং অন্যজন এই দুই থেকে মুক্ত এবং এই সিদ্ধান্ত অনুসারে দুই জনই জীবন্মুক্ত। এই অবস্থায় এটাই স্বাভাবিক যে, এদের মধ্যে কাম-ক্রোধপরায়ণ মানুষের চাইতে কাম-ক্রোধরহিত জীবন্মুক্তই অধিক সম্মানিত হবেন। এই দৃষ্টিকোন থেকেও কাম-ক্রোধাদি বিকারের বিনাশ করাই উচিত বলে মনে হয় এবং যদি পূর্বে বর্ণিত কথাই সত্য হয় যে, জীবন্মুক্তের অন্তরে কোন বিকারের অবশেষ থাকে না, তাহলে যে বিকারের অবশেষ আছে বলে মানে তার মুক্তি হবে না, শুধু তাই নয়, তার আরও ভয়ংকর ক্ষতি হবে, কেননা সে মিথ্যা জ্ঞানেই (গীতা ১৮।২২ অনুযায়ী) নিজেকে জ্ঞানী এবং মুক্ত মনে করে নিজের চরিত্র সংশোধনের পবিত্র কার্য্য থেকেও বঞ্চিত থাকবে এবং কাম-ক্রোধাদি বিকারের মোহজালে জড়িত হয়ে নানা প্রকারের নরক-যন্ত্রনা ভোগ করতে করতে (গীতা অধ্যায় ১৬ শ্লোক সংখ্যা ১৬ থেকে ২০ অনুযায়ী) অনবরত সংসার চক্রে ভ্রষ্ট হয়ে ঘুরতে থাকবে। সেইজন্য সার্বোপরি এই সিদ্ধান্তকে মানা উচিত যে, জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের অন্তঃকরণে কাম-ক্রোধ এবং হর্ষ-শোক প্রভৃতি কোন বিকারেরই অবশেষে থাকে না।

এ ছাড়াও লোকে মুক্তির সম্বন্ধে আরও নানা ধরণের সন্দেহ প্রকাশ করে থাকে কিন্তু এই নিবন্ধ বড় হয়ে যাওয়ার জন্য সেই সব বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হল না।

এই লেখা থেকে পাঠকগণ অবশ্যই বুঝে নিয়েছেন যে, মুক্ত পুরুষ সর্বদা তিনটি গুণের অতীত হয়ে থাকেন (গীতা অ০ ১৪ শ্লোক সংখ্যা ১৯ এবং ২২ থেকে ২৬ শ্লোকে এর বর্ণনা রয়েছে), এই জন্যই তাদের অন্তঃকরণে কোন বিকার কিংবা কোনও কর্মের অবশেষ থাকে না এবং এই জন্যই তাদের পুনর্জন্ম হয় না। গুণের সঙ্গই হচ্ছে পুনর্জন্মের কারণ। শ্রীভগবান বলেছেন ঃ—

পুরুষঃ প্রকৃতিস্থো হি ভুঙ্‌ক্তে প্রকৃতিজান্‌ গুণান্‌ ।
কারণং গুনসঙ্গোহস্য সদসদ্‌যোনিজন্মসু ॥

(গীতা ১৩।২১)

পাঠকরা এটাও বুঝতে পেরেছেন যে, বর্ত্তমান দেশ-কালে মুক্ত হওয়া কোন অসম্ভব কথা নয় অতএব এখন অতি শীঘ্র সাবধান হয়ে কর্ত্তব্যে লেগে যাওয়া উচিত। আলস্য করে এ পর্য্যন্ত অনেক সময় নষ্ট হয়েছে। এখন তো সচেতন হয়ে যাওয়া উচিত। যে সময় চলে গিয়েছে, তা কোন উপায়েই ফিরে পাওয়া যাবে না। অতএব যত শীঘ্র সম্ভব সৎসঙ্গের দ্বারা নিজের কল্যাণের পথ বেছে নিয়ে সেই অনুযায়ী অগ্রসর হওয়া কর্তব্য।

এটাই হচ্ছে কল্যাণের তত্ত্ব –

উত্তিষ্টৎ জাগ্রৎ প্রাপ্য বরান্নিবোধৎ।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

কল্যাণ-প্রাপ্তির উপায়

কল্যাণ মুক্তিকে বলা হয়, এই শব্দ হচ্ছে পরমপদ অথবা পরমগতির বাচক। কল্যাণকে লাভ করার প্রধান উপায় হচ্ছে তিনটি নিষ্কাম কর্মযোগ, জ্ঞানযোগ অর্থাৎ সংখ্যাযোগ এবং ভক্তিযোগ অর্থাৎ ধ্যানযোগ। এরমধ্যে ভক্তির সাধন স্বতন্ত্র ভাবেও করা যেতে পারে এবং নিস্কাম কর্মযোগ এবং সাংখ্য যোগের মাধ্যমেও করা যেতে পারে।

নিস্কাম কর্মযোগের বর্ণনা বিস্তৃত ভাবে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৩৯ নং শ্লোক থেকে ৫৩ নং শ্লোক পর্য্যন্ত এবং নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধ পুরুষদের লক্ষণ (নিদর্শন) ঐ অধ্যায়ের ৫৪ নং শ্লোক থেকে ৭২ নং শ্লোক পর্য্যন্ত বর্ণিত হয়েছে।

জ্ঞানযোগের বিস্তৃত বর্ণনা দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ নং শ্লোক থেকে ৩০ নং শ্লোক পর্য্যন্ত রয়েছে এবং সেই অনুসারে ৩য় অধ্যায়ের ২৮ নং শ্লোকে, পঞ্চম অধ্যায়ের ৮ এবং ৯ নং শ্লোকে তথা ১৪ অধ্যায়ের ১৯ নং শ্লোকে জ্ঞানযোগীর কর্ম করার পথনির্দেশ করা হয়েছে। এর অতিরিক্ত ৫ অধ্যায়ের ১৩ থেকে ২৬ নং শ্লোক পর্য্যন্ত জ্ঞান এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৪৯ থেকে ৫৫ নং শ্লোক পর্য্যন্ত উপাসনার সঙ্গে জ্ঞানযোগের বর্ণনা রয়েছে।

পঞ্চম অধ্যায়ের ২৭ থেকে ২৯, ষষ্ঠ অধ্যায়ের ১১ থেকে ৩২, অষ্টম অধ্যায়ের ৫ থেকে ২২, নবম অধ্যায়ের ৩০ থেকে ৩৪, দশম অধ্যায়ের ৮ থেকে ১২, একাদশ অধ্যায়ের ৩৫ থেকে ৫৫, এবং দ্বাদশ অধ্যায়ের ২ থেকে ৮ নং শ্লোক পর্য্যন্ত ধ্যানযোগ অথবা ভক্তিযোগের বর্ণনা রয়েছে, ধ্যানযোগ এবং ভক্তিযোগ বাস্তবে একই বস্তু। এই প্রকারে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অন্যান্য শ্লোকেও তিন সাধন পথের ভিন্ন-ভিন্ন রূপে বর্ণনা রয়েছে, এই সবের মধ্যে বর্ত্তমান সময়ের পক্ষে কল্যাণ-প্রাপ্তির জন্য

সবচেয়ে সহজ এবং উত্তম পথ হচ্ছে ভক্তিসহিত নিস্কাম কর্মযোগ। এর খুব সুন্দর উপদেশ শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অষ্টাদশ অধ্যায়ের নিম্নলিখিত ১১টি শ্লোকে রয়েছে ঃ–

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলছেন যে ঃ –

সর্ব্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্ব্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎ প্রসাদাদবাপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥ ৫৬
চেতসা সর্ব্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্ন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগ মুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ ৫৭
মচ্চিতঃ সর্ব্বদুর্গানি মৎ প্রসাদাত্তরিস্যাসি।
অথ চেত্ত্বমহঙ্কারান্ন শ্রোষ্যসি বিনঙ্ক্ষ্যসি ॥ ৫৮
যদহঙ্কারমাশ্রিত্য ন যোৎস্য ইতি মন্যসে।
মিথ্যৈষ ব্যবসায়স্তে প্রকৃতিস্ত্বাংনিযোক্ষ্যতি ॥ ৫৯
স্বভাবজেন কৌন্তেয় নিবদ্ধঃ স্বেন কর্ম্মনা।
কর্ত্তুং নেচ্ছসি যন্মোহাৎ করিষ্যস্যবশোহপি তৎ ॥ ৬০
ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ণ্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ ৬১
তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত।
তৎপ্রসাদাৎ পরাংশান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥ ৬২
ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া।
বিমৃশ্যৈতদশেষেণ যথেচ্ছসি তথা কুরু ॥ ৬৩
সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ।
ইষ্টোহসি মে দৃঢ়মিতি ততো বক্ষ্যামি তে হিতম্ ॥ ৬৪
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োহসি মে ॥ ৬৫
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥ ৬৬

"মৎ পরায়ণ হয়ে নিস্কাম কর্মযোগী সকল কর্ম্ম সর্ব্বদা করিতে থাকিয়া আমার কৃপাতে সনাতন অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হয়। অতএব হে অর্জুন! তুমি সকল কর্ম্ম মনদ্বারা আমাতে অর্পণ করিয়া মৎপরায়ণ হইয়া

সমত্বুবুদ্ধিরূপ নিস্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করিয়া নিরন্তর মদ্গতচিত্ত হও।"

"এই প্রকার তুমি নিরন্তর মনযুক্ত হইয়া আমার কৃপাতে জন্ম-মৃত্যু আদি সকল সঙ্কট অনায়াসেই পেরিয়ে যাবে। আর যদি অহঙ্কার বশতঃ আমার বাক্য শ্রবণ না কর তাহা হলে বিনাশ প্রাপ্ত হবে অর্থাৎ পরমার্থ হতে ভ্রষ্ট হয়ে যাবে।"

"যে তুমি অহঙ্কারকে অবলম্বন করিয়া এইরূপ মনে করিতেছ যে আমি যুদ্ধ করিব না তাহা হইলে তোমার এই সিদ্ধান্ত মিথ্যা, কেননা ক্ষাত্রস্বভাব তোমাকে বলপূর্বক যুদ্ধে নিয়োগ করিবে।"

"হে অর্জুন! যে কর্ম্মকে তুমি মোহ প্রযুক্ত হয়ে করিতে ইচ্ছা করিতেছ না তাহাও নিজের পূর্বকৃত স্বাভাবিক কর্ম্ম দ্বারা বদ্ধ ও পরবশ হইয়া করিবে।"

"কেননা হে অর্জুন, অন্তর্য্যামী পরমেশ্বর স্বীয় মায়াদ্বারা শরীর রূপী যন্ত্রে আরুঢ় সকল প্রাণীগণকে তাহাদের কর্ম্মানুসারে ভ্রমণ করাইতে থাকিয়া সকল ভূত প্রাণীগণের হৃদয়ে স্থিত আছেন। অতএব হে ভারত! সকল প্রকারে তুমি সেই পরমেশ্বরেরই শরণ গ্রহণ কর, সেই পরমাত্মার কৃপাতে পরম শান্তি এবং সনাতন পরম ধাম প্রাপ্ত হইবে।"

"এই প্রকার এই গোপনীয় হইতে অতি গোপনীয় জ্ঞান আমার দ্বারা তোমাকে বলা হইল, এই রহস্যযুক্ত জ্ঞানকে সম্পূর্ণভাবে বিচার করিয়া পরে তুমি যেরূপ ইচ্ছা কর সেইরূপ কর।"

"হে অর্জুন"! সকল গোপনীয় হইতেও অতি গোপনীয় আমার পরম রহস্যযুক্ত বচন তুমি পুনরায় শ্রবণ কর। যেহেতু তুমি আমার অতিশয় প্রিয়, তাই এই পরমহিতকারক বাক্য আমি তোমাকে বলিব।" "হে অর্জুন! তুমি কেবল সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মারূপ আমাতেই অনন্য প্রেম সহিত নিত্য নিরন্তর অচল মনযুক্ত হও আর পরমেশ্বররূপ আমাকেই পরম শ্রদ্ধা ও ভক্তির সহিত নিষ্কামভাবে নাম, গুণ ও প্রভাবের শ্রবণ, কীর্ত্তন, মনন ও পঠন-পাঠন দ্বারা নিরন্তর ভজনকারী হও এবং আমার (শঙ্খ, চক্র, গদা, পদ্ম আর কিরীট কুণ্ডল আদি আভূষণযুক্ত পীতাম্বর বনমালা ও কৌস্তুভমনিধারী বিষ্ণুরূপ) মন, বাণী এবং শরীর দ্বারা

সর্বস্য অর্পণ করিয়া অতিশয় শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের সহিত বিহ্বলতা পূর্বক পূজনকারী হও আর সর্বশক্তিমান, বিভূতি, বল, ঐশ্বর্য্য, মাধুর্য্য, গম্ভীরতা, উদারতা, বাৎসল্য ও সহৃদয়তা আদি গুণসম্পন্ন, সকলের আশ্রয় বাসুদেবরূপ আমাকে, বিনয়ভাবপূর্বক ভক্তির সহিত সাষ্টাঙ্গে দন্ডবৎ প্রণাম কর, এইরূপ করিলে তুমি আমাকেই প্রাপ্ত হইবে, ইহা আমি তোমার প্রতি সত্য প্রতিজ্ঞা করিতেছি যেহেতু তুমি আমার অত্যন্ত প্রিয় সখা।"

"অতএব সকল ধর্মকে অর্থাৎ সকল কর্ম্মের আশ্রয়কে পরিত্যাগ করিয়া কেবল এক সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মারূপ আমারই অনন্যভাবে শরণ গ্রহণ কর, আমি তোমাকে সকল পাপ হইতে মুক্ত করিব, তুমি শোক করিও না।"

কত সুন্দর দিব্য উপদেশ ! এ ছাড়া ধ্যানযোগ এবং ভক্তিযোগ সম্বন্ধীয় গ্রন্থের মধ্যে ধ্যানযোগ বিষয়ে পাতঞ্জলির যোগদর্শন এবং নারদসূত্র, শান্ডিল্য সূত্র হচ্ছে ভক্তিযোগ বিষয়ক প্রধান গ্রন্থ, অবশ্যই এতে কিছু মতভেদ রয়েছে, কিন্তু এই সকল গ্রন্থে ভক্তিযোগের বিষয়েই প্রতি‌াদন করা হয়েছে। এই গ্রন্থসকল ধারন করলে ভক্তিযোগ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যেতে পারে।

খুব বিস্তারিত ভাবে না লিখে শ্রীমদ্ভগবগীতার কিছু শ্লোক উদ্ধৃত করে এবং কিছু শ্লোকের শুধুমাত্র সংখ্যা লিখে পাঠকগণকে সংকেত মাত্র দেওয়া হয়েছে, যদি কোন ইচ্ছুক সজ্জন ব্যক্তি এই শ্লোক সমূহের অর্থ ধারন করেন সেই অনুসারে চলতে আরম্ভ করে দেন তাহলে আমার সম্মতিতে তাদের পরম কল্যাণরূপ মোক্ষ প্রাপ্তি অতি সহজভাবে হতে পারে।
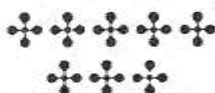
॥ শ্রী হরিঃ ॥

ভগবান কাহাকে বলে ?

ভগবান কি ? এ সম্বন্ধে যা কিছু বলতে চাই তা আমার সুনিশ্চিত ধারণা-প্রসূত কিন্তু আমার সুনিশ্চিত ধারনা ঠিক না হতে পারে । আমি একথা বলছি না যে ভগবান সম্পর্কে অন্যের ধারনাটি ঠিক নয় । কিন্তু আমার নিশ্চয়যুক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে আমার কোন সন্দেহ নেই, আমি এই বিষয়ে সংশয়াত্মা নই তথাপি অন্যের সুনিশ্চিত ধারণাকে ভুল বলার আমার কোন অধিকার নেই ।

ভগবান কি জিনিস ? এই শব্দের যথার্থ উত্তর এই যে তা ভগবানই জানেন । এ ছাড়া ভগবানের বিষয়ে যে সকল জ্ঞানী পুরুষ তাঁকে তত্ত্বতঃ জানেন তারা তাঁর তটস্থ অর্থাৎ কাছের কিছু ভাব জানতে পারেন । বাস্তবিক পক্ষে ভগবানের স্বরূপকে ভগবান-ই জানেন । তত্ত্বজ্ঞ ব্যাক্তিগণ সংকেত রূপে ভগবানের স্বরূপের কিছু বর্ণনা করতে পারেন, কিন্তু তাঁর সম্পর্কে যা কিছু জানতে এবং বর্ণনা করা যায়, প্রকৃতপক্ষে ভগবান তাঁর চেয়ে আরও মহিমাময় । বেদ, শাস্ত্র এবং মুনি-ঋষিগণ ভগবানের সম্বন্ধে চিরন্তনকাল থেকে বলে আসছেন, কিন্তু তাদের সেই বলা আজ পর্য্যন্ত পুরো হয় নি । আজ পর্য্যন্ত তাদের সব কথাকে একসঙ্গে ধরে কিংবা আলাদা আলাদা ভাবে করেও যদি কেউ পরমাত্মার যথার্থ স্বরূপের বর্ণনা করতে চান, তাহলে তার দ্বারাও পুরোপুরি বর্ণনা করা সম্ভব নয়, তা অসম্পূর্ণই থেকে যাবে । এই বিচারের ফলে এই নিশ্চয়ে আসা গেল যে, ভগবান অবশ্যই আছেন তাঁর অস্তিত্ব সম্বন্ধে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই, এটা সুনিশ্চিত । অতএব যে ব্যক্তি ভগবানকে নিজের মনে যেরূপ উপলব্ধি করে সাধনায় নিরত রয়েছেন তাঁর পরিবর্তনের কোন আবশ্যকতা নেই, কিন্তু প্রয়োজন হলে সংশোধন করে

নেওয়া উচিৎ । বাস্তবিক পক্ষে সাধনাকারীদের মধ্যে কেউই ভ্রমে পড়েনি অথবা এক প্রকারে সকলেই ভ্রমে পড়ে রয়েছে । যে পরমাত্মার জন্য সাধনায় রত রয়েছে সে তাঁরই দিকে অগ্রসর হচ্ছে এইজন্য কেউই ভ্রমে পড়েনি, এবং ভ্রমে এইজন্য রয়েছে যে, যে এক বস্তুকে সাধ্য অথবা ধ্যেয় মনে করে তার প্রাপ্তির জন্য সাধনা করে যাচ্ছে, তাদের সেই সাধ্য অথবা ধ্যেয় বস্তুর তুলনায় যথার্থ পরমাত্মার স্বরূপ আরো গভীর এবং ব্যপক । যা জ্ঞান-সংকেতে গ্রহণ যোগ্য এবং সাধন-সাধ্য, তা বস্তুতঃ ধ্যেয় পরমাত্মাকে প্রকাশের সাংকেতিক চিহ্ন মাত্র । সেইজন্য যে পর্য্যন্ত সেই ধ্যেয়-র প্রাপ্তি না ঘটে, সে পর্য্যন্ত সবাই ভ্রান্তিতে রয়েছে এরূপ বলা হয়েছে, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আগে ভূল ঠিক করে পরে সাধনা করব । ঠিক তো কেউ করতেই পারে না, যথার্থ প্রাপ্তি হবার পর তা আপনিই ঠিক হয়ে যায় । এর আগে পর্য্যন্ত যা কিছু হয় তা অনুমান করা হয় এবং সেই অনুমান দ্বারা যা কিছু করা হয়ে থাকে তাই-ই তাঁর প্রপ্তির সঠিক উপায় । যেমন, এক ব্যক্তি দ্বিতীয়ার চন্দ্র দেখেছে, না দেখা অন্য একজনকে সংকেত দ্বারা বলছে যে তুমি আমার মত করে দেখ, বৃক্ষের চার আঙ্গুল উপরে চন্দ্রমা রয়েছে । এরূপ কথনের ফলে তাঁর লক্ষ্য বৃক্ষের পাশ দিয়ে চন্দ্রমায় চলে যায় এবং সে চন্দ্র দেখে নেয় । বাস্তবে সে তার চোখের ভিতর ঢুকে গিয়ে দেখে না, চন্দ্র-ও সেই বৃক্ষের চার আঙ্গুল উপরে নেই এবং সে যত ছোট চন্দ্রমণ্ডল দেখে প্রকৃতপক্ষে তা তত ছোটও নয় । কিন্তু লক্ষ্য ঠিক হওয়ার ফলে সে তা দেখে নেয় । কেউ কেউ দ্বিতীয়ার চন্দ্রকে লক্ষ্য করাবার জন্য তৃণ প্রভৃতির দ্বারা বুঝিয়ে থাকেন, কেউ আরও স্পষ্ট ভাবে লক্ষ্য করাবার জন্য চুনের দাগ কেটে কিংবা অংকিত করে দেখিয়ে থাকেন, কিন্তু বাস্তবে চন্দ্রমার বাস্তবিক স্বরূপের সঙ্গে এদের কিছুমাত্রও সামঞ্জস্য নেই । এদের মধ্যে চন্দ্রমার প্রকাশ নেই, চন্দ্রমার সমান বড়ও নয় এবং এদের মধ্যে চন্দ্রমার অন্যান্য গুণও নেই । এইরূপে লক্ষ্য করে দেখার ফলে ভগবানকে দেখা বা জানা যেতে পারে । বাস্তবে লক্ষ্য এবং তার আসল স্বরূপও সেইরূপ পার্থক্য থাকে যেমন চন্দ্র এবং তার লক্ষ্যবস্তুতে

রয়েছে। চন্দ্রমার স্বরূপ তো সম্ভবতঃ কোন যোগী বলেও দিতে পারে কিন্তু ভগবানের স্বরূপ তো কেউ বলতেই পারে না, কেননা এ বলার বিষয় নয়। যখন প্রাপ্ত হবে তখনই তাঁর স্বরূপ জানা যাবে। যিনি প্রাপ্ত হবেন, তিনিও তা বুঝাতে পারবেন না। এটা তো প্রকৃত স্বরূপ সম্বন্ধে বলা হল। এবার জানানো হচ্ছে সাধকের ক্ষেত্রে এই লক্ষ্য বা ধ্যেয় কি ধরনের হওয়া উচিৎ এবং তা কি ভাবে বুঝাতে পারা যায়। এই বিষয়ে মহাত্মাগণের কাছে শুনে এবং শাস্ত্র অবলোকন করে, আমার অনুভবে যা নিশ্চয়াত্মকরূপে প্রত্যায়িত হয়েছে, তা বলা হচ্ছে। কারও যদি ইচ্ছা হয় তাহলে তিনি তা কাজে লাগাতে পারেন।

পরমাত্মার আসল স্বরূপের ধ্যান তো বাস্তবে সম্ভব হতে পারে না। যে পর্য্যন্ত নেত্র, মন এবং বুদ্ধিদ্বারা পরমাত্মার স্বরূপের অনুভব না হয়, সে পর্য্যন্ত যে ধ্যান করা হয়ে থাকে তা অনুমান করেই করা হয়ে থাকে। মহাত্মাদের কাছ থেকে শুনে, শাস্ত্রে পড়ে এবং চিত্র প্রভৃতি দেখে সাধন করলে সাধকের পরমাত্মার দর্শন হতে পারে। একথা আগে বলা হয়েছে যে, বর্ত্তমানে যে যেভাবে পরমাত্মার ধ্যান করে যাচ্ছেন, তারা যেন সে ভাবেই তা করে যান, পরিবর্ত্তনের আবশ্যকতা নেই। অবশ্য কিছু সংশোধনের আবশ্যকতা রয়েছে।

কিভাবে ধ্যান করা উচিত ?

কিছু লোক নিরাকার শুদ্ধ ব্রহ্মের ধ্যান করে থাকেন, কেউ সাকাররূপে দুভূজধারী, আবার কেউ চতুর্ভুজধারী ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করেন, বাস্তবে ভগবান বিষ্ণু, রাম এবং কৃষ্ণ যেমন একই, তেমনিই দেবী, শিব, গণেশ এবং সূর্য্যও তাদের থেকে ভিন্ন নয়। এরূপ অনুমান করা হয় যে, লোকেদের ভিন্ন ভিন্ন ধারণা অনুযায়ী একই পরমাত্মার নিরূপণের জন্য, শ্রীব্যাসদেব আঠারো পুরাণের রচনা করেছিলেন, যে দেবতার নামে যে পুরাণ রচিত হয়েছিল, তাতে তাঁকেই সর্বশ্রেষ্ঠ, সৃষ্টিকর্তা, সর্বগুণ সম্পন্ন ঈশ্বর বলা হয়েছে। বাস্তবে ভিন্ন ভিন্ন নাম-রূপে সকল দেবতার মধ্যে সেই এক পরমাত্মার কথা বলা হয়েছে। নাম-

রূপের ভাবনা সাধক নিজের ইচ্ছা অনুসারে করতে পারে, যদি কেউ একটি স্তম্ভকে-ই পরমাত্মা বলে মেনে নিয়ে তার ধ্যান করে তাহলে তাও পরামাত্মারই ধ্যান, কিন্তু লক্ষ্য বস্তুতে অতি অবশ্যই ঈশ্বরের পূর্ণ ভাব থাকা চাই।

সাকার এবং নিরাকারের ধ্যানের মধ্যে সাকারের অপেক্ষা নিরাকারের ধ্যান কিছুটা কঠিন, উভয়েরই ফল এক, শুধু সাধনায় ভেদ আছে। অতএব নিজ নিজ প্রীতি অনুসারে সাধক নিরাকার অথবা সাকারের ধ্যান করতে পারেন।

নিরাকারের উপাসক যদি সাকারের ভাব সঙ্গে না রেখে কেবল নিরাকারের-ই ধ্যান করেন তাহলেও এতে কোন আপত্তি নেই, কিন্তু সাকারের তত্ত্ব উপলব্ধি করে পরমাত্মাকে সর্বদেশী, বিশ্বরূপ মেনে নিয়ে নিরাকারের ধ্যান করলে ফল শীঘ্র হয়। সাকারের তত্ত্ব না বুঝলে সফলতায় কিছুটা বিলম্ব হয়।

সাকারের উপাসকের নিরাকার, সর্বব্যাপী ব্রহ্মের তত্ত্ব জানা আবশ্যক, এতে সে অনায়াসেই অতি দ্রুত সাফল্য লাভ করতে পারে। শ্রীভগবান সর্বব্যাপী ব্রহ্মের প্রভাব উপলব্ধি করে ধ্যান করার ওপর বেশী গুরুত্ব আরোপ করেছেন।

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে।
শ্রদ্ধয়া পরয়োপেতাস্তে মে যুক্ত তমা মতাঃ॥

"হে অর্জুন! আমাতে মন একাগ্র করে নিরন্তর আমার ভজন, ধ্যানে মগ্ন থেকে★ যে ভক্তগণ অতিশয় শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার সঙ্গে যুক্ত হয়ে সগুণ পরমেশ্বররূপ আমাকে ভজনা করেন, তারা যোগীদিগের মধ্যেও অতি উত্তম যোগী বলে আমার মতে মান্য অর্থাৎ তাদের আমি অতি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করি।

★ অর্থাৎ গীতা ১১ অধ্যায়ের ৫৫ নং শ্লোকে যে ভাবে বলা হয়েছে সে ভাবে নিরন্তর আমাতে লগ্ন হয়ে।

বাস্তবিক পক্ষে নিরাকারের প্রভাব জেনে সাকারের যে ধ্যান করা হয়, উহাই হচ্ছে শীঘ্র ভগবদ্ প্রাপ্তির উত্তম এবং সুলভ-সাধন। কিন্তু পরমাত্মার আসল স্বরূপ তো এই দুই থেকেও অলৌকিক, যার ধ্যান করা সম্ভব নয়। নিরাকার ধ্যান করার বেশ কিছু যুক্তি (উপায়) রয়েছে। যার কাছে যেটা সুগম মনে হয়, সে সেটাই অভ্যাস করুন। সবার ফল একই। এখানে কিছু উপায় সম্বন্ধে বলা হচ্ছে।

সাধক শ্রীগীতার ৬ অধ্যায়ের ১১ থেকে ১৩ শ্লোক অনুযায়ী একান্ত স্থানে স্বস্তিক কিংবা সিদ্ধাসনে বসে, নেত্রের দৃষ্টিকে নাসিকার অগ্রভাগে রেখে অথবা চোখ বন্ধ করে (নিজের ইচ্ছানুযায়ী) নিয়মপূর্বক প্রতিদিন কমপক্ষে ৩ ঘণ্টা ধ্যানের অভ্যাসে অতিবাহিত করা উচিৎ। তিন ঘণ্টা যদি কেউ না পারেন তাহলে দুই ঘণ্টা করুন এবং দু ঘণ্টা না হলে এক ঘণ্টা অতি অবশ্য ধ্যান করা উচিৎ। প্রারম্ভে যদি মন না লাগে তাহলে ১৫/২০ মিনিট থেকে আরম্ভ করে ধীরে ধীরে ধ্যানের সময় বাড়িয়ে যাওয়া উচিৎ। যে সাধকগণ অতি শ্রীঘ্রই প্রাপ্তির ইচ্ছা রাখেন তাদের তিন ঘণ্টার অভ্যাস আবশ্যক। ধ্যানে নাম-জপের দ্বারা খুব সহায়তা পাওয়া যায়। ঈশ্বরের সব নামই সমান, কিন্তু নিরাকারের উপাসনায় ওঁ-কার প্রধান। যোগদর্শনে মহর্ষি পাতঞ্জলি বলেছেনঃ–

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। তয্যপস্তদর্থভাবনম্ (সা॰পদ ১।২৭-২৮)

তার বোধক হচ্ছে প্রণব (ওঁ), সেই প্রণবের জপ করা এবং তার অর্থরূপের অন্তরালে (পরমাত্মার) ধ্যান করা উচিৎ।

এই সূত্রসমূহের আধার হচ্ছে–"**ঈশ্বরপ্রাণিধানাদ্বা** (যোগ॰১।২৩) এতে ভগবানের শরণ হবার এবং দুটোর মধ্যে প্রথমটিতে ভগবানের নাম জানিয়ে দ্বিতীয়টিতে নাম-জপ এবং স্বরূপের ধ্যান করার কথা বলা হয়েছে।

মহর্ষি পাতঞ্জলির পরমেশ্বরের স্বরূপ সম্বন্ধীয় অন্যান্য মত সম্বন্ধে আমার এখানে কিছুই বলার নেই। এখানে আমার বলার অভিপ্রায় শুধু এইটুকুই যে, ধ্যানের লক্ষ্য ঠিক করার জন্য পাতঞ্জলির কথানুসারে

স্বরূপের ধ্যান করতে করতে নামের জপ করা উচিৎ। ওঁ এর জায়গায় যদি কেউ "আনন্দময়" অথবা "বিজ্ঞানানন্দঘন" ব্রহ্মের জপ করেন, তাহলেও কোন আপত্তি নেই। যা কিছু বিভেদ তা নামেই রয়েছে, ফলে কোন তফাৎ নেই।

সবচেয়ে উত্তম জপ হচ্ছে সেইটি, যা মন দ্বারা হয়, যাতে জিভ নাড়াবার এবং ওষ্ঠদ্বারা উচ্চারণ করার কোন আবশ্যকতা হয় না। এরূপ জপে, ধ্যান এবং জপ দুটোই একসঙ্গে হতে পারে। অন্তঃকরণের চার উপকরণের মধ্যে দুইটি প্রধান হচ্ছে মন এবং বুদ্ধি, বুদ্ধিদ্বারা প্রথমে পরমাত্মার স্বরূপের নিশ্চয় করে নিয়ে উহাতে বুদ্ধিকে স্থির করে নিন, তারপর মনের দ্বারা সেই সর্বত্র পরিপূর্ণ আনন্দময়ের পুণঃ পুণঃ আবৃত্তি করতে থাকুন। ইহা জপ এবং ধ্যান দুই-ই। বাস্তবে আনন্দময়ের জপ এবং ধ্যানে কোন বিশেষ তফাৎ নেই। এই দুই কাজই একসাথে করা যেতে পারে। দ্বিতীয় যুক্তি হচ্ছে শ্বাস দ্বারা জপ করুন, জিভ এবং ওষ্ঠকে বন্ধ রেখে শ্বাসের সঙ্গে নামের আবৃত্তি করে যান, ইহাই হচ্ছে প্রাণজপ, একে প্রাণ দ্বারা উপাসনা বলা হয়। এই জপও হচ্ছে উচ্চ শ্রেণীর। যদি এরূপ হওয়া সম্ভব না হয়, তাহলে মনে মনে ধ্যান করুন এবং জিভ দ্বারা উচ্চারণ করুন, কিন্তু আমার মতে এদের মধ্যে সাধকের পক্ষে অধিক সুগম এবং লাভদায়ক হচ্ছে শ্বাসদ্বারা জপ করা। এটা তো হল জপ সম্বন্ধীয় কথা, আসলে নিরাকার এবং সাকার উভয় প্রকারের ধ্যানেই জপ হওয়া উচিৎ। এবার নিরাকারের ধ্যান সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে– একান্তস্থানে স্থির আসনে বসে একাগ্র চিত্তে এরূপ অভ্যাস করুন ঃ- যে কোনও বস্তু ইন্দ্রিয় এবং মনে প্রতীত হয় তাকে কল্পিত মনে করে তার ত্যাগ করতে থাকুন। যা কিছু প্রতীত হচ্ছে, বাস্তবে তা নেই। স্থূল শরীর, জ্ঞানেন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি, প্রভৃতি কিছুই নেই, এইভাবে সব কিছুর অভাব করতে করতে, যে অভাব করছে সেই পুরুষের বৃত্তি–যাকে জ্ঞান, বিবেক এবং প্রত্যয়ও বলা হয়, এইসব হচ্ছে শুদ্ধ বুদ্ধির কার্য্য, এখানে বুদ্ধিই হচ্ছে এদের অধিকরণ যার দ্বারা পরমাত্মার স্বরূপের চিন্তন হয়ে থাকে এবং প্রতীত হওয়া প্রত্যেকটি

বস্তুতে – "এটা নয়, এটা নয়", এই ধরণের অভাব হয়ে যায়, ইহাকে বেদগ্রন্থে "নেতি-নেতি এরূপ নয়, ওরূপও নয়"– বলা হয়েছে) অর্থাৎ দৃশ্যের অভাবকারী বৃত্তিও শান্ত হয়ে যায় । ওই বৃত্তির ত্যাগ করতে হয় না, কিন্তু নিজে নিজেই ত্যাক্ত হয়ে যায় । ত্যাগ করা হলে তো, যে ত্যাগ করে সে, ত্যাজ্য বস্তু এবং ত্যাগ এই ত্রিপুটি এসে যায় । যেমন, ইন্ধনের অভাবে অগ্নি নিজে নিজেই শান্ত হয়ে যায়, এই প্রকারে বিষয় সমূহের সর্বথা অভাব হলে বৃত্তি সমূহও সর্বথা শান্ত হয়ে যায় । অবশেষে যা থাকে, তাই হচ্ছে পরমাত্মার স্বরূপ । একেই নির্বীজ সমাধি বলা হয় ।

তস্যাপি নিরোধে সর্বনিরোধান্নির্বীজঃ সমাধিঃ ।
(যোগঃ ১/৫১)

এখানে এই সন্দেহ হয় যে, ত্যাগের পরে ত্যাগী রয়ে যায় । সে হচ্ছে অল্প, পরমাত্মা হচ্ছে মহান্, কাজেই সেই অবশেষকারীকেই পরমাত্মার স্বরূপ কিভাবে বলা যায় ? ঠিক কথা, কিন্তু সে সেই পর্য্যন্ত অল্প রয়েছে যে পর্য্যন্ত সে এক সীমাবদ্ধ স্থানে নিজেকে মেনে নিয়ে বাদবাকি সব জায়গা অন্যদের দিয়ে ভরে আছে বলে মনে করে । দ্বিতীয় সমস্ত বস্তুর অভাব হয়ে গেলে শেষে শুধুমাত্র এক "পরমাত্ম-তত্ত্বই" অবশেষে থেকে যায় । সংসারকে শিকড়ের সঙ্গে উপড়ে তুলে ফেললে শুধুমাত্র পরমাত্মা রয়ে যান । উপাধিসমূহের বিনাশ হওয়া মাত্রই সমস্ত ভেদ মিটে গিয়ে অপার একরূপ পরমাত্মার স্বরূপ রয়ে যায়, উহাই সব জায়গায় পরিপূর্ণ এবং সব দেশে-কালে ব্যাপ্ত । বাস্তবে দেশ-কালও ওর মধ্যে শুধুই কল্পিত । উহা তো এক এবং অনন্য পদার্থ, যা নিজেই নিজের মধ্যে স্থিত রয়েছে, যা অনর্বচনীয় এবং অচিন্ত্য । যখন চিন্তনের সর্বথা ত্যাগ হয়ে যায়, তখনই সেই অচিন্ত ব্রহ্মের ভান্ডার বেরিয়ে পড়ে, সাধক তাতে গিয়ে মিশে যায় । যে পর্য্যন্ত অজ্ঞানের আড়ালে অন্যান্য পদার্থ ভরে ছিল, সে পর্য্যন্ত সেই ভান্ডার অদৃশ্য ছিল । অজ্ঞান মিটে গেলে একটিই বস্তু রয়ে যায়, তখন তাতে মিশে যাওয়া অর্থাৎ সম্পূর্ণ বৃত্তিসমূহের শান্ত হয়ে সেই একই বস্তুর থাকা নিশ্চিত ।

ঘটাকাশ মহাকাশ থেকে ততক্ষণই আলাদা থাকে, যে পর্য্যন্ত ঘট ভেঙ্গে না যায়। ঘট ভাঙ্গাই হচ্ছে অজ্ঞানের বিনাশ হওয়া, কিন্তু এই দৃষ্টান্তও পুরোপুরি খাটে না। কেননা ঘট ভাঙ্গলে তার সেই ভাঙ্গা টুকরো দিয়ে আকাশের কিছু অংশ আচ্ছাদিত হয়, কিন্তু এখানে অজ্ঞানরূপী ঘটের বিনাশ হয়ে গেলে জ্ঞানের সামান্যতম অংশেরও আচ্ছাদন করার জন্য কোন পদার্থের অবশেষ থাকে না। ভ্রম মেটার সঙ্গে সঙ্গে জগতের সর্বথা অভাব হয়ে যায়। তখন যা থেকে থাকে, তাহাই ব্রহ্ম। উদাহরণার্থ যেমন, জীব হচ্ছে ঘটাকাশ, পরমাত্মা মহাকাশ। উপাধিরূপী ঘট বিনষ্ট হলে দুটোই একরূপ হয়ে যায়। একরূপ তো আগেও ছিল, কিন্তু উপাধিরূপী বিভেদের দ্বারা বিভেদ প্রতীত হচ্ছিল।

বাস্তবে আকাশের দৃষ্টান্ত পরমাত্মার ক্ষেত্রে সর্বদেশী নয়। আকাশ জড় কিন্তু পরমাত্মা জড় নন। আকাশ দৃশ্য কিন্তু পরমাত্ম দৃশ্য নন। আকাশ বিকারশীল কিন্তু পরমাত্মা বিকারশূণ্য। আকাশ অনিত্য, মহাপ্রলয়ে এর নাশ হয়ে যায়, পরমাত্মা নিত্য। আকাশ শূণ্য, সব কিছু এর মধ্যে রয়েছে, পরমাত্মা ঘন, উহাতে অন্য কিছুর প্রবেশ সম্ভব নয়। আকাশের চেয়ে পরমাত্মা অত্যন্ত বিলক্ষণ। ব্রহ্মের এক অংশে মায়া রয়েছে, যাকে অব্যাকৃত প্রকৃতি বলা হয়, তার এক অংশে রয়েছে মহত্তত্ত্ব (সমষ্টি-বুদ্ধি), যে বুদ্ধির দ্বারা সকলের বুদ্ধি হয়ে থাকে, সেই বুদ্ধির এক অংশে রয়েছে অহংকার, সেই অহংকারের এক অংশে আকাশে, আকাশ বায়ু, বায়ুতে অগ্নি, অগ্নিতে জল এবং জলে পৃথিবী। এইরূপ প্রক্রিয়ায় ইহা সিদ্ধ হয় যে, সমস্ত ব্রহ্মান্ড মায়ার এক অংশে রয়েছে এবং সেই মায়া হচ্ছে পরমাত্মার এক অংশে, এই ন্যায়দ্বারা সিদ্ধ হল যে পরমাত্মার তুলনায় আকাশ অত্যন্তই অল্প কিন্তু পরমাত্মাকে জানতে পারলেই এই অল্পতা সম্বন্ধে জানা যায়। যেমন, এক ব্যাক্তি স্বপ্ন দেখছে। স্বপ্নে তাঁর কাছে দিক, কাল, আকাশ, বায়ু, অগ্নি, সূর্য্য, চন্দ্র, দিন, রাত প্রভৃতি সমস্ত পদার্থ ভাসিত হচ্ছে, খুবই বিস্তারিত দেখা যাচ্ছে, কিন্তু চোখ খোলার সঙ্গে সঙ্গেই সেই সমগ্র সষ্টির অত্যন্ত অভাব হয়ে যায়, তখন টের পাওয়া

যায় যে সেই সৃষ্টি তো নিজেরই সংকল্প দ্বারা নিজেরই মধ্যে ছিল, যা আমার মধ্যে ছিল তা নিশ্চয়ই আমার চেয়ে ছোট বস্তু ছিল, আমি তো তার চেয়ে বড় । বাস্তবে তো ছিলই না, কেবলমাত্র কল্পনাই ছিল, কিন্তু যদি ছিল তাহলে অত্যন্ত অল্প ছিল, আমার এক অংশে ছিল, আমারই সংকল্প ছিল অতএব আমার থেকে ভিন্ন কোন বস্তু ছিল না । এই জ্ঞান চোখ খুললে – জাগলে হয়, এই প্রকারে পরমাত্মার সত্যিকারের স্বরূপ জেনে উঠলে এই সৃষ্টিও থাকে না । কোথাও থাকে, যদি এরূপ মানা হয়, তাহলে মহাপুরুষদের কথানুসারে ইহা পরমাত্মার এক সামান্যতম অংশে এবং সংকল্পমাত্রে থাকে ।

সেইজন্য আকাশের দৃষ্টান্ত পরমাত্মার ক্ষেত্রে পূর্ণরূপে খাটে না । এইটুকু অংশে খাটে যে, মনুষ্যের দৃষ্টিতে যেমন আকাশ নিরাকার বাস্তবে ব্রহ্মও সেইরূপ নিরাকার । মনুষ্যের দৃষ্টিতে আকাশের যেমন অনন্ত ভাসিত হয় তেমনই ব্রহ্ম সত্য, অনন্ত । মনুষ্যের দৃষ্টিতে বোঝাবার জন্য আকাশের উদাহরণ দেওয়া হয় । এই সমস্ত বস্তুসমূহের অভাব হলে সেই প্রাপ্ত জিনিসটি কেমন, তার স্বরূপ কেউ বলতে পারে না, উহা অত্যন্ত বিলক্ষণ । সূক্ষ্মদর্শী মহাত্মাগণ উহাকে **"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"** বলেন । উহা অপার, অসীম, চেতন, জ্ঞাতা, ঘন, আনন্দময়, সুখরূপ, সৎ, নিত্য । এই প্রকারের বিশেষণদ্বারা তাঁরা সেই বিলক্ষণ বস্তুকে নির্দেশ করে থাকেন । তাঁর প্রাপ্তি হয়ে গেলে আর কখনও পতন হয় না । দুঃখ, ক্লেশ, শোক, অল্পতা, বিক্ষেপ, অজ্ঞান এবং পাপ প্রভৃতি সকল বিকার সমূহের চিরকালের জন্য আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়ে যায় । এক সত্য, জ্ঞান, বোধ, আনন্দরূপ ব্রহ্মের বাহুল্যের জাগৃতি থাকে । এই জাগৃতিও কেবল বোঝাবার জন্য বলা হয় । বাস্তবে তো কিছু বলতে পারা যায় না ।

অনাদিমৎপরং ব্রহ্ম ন সত্তন্নাসদুচ্যতে । (গীতা ১৩ /১২)

সেই আদিরহিত পরম ব্রহ্ম অনির্বচনীয় হওয়ায়, সৎ বলা যায় না আবার অসৎও বলা যায় না ।

যদি জ্ঞানের ভোক্তা বলেন তাহলে কোন ভোগ নেই। যদি জ্ঞানরূপ বা সুখরূপ বলেন তাহলে কোন ভোক্তা নেই। ভোক্তা, ভোগ, ভোগ্য সবকিছুই শুধু একই রয়ে যায়, উহা এমন একটি জিনিস যেখানে ত্রিপুটি থাকে না। এই এক প্রকারের ধ্যানের বিধি বলা হল।

ধ্যানের অন্য বিধি

একান্ত স্থানে বসে চোখ বন্ধ করে এই ভাবনা করুন যে, যেন সৎ চিৎ আনন্দঘনরূপী সমুদ্রের অত্যন্ত বন্যা এসেছে এবং আমি তাতে গভীর ভাবে ডুবে রয়েছি। অনন্ত-বিজ্ঞানানন্দঘন সুমুদ্রে নিমগ্ন রয়েছি। পরমাত্মার সংকল্পে সমগ্র সংসার ছিল, উনি সংকল্প ত্যাগ করেছেন, ফলে আমাকে বাদ দিয়ে সংসারের অভাব হয়ে, সর্বত্র এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই রয়ে গিয়েছেন। আমি পরমাত্মার ধ্যান করছি কাজেই পরমাত্মার সংকল্পে আমি রয়েছি, আমাকে ছেড়ে বাদ বাকি আর সবার অভাব হয়ে গেছে। পরমাত্মা যখন আমার সংকল্প ছেড়ে দেবেন, তখন আমিও থাকব না, কেবলমাত্র পরমাত্মা-ই রয়ে যাবেন। যদি পরমাত্মা আমার সংকল্প ত্যাগ না করে আমাকে স্মরণ রাখেন তাহলেও খুব আনন্দের কথা। এভাবে ভেদসহিত নিরাকারের উপাসনা করুন।

এতে সাধনকালে ভেদ এবং সিদ্ধকালে অভেদ হয়, পরমাত্মা সংকল্পের ত্যাগ করা মাত্র শুধু এক পরমাত্মা রয়ে যান। এটি এক যুক্তি, এর অতিরিক্ত নিরাকার ধ্যানের আরও কিছু যুক্তি রয়েছে, তার মধ্যে দুইটি যুক্তি "প্রকৃত সুখ লাভের উপায়" শীর্ষক লেখায় বলা হয়েছে, সেখানে দেখা উচিৎ। বলার অভিপ্রায় হচ্ছে এই যে, নিরাকারের ধ্যান দু-প্রকারের হয় ভেদ দ্বারা এবং অভেদ দ্বারা। উভয়ের ফল হচ্ছে একই অভেদ পরমাত্মার প্রাপ্তি। যারা জীবকে সদা অল্প মেনে পরমাত্মা থেকে নিজেকে কখনও অভেদ মানেন না, তাদের মুক্তিও অল্প হয়, চিরকালের জন্য তারা মুক্ত হন না। প্রলয়কালের পর পুনরায় তাদের ফিরে আসতেই হয়, এই মুক্তিবাদের সিদ্ধান্তে ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েও তারা আলাদা থেকে যান।

এখন সাকারের ধ্যান সম্বন্ধে কিছু বলা হচ্ছে। সাকারের উপাসনার ফল দুই প্রকারের হয়ে থাকে। সাধক যদি সদ্যোমুক্তি চায়, শুদ্ধ ব্রহ্মে একরূপে মিলিত হতে চায়, তাহলে তাতে মিশে যায়, তার সদ্যোমুক্তি হয়ে যায়, কিন্তু যদি সে এরূপ ইচ্ছা করে যে, আমি দাস, সেবক অথবা সখা হয়ে ভগবানের সমীপে নিবাস করে প্রেমানন্দ ভোগ করি অথবা আলাদা রয়ে গিয়ে সংসারে ভগবদ্‌প্রেম প্রচার রূপ পরম সেবা করি তাহলে সে সালোক্য, সারুপ্য, সমীপ্য, সাজুয্য প্রভৃতি মুক্তির মধ্যে থেকে যথা রুচি যে কোন একটি মুক্তি পেয়ে যায়, এবং মৃত্যুর পর সে ভগবানের পরম নিত্যধামে চলে যায়। মহাপ্রলয় পর্য্যন্ত নিত্যধামে বাস করে অবশেষে পরমাত্মার সঙ্গে মিশে যায়, অথবা সংসারের উদ্ধারের জন্য কারক পুরুষ হয়ে জন্মও নিতে পারেন, কিন্তু জন্ম নিলেও তিনি কোন বাঁধনের ফাঁসে বদ্ধ হন না। মায়া তাকে কিঞ্চিৎ পরিমাণও দুঃখ কষ্ট দিতে পারে না, তিনি নিত্য মুক্তই থাকেন। এরূপ সাধক যে নিত্যধামে গমন করেন সেই পরমধাম সর্বোপরি, সব থেকে শ্রেষ্ঠ। তার পরে এক সচ্চিদানন্দঘন নিরাকার শুদ্ধ ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই। তা সতত ভাবে আছে, সকল লোক বিনাশ হলেও উহা এক ভাবে থাকে। তার স্বরূপ কেমন ? ইহা সেই জানে, যে সেখানে পৌঁছে যায়। সেখানে গেলে সকল ভ্রান্তি মিটে যায়। তার সম্বন্ধে যে সকল সম্পূর্ণ ভিন্ন-ভিন্ন কল্পনা রয়েছে, সেখানে পৌছে যাবার পর তা এক যথার্থ সত্যস্বরূপে পরিণত হয়ে যায়। মহাত্মাগণ বলেন যে, যে সকল ভক্তগণ সেখানে পৌছে যান, তারা প্রায় সেই সকল শক্তি এবং সিদ্ধি প্রাপ্ত হন যা ভগবানে রয়েছে, কিন্তু সেই ভক্তগণ ভগবানের সৃষ্টিকার্য্যের বিরুদ্ধে তার ব্যবহার কখনও করেন না। সেই মহামহিম প্রভূর দাস, সখা অথবা সেবক হয়ে যারা সেই পরমধামে সদা সমীপে নিবাস করেন, তারা সর্বদা তার আজ্ঞানুসারেই চলেন। সেই পরম ধামে সাধকদের যাওয়ার নিদর্শন শ্রীমদ্ভগবগীতার অষ্টম অধ্যায়ের ২৪ নং শ্লোকে করা হয়েছে। বৃহদারণ্যক এবং ছন্দোগ্য উপনিষদেও এই অর্চিমার্গের বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। এই নিত্যধামকেই সম্ভবতঃ ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের উপাসক গোলোক এবং ভগবান শ্রীরামের উপাসক সাকেতলোক বলে থাকেন । বেদে একই সত্যলোক এবং ব্রহ্মলোক বলা হয়েছে । (যেখানে ব্রহ্মা নিবাস করেন, যার বর্ণনা গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১৬ নং শ্লোকের পূর্বার্ধে করা হয়েছে, সেই ব্রহ্মলোক নয়) । ভগবান সাকাররূপে এই নিত্যধামেই অবস্থান করেন । সাকাররূপ মেনে নিত্য পরমধামকে স্বীকার না করা খুব বড় ভুল ।

ভক্তদের জন্য ভগবান কিভাবে সাকার হন ?

পরমাত্মা সৎ চিৎ আনন্দঘন নিত্য অপাররূপে সব জায়গায় পরিপূর্ণ রয়েছেন । উদাহরণ হিসাবে অগ্নির নাম নেওয়া যেতে পারে । অগ্নি নিরাকার রূপে সব জায়গায় ব্যাপ্ত রয়েছে, প্রকট করবার সামগ্রী একত্র করে সাধন করলেই তা প্রকট হয়ে যায় । প্রকটিত হলে তাঁর ব্যাক্তরূপ সেই পরিমাণ আয়তনযুক্ত হয়, যা কাঠ প্রভৃতি পদার্থের রয়েছে । এই প্রকার, গুপ্তরূপে সর্বত্র ব্যাপক অদৃশ্য সূক্ষ্ম নিরাকার পরমাত্মাও ভক্তের ইচ্ছানুসারে সাকাররূপে প্রকটিত হন । বাস্তবে অগ্নির ব্যাপকতার উদাহরণও এক দেশীয়, কেননা যেখানে শুধু আকাশ কিংবা বায়ুতত্ত্ব রয়েছে, সেখানে অগ্নি নেই, কিন্তু পরমাত্মা তো সর্বত্র পরিপূর্ণ রয়েছেন, পরমাত্মার ব্যাপকতা সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ এবং বিলক্ষণ । এমন কোন স্থান নেই যেখানে পরমাত্মা নেই এবং সংসারে এমন কোন স্থান নেই যেখানে পরমাত্মার মায়া নেই । যেখানে দেশ-কাল সেখানেই মায়া । মায়ারূপ সামগ্রী নিয়ে পরমাত্মা যেখানে খুশী প্রকট হতে পারেন । যেখানে জল রয়েছে, শীতলতা রয়েছে, সেখানেই বরফ জমতে পারে । যেখানে মাটি এবং কুমোর রয়েছে সেখানেই ঘট তৈরী হতে পারে । জল এবং মাটি তো সব জায়গায় নাও পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু পরমাত্মা এবং তার মায়া তো সংসারের সব জায়গায় রয়েছে, এই অবস্থায় তার প্রকট হতে কিসের কাঠিণ্য ? ভক্তের প্রেম চাই ।

हरि व्यापक सर्बत्र समाना । प्रेमतें प्रगट होहि मैं जाना ॥

("অর্থাৎ শিবঠাকুর পার্বতীকে বলছেন যে, হরি সর্বত্র সমান ভাবে ব্যাপ্ত রয়েছেন, তিনি প্রেমে প্রকটিত হন") ।

নিরাকারের ব্যাপকতা সম্বন্ধে সবাই চিন্তা-ভাবনা করতে পারে কিন্তু সাকাররূপে তো ভগবান কেবল ভক্তগণকেই দেখা দেন। তিনি সর্বশক্তিমান, যেমন ইচ্ছা করতে পারেন। একজনকে, অনেককে অথবা সবাইকে একসঙ্গে দর্শন দিতে পারেন, যেমন তাঁর ইচ্ছা। এই ইচ্ছা কিন্তু ছেলেদের খেলার ন্যায় দোষযুক্ত হয় না। তাঁর ইচ্ছা বিশুদ্ধ হয়। ভগবান বলেছেন যে, আমি ভক্তদের হৃদয়ে থাকি। ঠিকই কথা। যেমন আমাদের সকলের শরীরে নিরাকাররূপে অগ্নি স্থিত রয়েছে, সেই ভাবে ভগবানও সৎ, চিৎ, আনন্দঘন রূপে সকলের হৃদয়ে স্থিত রয়েছেন, কিন্তু ভক্তদের হৃদয়ে শুদ্ধ হবার ফলে তাতে তিনি প্রত্যক্ষ হন, ইহাই হচ্ছে ভক্ত হৃদয়ের বৈশিষ্ট। সূর্য্যের প্রতিবিম্ব কাঠ, পাথর এবং দর্পণে সমানভাবে পড়ে, কিন্ত স্বচ্ছ দর্পণে তো উহা দেখা যায়, কাঠ বা পাথরে দেখা যায় না। এই প্রকারে ভগবান সকলের হৃদয়ে থাকলেও অভক্তিকর কাষ্ঠ-সদৃশ্য অশুদ্ধ হৃদয়ে দেখা দেন না এবং ভক্তদের স্বচ্ছ দর্পণ-সদৃশ্য শুদ্ধ হৃদয়ে প্রত্যক্ষ দেখা দেন। ভক্ত ধ্যান দ্বারা তাকে যেমন বোঝে ঠিক সেই ভাবেই তিনি তাঁর হৃদয়ে অবস্থান করেন।

মহাত্মাগণ বলেন যে, যেখানে কীর্ত্তন হয় সেখানে ভগবান স্বয়ং সাকাররূপে উপস্থিত থাকেন, কীর্ত্তনরত ভক্তকে সাকাররূপে দেখাও দেন। এরূপ মনে করা উচিৎ নয় যে ইহা কেবলমাত্র ভক্তের ভাবনা। বাস্তবে তাকে সত্যি সত্যিই দেখা দেন। শুধু প্রতীত হওয়া তা মায়ার কার্য্য। ভগবান হচ্ছেন মায়াশক্তির প্রভু। মহাপুরুষদের এই মান্যতা সত্য যে :-

মদ্ভক্তা যত্র গায়ন্তি তত্র তিষ্ঠামি নারদ ॥ (আদি॰ পু॰ ১৯।৩৫)

এরূপ হতে পারে যে ভগবান সাকাররূপে কীর্ত্তনে থেকেও কাউকে দেখা না দেন, কিন্তু তিনি স্বয়ং থাকেন এইরূপ বিশ্বাস রাখাই শ্রেয়।

ভগবান যখন যেখানে ইচ্ছা, ভক্তের ইচ্ছানুসারে যে কোন রূপে প্রকট হতে পারেন, অতএব ভক্ত আপন ভগবানের যে রূপেই ধ্যান করুন না কেন, একই ফল হবে। ময়ুরপুচ্ছ-মুকুটযুক্ত শ্যামসুন্দর ভগবান

শ্রীকৃষ্ণের ধ্যান করুন অথবা ধনুকবাণধারী মর্যাদাপুরুষোত্তম ভগবান শ্রীরামের ধ্যান করুন । শঙ্খ-চক্র-গদা-পদ্মধারী ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করুন অথবা বিশ্বরূপ বিরাট পরমাত্মার ধ্যান করুন, একই কথা । যে রূপের ধ্যান করুন না কেন, তাকে পূর্ণ মনে করে তা করা উচিৎ । এই প্রকারে জপও নিজের রুচি অনুসারে ওঁ, রাম, কৃষ্ণ, হরি, নারায়ণ, শিব প্রভৃতি যে কোন ভগবানের নামের জপ করুন, সকলের ফল একই । সগুণ, ধ্যানের কিছু বিধি "প্রেম ভক্তি প্রকাশ" এবং "প্রকৃত সুখ লাভের উপায়"★ প্রবন্ধে দেওয়া হয়েছে । সেখানে দেখে নেওয়া উচিৎ ।

এবারে ভগবানের বিশ্বরূপ সম্বন্ধে এখানে কিছু বলা হচ্ছে । ভগবান অর্জুনকে যে বিশ্বরূপ দেখিয়েছিলেন এবং বেদে বর্ণিত ভূর্ভুবঃ স্বরূপে এই ব্রহ্মাণ্ডও ভগবানের বিশ্বরূপ । দুটো একই কথা । সমগ্র বিশ্বই হচ্ছে ভগবানের স্বরূপ । স্থাবর-জঙ্গম সব কিছুতেই সাক্ষাৎ পরমাত্মা অবস্থিত রয়েছেন । সমস্ত বিশ্বকে পরমাত্মার স্বরূপ মনে করে তার সৎকার এবং সেবা করাই হচ্ছে বিশ্বরূপে পরমাত্মার সৎকার এবং তার সেবা । বিশ্বে যে সমস্ত দোষ অথবা বিকার রয়েছে, পরমাত্মার স্বরূপে তা নেই । বাজীকরের লীলার (খেল্) মত এ সমস্তই শুধু ক্রীড়ামাত্র । নাম-রূপ সবই কেবল খেলা । ভগবান তো সদা নিজেরই স্বরূপে স্থিত রয়েছেন । পরমাত্মা নিরাকাররূপে জলের ন্যায় সর্বত্র পরিপূর্ণ রয়েছেন, বরফে জল ভিন্ন অন্য কোন বস্তু নেই । জলের জায়গায় বরফের পিন্ড দেখা যাচ্ছে, বাস্তবে তা নেই, এই প্রকারে সেই শুদ্ধ ব্রহ্মে এই সংসার দেখাচ্ছে, বস্তুত নেই ।

সগুণরূপে অগ্নির ন্যায় অব্যক্ত হয়ে ব্যাপক রয়েছেন, যখন খুশী সাকাররূপে প্রকট হতে পারেন, এই কথাই উপরে বলা হয়েছে, এই ব্যাপক পরমাত্মাকে বিষ্ণু বলা হয়, বিষ্ণু শব্দের অর্থই হচ্ছে ব্যাপক ।

★ "প্রেম ভক্তি প্রকাশ" এবং "প্রকৃত সুখ লাভের উপায়" এই দুই প্রবন্ধ আলাদা ভাবেও পুস্তকাকারে গীতা প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে ।

ভগবান গুণাতীত, ভাল-মন্দ সকল গুণযুক্ত আবার কেবল সদ্‌গুণ সম্পন্ন

ভগবানে কোন গুণ নেই, তিনি গুণাতীত, ভাল-মন্দ সকল গুণই তার মধ্যে রয়েছে, এবং তার মধ্যে কেবল সদ্‌গুণ রয়েছে, দুর্গুণ একেবারেই নেই। ভগবান সম্বন্ধে এই তিনটি কথাই বলা যায়। এই বিষয়টি একটু বোঝা উচিৎ।

শুদ্ধ ব্রহ্ম নিরাকার চেতন বিজ্ঞানানন্দঘন সর্বব্যাপী পরমাত্মার বাস্তবিক রূপ হচ্ছে সম্পূর্ণ গুণের সর্বথা অতীত জগতের সকল গুণ-অবগুণ সত্ত্ব, রজ এবং তম থেকে হয়। সত্ত্ব, রজ এবং তম এই গুণ হচ্ছে মায়ার অন্তর্গত, সেইজন্য এর নাম ত্রিগুণময়ী মায়া। এদের মধ্যে সত্ত্ব উত্তম, রজ মধ্যম এবং তম অধম। পরমাত্মা এই মায়ার চাইতে অত্যন্ত বিলক্ষণ, সর্বথা অতীত এবং গুণরহিত সেইজন্য এর নাম হচ্ছে শুদ্ধ। অতএব ইহা গুণাতীত।

বাস্তবে তো মায়া নেই, যদি মানাও হয় তাহলে তাও কল্পনা মাত্র। এই মায়ার কল্পনা হচ্ছে পরমাত্মার এক অংশে। গুণ-অবগুণ সবই মায়ায় রয়েছে। এই দৃষ্টিকোন থেকে দেখলে সত্য, দয়া, ত্যাগ, বিচার (চিন্তন) এবং কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ প্রভৃতি গুণ এবং অবগুণের সঙ্গে যুক্ত এই সম্পূর্ণ সংসার সেই পরমাত্মাতেই অধ্যারোপিত রয়েছে। এভাবে সকল সদ্‌গুণ এবং দুর্গুণ তার মধ্যে আরোপিত বলে মানা যেতে পারে। এভাবে তাকে ভাল-মন্দ সকল গুণ যুক্ত বলা যেতে পারে।

এই ব্রহ্মান্ড যার অন্তর্গত, সেই মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্ম সৃষ্টিকর্তা ঈশ্বর শুদ্ধ ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন নয়, তিনি মায়াকে নিজের অধীনে (আশ্রিত) করে প্রাদুর্ভূত হন, সময়ে সময়ে অবতার ধারন করেন, সেই জন্য তাকে মায়াবিশিষ্ট বলা হয়। গীতায় বলা হয়েছে ঃ—

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥(গীতা ৪।৬)

যে ভাবে অবতার হয়, ঠিক সেইভাবে সৃষ্টির আদিতেও মায়াকে নিজের অধীনে করেই ভগবান প্রকট হন। ইনারই নাম বিষ্ণু, এই

আদিপুরুষ বিষ্ণু সর্বসত্ত্বগুণ সম্পন্ন : সত্ত্বগুণের মূর্ত্তি । ইনি সাত্ত্বিক তেজ, প্রভাব, সামর্থ্য, বিভূতি প্রভৃতিতে বিভূষিত । দৈবী সম্পদের গুণই হচ্ছে সত্ত্বগুণ । যার স্বরূপই হচ্ছে শুদ্ধ সত্ত্ব । দুর্গুণ তো রজ এবং তমে থাকে, প্রেম হয় সাদৃশ্যতা এবং সমানতায় । এই জন্য যে ভক্তে দৈবী সম্পদের গুণ থাকে সেই ভগবানের দর্শন লাভের উপযুক্ত পাত্র হয় । মায়াবিশিষ্ট সগুণ ভগবান মায়াকে সঙ্গে নিয়ে সময়ে-সময়ে অবতার ধারণ করে থাকেন । তিনি সর্বগুণ সম্পন্ন । শুদ্ধ, স্বতন্ত্র, প্রভূ এবং সর্বশক্তিমান । এমন কিছুই নেই যা তিনি করতে পারেন না । এইজন্য যদিও সেই শুদ্ধ সত্ত্বগুণরূপ সগুণ সাকার পরমাত্মায় রজ এবং তমঃ বাস্তবে থাকে না, তবুও তিনি রজঃ-তমের কার্য্য করতে পারেন । ভগবান বিষ্ণু দুষ্ট দমন রূপ হিংসাত্মক কার্য্য করায় ন্যায় দেখান । মানব দৃষ্টিতে তাঁর মধ্যে হিংসা অথবা তমের প্রতীত হয় কিন্তু বস্তুতঃ ওনার মধ্যে তা নেই । ন্যায়কারী হওয়ার জন্য তিনি যথাবশ্যক কার্য্য করে থাকেন । রাজা জনক মুক্ত পুরুষ ছিলেন, পরম সাত্ত্বিক ছিলেন, কিন্তু রাজা হবার দরুণ ন্যায় করা হল তার কাজ । চোরদের তিনি দণ্ডও দিতেন । এতে দোষের কিছু নেই । মা নিজের প্রিয় সন্তানকে শিক্ষা দেবার জন্য ধমকান, কোন সময় দরকার মনে করলে হিতপূর্ণ হৃদয়ে এক-আধটি চড়-চাপড়ও লাগিয়ে দেন, কিন্তু এরূপ কাজেও তার শুধু দয়া ভরে থাকে । এই প্রকারে দয়ানিধি ন্যায়কারী ভগবানের দন্ডবিধানও দয়া যুক্তই হয়ে থাকে । ধর্মানুকূল কামও হল ভগবানের । ভগবান বলেছেন ঃ–

ধর্ম্মাবিরুদ্ধো ভূতেষু কামোঽস্মি ভরতর্ষভ ।

আমি ধর্ম্মযুক্ত কাম, কিন্তু পাপযুক্ত নয় । ভগবান সৎ, সাত্ত্বিক, শুদ্ধসত্ত্ব । তিনি মায়ার শুদ্ধসত্ত্ববিদ্যায় সম্পন্ন । জীব হচ্ছে অবিদ্যা সম্পন্ন । বিদ্যায় রয়েছে জ্ঞান, প্রকাশ । সেখানে অবগুণ এবং অন্ধকার কি ভাবে টিকতে পারে ? অবগুণ তো অবিদ্যায় থাকে । এই ন্যায়ের ফলে ঈশ্বর শুধু সদ্গুণ সম্পন্ন ।

উপরের বিবেচনার ইহা সিদ্ধ হল যে পরমাত্মাকে গুণাতীত, গুণা-গুণযুক্ত এবং শুধু সত্ত্বগুণসম্পন্ন বলা যেতে পারে ।

ভগবানের স্বরূপ এবং নিরাকার-সাকারের একতা

শরীরের ভেদ তিনটি – স্থূল, সূক্ষ্ম, এবং কারণ। যা চোখে পড়ে তা স্থূল, মরলে যা সঙ্গে যায় তা সুক্ষ্ম এবং যা মায়ার সঙ্গে লয় হয়ে যায় সেটা কারণ। শরীরের এই তিন ভেদ নিত্যপ্রতি দেখতে পারা যায়। জাগ্রত অবস্থায় স্থূল শরীর কাজ করে, স্বপ্নে এবং সুষুপ্তিতে কারণ (শরীর) থাকে। এই ভাবে পরমাত্মারও তিনটি স্বরূপ বলা যেতে পারে। মহাপ্রলয়ে হচ্ছে পরমাত্মার কারণ স্বরূপ, সেই সময় শুধু পরমেশ্বর এবং তাঁর প্রকৃতি থাকে, সমস্ত জীব প্রকৃতির ভিতর লয় হয়ে যায়। জীবের মধ্যেও প্রকৃতি পুরুষ এই দুইয়ের অংশ রয়েছে। চেতনতা হচ্ছে পরমাত্মার অংশ এবং অজ্ঞান প্রকৃতির। মায়ার উপাধির জন্য জীব মহাপ্রলয়েও মুক্ত হয় না। তারপর সৃষ্টির আদিতে আবার ঘুমিয়ে জেগে উঠার মত নিজের কর্মফলানুরূপ বিভিন্ন রূপে জেগে ওঠে। এই প্রকারে মহাপ্রলয়ে পরমাত্মার রূপকে কারণ বলা যেতে পারে।

পরমাত্মার সুক্ষ রূপ সব জায়গায় থাকে, এরই নাম হচ্ছে আদিপুরুষ, সৃষ্টির আদি কারণও ইহাই, এরই নাম হচ্ছে পুরুষোত্তম, সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বর।

স্থূলরূপে পরমাত্মা হচ্ছেন শঙ্খ-চক্র-গদা–পদ্মধারী ভগবান বিষ্ণু, যিনি সর্বদা নিত্যধামে অবস্থান করেন।

ভক্তের ভাবনা অনুসারেই ভগবান সেইরূপে হয়ে যান। এই সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে ভগবানের শরীর, এর ভিতরে আমাদের শরীর রয়েছে, এই দৃষ্টিতে আমরা সবাই ভগবানের শরীরে রয়েছি।

তত্ত্বের আরও এক দিক বুঝে নেওয়া উচিৎ। যখন আকাশ নির্মল থাকে, সূর্য্য উদিত থাকে, সেই সময় সূর্য্য এবং আমাদের মাঝখানে আকাশে কোন জিনিষ দেখা যায় না, কিন্তু সেখানে জল রয়েছে। ইহা স্বীকার করতেই হবে যে সূর্য্য এবং আমাদের মাঝখানে জল ভরে আছে কিন্তু তা দেখা যায় না, কেননা তা সুক্ষ্ম এবং পরমানুরূপে থাকে, যখন উহাতে ঘনতা আসে তখন উহা ক্রমশঃ স্থূল হয়ে ব্যক্ত হতে থাকে। সূর্য্যদেবের তাপে বাস্প তৈরী হয়, যখন বাস্প ঘন হয়, তখন উহা মেঘ

হয়, তখন উহাতে জলের সঞ্চার হয়। জলের মেঘ পাহাড় দিয়ে যাবার সময়, সেই সময় যদি কেউ সেখানে থাকে তাহলে বর্ষা না হলেও তার কাপড় ভিজে যাবে। মেঘে জলের ঘনতা হলে (জলের) বিন্দু তৈরী হয়, আরও ঘনতা হলে উহাই শীল হয়ে পড়তে থাকে। আবার সেই শীল বা বরফ তাপ পেয়ে গলে গিয়ে জল হয়, এবং অধিক তাপ পেলে আবার বাষ্প হয়ে যায়, বাষ্প আকাশে উড়ে অদৃশ্য হয়ে যায় এবং শেষে আবার জল সেই অব্যক্তরূপে পরমাণুতে পরিণত হয়ে যায়। এই পরমাণুরূপে স্থিত জলকে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পরমাণুকে সহস্রগুণ স্থূল করতে পারে, এরূপ অনুবীক্ষণ যন্ত্রদ্বারাও কেউ দেখতে পারে না। কিন্তু জল অতি অবশ্যই রয়েছে, যদি না থাকে তাহলে এল কোত্থেকে?

এই দৃষ্টান্ত অনুসারে পরমাত্মার স্বরূপ বোঝা উচিৎ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে :–

অক্ষরং ব্রহ্ম পরমং স্বভাবোঽধ্যাত্মমুচ্যতে ।
ভূতভাবোদ্ভবকরো বিসর্গঃ কর্ম্মসংজ্ঞিতঃ ॥
অধিভূতং ক্ষরো ভাবঃ পুরুষশ্চাধিদৈবতম্ ।
অধিযজ্ঞোঽহমেবাত্র দেহে দেহভৃতাংবর ॥ (গীতা ৮।৩-৪)

অর্জুনের সাতটি প্রশ্নের মধ্যে ছয়টি প্রশ্ন এরূপ ছিল যে, অধ্যাত্ম কি, কর্ম কি, অধিভূত কি, অধিদৈব কি এবং অধিযজ্ঞ কি? ভগবান উপর্যুক্ত শ্লোকে এর উত্তর দিয়েছেন যে, অক্ষর হচ্ছে ব্রহ্ম, স্বভাব হচ্ছে অধ্যাত্ম, শাস্ত্রোক্ত ত্যাগ হচ্ছে কর্ম, বিনাশশীল পদার্থসমূহ অধিভূত, সমষ্টিপ্রাণরূপে হিরণ্যগর্ভ দ্বিতীয় পুরুষ হচ্ছেন অধিদৈব এবং নিরাকার ব্যাপক বিষ্ণুরূপে অধিযজ্ঞ হচ্ছি আমি।

উপযুক্ত দৃষ্টান্তে এর দৃষ্টান্ত এই ভাবে বোঝা যেতে পারে :–

(১) পরমাণুরূপ জলের স্থানে :

শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন গুণাতীত পরমাত্মা, যাতে এই সংসার কখনও হয় নি এবং নেই, যা কেবল অতীত, পরম, অক্ষর।

(২) বাষ্পরূপ জল :

সেই শুদ্ধ ব্রহ্ম অধিযজ্ঞ নিরাকাররূপে ব্যাপ্ত হয়ে থাকা মায়াবিশিষ্ট ঈশ্বর।

(৩) মেঘ :

অধিদৈব, সকলের প্রাণাধার হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মা। সতেরো তত্ত্বের সমূহকে বলা হয় সুক্ষ্ম, এরমধ্যে প্রাণ প্রধান। সকলের প্রাণ মিলে সমষ্টিপ্রাণ হয়, এই সমষ্টিপ্রাণ প্রলয়ের সময়েও থাকে, কিন্তু মহাপ্রলয়ে, থাকে না। এই সতেরো তত্ত্বের সমূহ হচ্ছে হিরণ্যগর্ভ ব্রহ্মার সুক্ষ্ম শরীর।

(৪) জলের লক্ষ-কোটি বিন্দু

জগতের সমস্ত জীব।

(৫) বৃষ্টি :

জীবসমূহের ক্রিয়া।

(৬) জলের শীল অথবা বরফ :

পঞ্চভূতের অতি স্থুল সৃষ্টি।

এই সৃষ্টির স্বরূপ এত স্থুল এবং বিনাশশীল যে সামান্য তাপ লাগলেই ক্ষণিকের মধ্যেই শীল সমূহের গলে গিয়ে জল হয়ে যাবার মত, তৎক্ষণাৎ তা গলে যায়। এখানে তাপ বলতে সেই জ্ঞানাগ্নিরূপ প্রকাশ বোঝাচ্ছে যা উৎপন্ন হবার সঙ্গে সঙ্গেই স্থুল সৃষ্টিরূপী শীল তৎক্ষণাৎ গলে যায়।

অজ্ঞানই হচ্ছে শীত (ঠাণ্ডা)। যত বেশী অজ্ঞান থাকে স্থুলতাও তত বাড়ে, এবং যত জ্ঞান হয় ততই সূক্ষ্মতা হয়। যে পদার্থ যত ভারী হয়, তা ততই নীচে যায়, যত হালকা হয় ততই উপরে ওঠে। অজ্ঞানই হচ্ছে বোঝা (ভার), জল অত্যন্ত স্থুল হলে বরফ হয়ে যায় তখনই উহাকে নীচে পড়তে হয়, এই প্রকারে অজ্ঞানের বোঝায় (ভারে) স্থুল হলে জীবকে নীচে পড়তে হয়।

জ্ঞান রূপী তাপ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সংসারের ভার নেমে যায় এবং যেমন তাপ পেয়ে গলে জল হয়ে এবং আরও তাপ পেলে সেই জল

ধুঁয়ো কিংবা বাষ্প হয়ে উপরে উঠে যায়, তেমনিই জীবও উপরে উঠে যায়।

জীবাত্মা হচ্ছে ঈশ্বরের নিজেরই স্বরূপ, কিন্তু জড়তা বা অজ্ঞানের ফলে যখন ইহা স্থুল হয়ে যায় তখনই এর পতন হয়। অজ্ঞানই হচ্ছে পতনের কারণ এবং জ্ঞানই হচ্ছে উত্থানের কারণ। জীবাত্মা একবার সেই শেষ সীমানায় ওঠে গেলে আর পড়ে না। তার জ্ঞানে সব কিছু কেবল ঈশ্বরই হয়ে যায়, বাস্তবে তত্ত্বে তো সেই একই রয়েছেন। পরমাণু বাষ্প বিন্দু শীল– এ সমস্ত তো জলই। এই ন্যায়ের দ্বারা সকল বস্তু এক পরমাত্মতত্ত্বই, সেইজন্য যেভাবে চাইবেন, যেখানে চাইবেন, যে রূপে চাইবেন, প্রকট হয়ে যান। এই জ্ঞান হয়ে গেলে সাধক সব জায়গায় ঈশ্বরকেই দেখতে পায়। জলের তত্ত্ব বুঝে গেলে সব জায়গায় জলই দেখায়, পরমাণুতেও তাই এবং শীলেও তাই। অত্যন্ত সূক্ষ্মেও সেই এবং অত্যন্ত স্থূলেও সেই। এভাবে সূক্ষ্ম এবং স্থূলেও সেই এক পরমাত্মা রয়েছেন। **"আনোরণীয়ান্ মহতো মহীয়ান্ ।"** ইহাই হচ্ছে নিরাকার-সাকারের একরূপতা।

অজ্ঞানের দ্বারা অহংকার বাড়ে, অহংকার যত অধিক হয়,ততই সাংসারিক বস্তুকে অধিক গ্রহণ করে। সাংসারিক ভার যত বেশী হবে ততই সে নীচে চলে যাবে। তিনটি গুণ রয়েছে, এরমধ্যে তমোগুণ সব থেকে ভারী, কাজেই তমোগুণী পুরুষ নীচে চলে যায়। রজোগুণ সমান সামান, কাজেই রজোগুণী মাঝখানে মনুষ্যাদিতে রয়ে যায়। সত্ত্বগুণ হালকা, সেইজন্য সত্ত্বগুণী পরমাত্মার দিকে উপরে ওঠে ঃ–

"ঊর্দ্ধং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থাঃ"
"মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ"
"অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ"

হালকা জিনিষ উপরে ভাসে, ভারী ডুবে যায়। আসুরী সম্পদ হচ্ছে তমোগুণের স্বরূপ, সেইজন্য তা নীচে নিয়ে যায়, সত্ত্বগুণ হালকা হবার জন্য উপরে তুলে দেয়। দৈব-সম্পদ্ই হচ্ছে সত্ত্বগুণ, ইহা ঈশ্বরের

সম্পদ্ । যত-যত এই সম্পদ বেড়ে যায়, সাধক তত-ততই উপরে ওঠে অর্থাৎ পরমাত্মার সমীপে পৌছায় ।

এইভাবে সেই একই পরমাত্মাকে স্থুল এবং সূক্ষ্মে ব্যাপক বোঝা উচিৎ ।

পরমাত্মা ব্যাপকরূপে সবাইকে দেখেন এবং জানেন ।

সর্ব্বতঃ পাণিপাদং তৎ সর্ব্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

(গীতা ১৩।১৩)

সেই জ্ঞেয় কেমন ? সব দিকেই যার হাত-পা, সব দিকেই চোখ, মাথা এবং মুখ এবং সব দিকেই যার কান রয়েছে । এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তিনি নেই, এমন কোন শব্দ নেই যা তিনি শোনেন না, এমন কোন দৃশ্য নেই যা তিনি দেখেন না, এমন কোন বস্তু নেই যা তিনি গ্রহণ করেন না এবং এমন কোন জায়গা নেই যেখানে তিনি পৌঁছতে পারেন না ।

আমরা এখানে প্রসাদ নিবেদন করি, তিনি তৎক্ষণাৎ খেয়ে নেন । আমরা এখানে স্তুতি করি তিনি শোনেন । আমাদের প্রত্যেক ক্রিয়াকে তিনি দেখেন, কিন্তু আমরা তাকে দেখতে পারি না । এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে একই পুরুষের সব জায়গায় সব ইন্দ্রিয় কিভাবে থাকতে পারে ? যেখানে চোখ, সেখানে নাক কিভাবে থাকতে পারে ? এর উত্তর এটাই বলা যায় যে, এটা তো ঠিক কথা, কিন্তু পরমাত্মা এর চেয়ে বিলক্ষণ । তিনি এক অলৌকিক শক্তিসম্পন্ন সেখানে সব কিছুই সম্ভব । ধরুন, একটি সোনার ডেলা রয়েছে, ওতে আংটি, হাতের গহণা, গলার হার প্রভৃতি সকল অলংকার সকল জায়গায় রয়েছে । যেখানে ইচ্ছা সেখান থেকে সব জিনিষ পেতে পারেন, এই প্রকারে তিনি এমনই বিলক্ষণ যে তাতে সব জায়গায় সব কিছুই ব্যাপকভাবে রয়েছে, সবই তা থেকে বেরোতে পারে, তিনি সকল স্থানের সকল কথা একসঙ্গে শুনতে পারেন এবং সকলকে একসঙ্গে দেখতে পারেন ।

স্বপ্নে চোখ, কান, নাক না থাকলেও অন্তঃকরণ স্বয়ং সমস্ত ক্রিয়া নিজেই করে এবং নিজেই দেখে-শোনে। দ্রষ্টা, দর্শন এবং দৃশ্য সবই নিজে হয়ে যায়, এইভাবে ঈশ্বরীয় শক্তিও অতি বিলক্ষণ, উহাও সব জায়গায় সব কিছু করতে সর্বথা সমর্থ। ইহাই তো তার ঈশ্বরত্ব এবং বিরাটস্বরূপ।

সাকাররূপ সেই পরমেশ্বরের সমস্ত শরীর হচ্ছে ব্রহ্মাণ্ড, বরফ হচ্ছে জলের শরীর কিন্তু বরফ জল থেকে আলাদা নয়। তাহলে সংসারও কি বস্তুতঃ এই রকমই ? শরীরও কি তাহলে পরমাত্মা ?

এর উত্তরে ইহাই বলতে হচ্ছে যে এরূপ আছে আবার নেইও। এই শরীরের যখন কেউ সেবা করে বা আরাম দেয়, তখন আমি তাকে নিজের সেবা এবং নিজেকে আরাম হচ্ছে, এরূপ মানি, পরন্তু আমি বস্তুতঃ শরীর নই, আমি হচ্ছি আত্মা, কিন্তু যে পর্য্যন্ত আমি এই সাড়ে তিন হাতের দেহকে "আমি" মানছি, সে পর্য্যন্ত আমি তাই রয়েছি। এই স্থিতিতে চরাচর ব্রহ্মাণ্ড হচ্ছে ঈশ্বর, সকলের তাঁর সেবা করা উচিৎ, তাঁর সেবাই হচ্ছে ঈশ্বরের সেবা, সংসারকে সুখ দেওয়া হচ্ছে পরমাত্মাকেই সুখ দেওয়া এবং যখন আমি এই শরীর নই তাহলে এই ব্রহ্মাণ্ডরূপী শরীরও ঈশ্বর নয়। যে পর্য্যন্ত এই শরীর নিজের আছে সে পর্য্যন্ত তা তাঁর শরীর। আমরা সবাই তার অংশ, কাজেই তিনি হলেন অংশী। বাস্তবিক পক্ষে শেষে গিয়ে আমার আত্মা—এতেই গিয়ে দাঁড়াবে, শরীরে নয়। কিন্তু যে পর্য্যন্ত এরূপ হচ্ছে না, সে পর্য্যন্ত এই ভাবেই চলা উচিৎ। যথার্থ জ্ঞান হলে তখন এক শুদ্ধ ব্রহ্মই রয়ে যাবে।

এই ন্যায়দ্বারা নিরাকার-সাকার সবই এক বস্তু। জগৎ পরমেশ্বরে অধ্যারোপিত। মহাত্মাগণ এরূপই বলেন, যেমন দড়িতে সর্পের প্রতীতি মাত্র হয়, বাস্তবে নেই। স্বপ্নে সংসার নিজের মধ্যে প্রতীতি হয়, মৃগতৃষ্ণার জল কিংবা আকাশে ভাসমান ক্ষুদ্র কণিকা সমূহের প্রতীতি হয় (আলনা দিয়ে আসা সূর্য্যরশ্মীতে ভাসমান ক্ষুদ্র কণিকাসমূহ) এইরূপে পরমাত্মায় সংসারের প্রতীত হয়, ইহা মহাত্মা পুরুষগণই জানেন। ঘুম থেকে জাগার পর সেই জেগে উঠা ব্যক্তিকেই স্বপ্নের সংসারের অসারতার

যথার্থ জ্ঞান হয় । যে পর্য্যন্ত এই কথা ঠিক ভাবে বুঝতে না পারা যায় সে পর্য্যন্ত উপায় করে যেতে হয় । সেই উপায় হচ্ছে নিরাকার এবং সাকার যে কোনও রূপের ধ্যান করার ফলে একমাত্র যে পরম বস্তুর উপলব্ধি হয়, সর্বপ্রকারে সেই পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা তাঁর সেবা করা, মন দ্বারা তাকে স্মরণ করা, শ্বাসদ্বারা তার নামোচ্চারণ করা, কান দ্বারা তাঁর প্রভাব শোনা এবং শরীর দ্বারা তাঁর ইচ্ছানুসারে চলা – এটাই হচ্ছে তাঁর সেবা, এটাই আসল ভক্তি এবং এর ফলেই আত্মার শীঘ্র কল্যাণ হতে পারে ।

ওঁ শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

॥ শ্রী হরিঃ ॥

ওঁ শ্রীপরমাত্মনে নমঃ

ত্যাগদ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি

ত্যক্ত্বা কর্ম্মফলাসঙ্গং নিত্যতৃপ্তো নিরাশ্রয়ঃ ।
কর্ম্মন্যভিপ্রবৃত্তোঽপি নৈব কিঞ্চিৎ করোতি সঃ ॥
ন হি দেহভৃতা শক্যং ত্যক্তুং কর্ম্মাণ্যশেষতঃ ।
যস্তু কর্ম্মফলত্যাগী স ত্যাগীত্যভিধীয়তে ॥

গৃহস্থাশ্রমে থেকেও মানুষ ত্যাগদ্বারা পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। পরমাত্মাকে লাভ করার জন্য "ত্যাগ"-ই মুখ্য সাধন। অতএব সাত শ্রেণীতে বিভক্ত করে ত্যাগের লক্ষণ সংক্ষেপে লেখা হচ্ছে।

(১) নিষিদ্ধ কর্ম্মের সর্ব্বথা ত্যাগ ।

চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যা, কপট, ছল, জবরদস্তী, হিংসা, অভক্ষ্য-ভোজন ও প্রমাদ প্রভৃতি শাস্ত্রবিরুদ্ধ নীচ কর্ম্মগুলিকে কায়মনোবাক্যদ্বারা কোনও প্রকারে না করা। ইহা প্রথম শ্রেণীর ত্যাগ।

(২) কাম্য কর্ম্মের ত্যাগ ।

স্ত্রী, পুত্র এবং অর্থ প্রভৃতি প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে এবং রোগ সঙ্কট প্রভৃতি নিবৃত্তির উদ্দেশ্যে করা যজ্ঞ, দান, তপ এবং উপাসনা প্রভৃতি সকাম কর্ম্মগুলি নিজের স্বার্থের জন্য না করা★ ইহা দ্বিতীয় শ্রেণীর ত্যাগ।

★ যদি কোনও লৌকিক অথবা শাস্ত্রীয় কর্ম, কোনও কারণে উপস্থিত হয়, যা স্বরূপতঃ সকাম কিন্তু তা না করলে কারও কষ্ট হয় অথবা কর্ম্ম উপাসনার পরম্পরায় (Tradition)-এ কোনও বাধা হওয়ার সম্ভাবনা, তবে স্বার্থত্যাগ করে কেবল লোক সংগ্রহের নিমিত্তে তাহা করা সকাম কর্ম্ম নয়।

(৩) তৃষ্ণার সর্ব্বথা ত্যাগ ।

প্রারব্ধ অনুসারে প্রাপ্ত মান, বড়াই, প্রতিষ্ঠা এবং স্ত্রী, পুত্র এবং ধনাদি যা কিছু অনিত্য পদার্থ আছে তাহার বৃদ্ধির ইচ্ছাকে ভগবদ্ প্রাপ্তিতে অন্তরায় বিবেচনা করে তার ত্যাগ করা । ইহা তৃতীয় শ্রেণীর ত্যাগ ।

(৪) স্বার্থের নিমিত্ত অন্যের দ্বারা সেবা নেওয়ার ত্যাগ । নিজের সুখের জন্য কারও কাছে থেকে ধনাদি পদার্থের অথবা সেবা করাবার যাচনা করা এবং যাচনাযুক্ত পদার্থ-কৃত সেবাকে স্বীকার করা কিংবা কোনও ভাবে কারও দ্বারা নিজের স্বার্থ সিদ্ধ করাবার ইচ্ছা মনে রাখা ইত্যাদি স্বার্থের জন্য অন্যের দ্বারা যে সেবা করাবার ভাব, সেই সকল ত্যাগ করা *ইহা চতুর্থ শ্রেণীর ত্যাগ ।

(৫) সকল কর্ত্তব্য কর্মে আলস্য এবং ফলেচ্ছার সর্ব্বথা ত্যাগ ।

ঈশ্বরভক্তি, দেবপুজা, মাতাপিতাদি গুরুজনের সেবা, যজ্ঞ, দান, তপ এবং বর্ণাশ্রম অনুসারে জীবিকা অর্জন দ্বারা গৃহস্থজীবনের নির্বাহ এবং শারীরিক আহার-বিহার ইত্যাদি যে সকল কর্ত্তব্য কর্ম আছে সে সকলে আলস্য এবং সব রকমের কামনা ত্যাগ করা ।

(ক) ঈশ্বর ভক্তিতে আলস্য ত্যাগ ।

জীবনের পরম কর্ত্তব্য মনে করে, পরম দয়ালু, সকলের সুহৃদ, পরম প্রেমী অন্তর্য্যামী পরমেশ্বরের গুণ, প্রভাব এবং রহস্যময়ী কথার শ্রবণ, মনন, ও পঠন-পাঠন করা এবং আলস্য রহিত হয়ে উৎসাহপূর্বক তাঁর পরম পবিত্র নামের ধ্যান সহিত নিরন্তর জপ করা ।

---

*যদি এমন কোন অবসর যোগ্যতা অনুসারে এসে যায়, যখন শরীর সম্বন্ধীয় সেবা কিংবা ভোজন প্রভৃতি পদার্থ স্বীকার না করলে কারও কষ্ট হয় কিংবা লোক শিক্ষায় কোন প্রকারের বাধা উৎপন্ন হয়, তাহলে সেই সময়ে স্বার্থত্যাগ করে কেবল তাদের প্রীতির জন্য সেবাদি স্বীকার করা দোষযুক্ত নয় । কেননা স্ত্রী, পুত্র এবং ভৃত্যাদি দ্বারা কৃত সেবা এবং বন্ধু, বান্ধব ও মিত্র আদি দ্বারা দেওয়া ভোজন প্রভৃতি স্বীকার না করলে তাদের মনে কষ্ট দেওয়া হয় এবং লোক মর্য্যাদায় বাধা পড়ার সম্ভাবনা আছে ।

(খ) ঈশ্বরভক্তিতে কামনা ত্যাগ ।

ইহলোক এবং পরলোকের সকল ভোগকে ক্ষণ-ভঙ্গুর, বিনাশশীল এবং ভগবানের ভক্তিতে অন্তরায় মনে করে কোনও বস্তুর প্রাপ্তির জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা না করা এবং মনে তাঁর ইচ্ছাও না রাখা এবং কোনও সঙ্কট উপস্থিত হলে তার নিবারনের জন্য ভগবানের নিকট প্রার্থনা না করা অর্থাৎ হৃদয়ে এরূপ ভাব রাখা যে প্রাণও যদি চলে যায় তবুও এই মিথ্যা জীবনের জন্য বিশুদ্ধ ভক্তিতে কলঙ্ক লাগানো উচিৎ নয়; যেমন ভক্ত প্রহ্লাদ পিতার দ্বারা বহু প্রকারে নির্য্যাতিত হওয়া সত্ত্বেও নিজের কষ্ট নিবারণের জন্য ভগবানের কাছে কোনও প্রার্থনা করেন নি ।

নিজের অনিষ্টকারিগণকেও 'ভগবান তোমার মন্দ করুন' ইত্যাদি কোনও কঠোর শব্দে অভিশাপ না দেওয়া এবং তাদের অনিষ্ট হবার ইচ্ছাও মনে না রাখা ।

ভগবানের ভক্তির অভিমানে মত্ত হয়ে কাহাকেও কোন বর (আশীর্বাদ) প্রভৃতি না দেওয়া, যেমন "ভগবান তোমায় আরোগ্য করুন", "ভগবান তোমায় দীর্ঘজীবী করুন" ইত্যাদি ।

পত্রের ব্যবহারেও সকাম শব্দ না লেখা যেমন "ভগবান যত্র-তত্র সাহায্য করুন" "ভগবান ব্যবসায়ের প্রগতি করুন", "ভগবান বৃষ্টি করাবেন" "ভগবান স্বাস্থ্যলাভ করবেন", কালীচরণের ভরসায় কারবার খুলিতেছি", "মা জগদম্বার কৃপায় আরাম হবে", "মা জলকষ্ট দূর করবেন", প্রভৃতি সাংসারিক বস্তু প্রাপ্তির জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনারূপ সকাম শব্দ প্রায় লেখা হয়ে থাকে, এরূপ না লিখে "শ্রীপরমাত্মদেব আনন্দরূপে সর্বত্র অবস্থিত রয়েছেন", "শ্রী পরমেশ্বরের ভজনাই সার" ইত্যাদি নিস্কাম মাঙ্গলিক শব্দ লেখা এবং অন্য যে কোন ভাবেই লেখায় কিংবা বলায় সকাম শব্দের প্রয়োগ না করা ।

(গ) দেবতাগণের পূজায় আলস্য ও কামনার ত্যাগ ।

শাস্ত্র মর্য্যাদা এবং লোকমর্য্যাদানুসারে পুজ্নীয় দেবতাগণের উপযুক্ত সময়ে পূজা করার জন্য ভগবানের আজ্ঞা রয়েছে এবং ভগবানের আজ্ঞা পালন করা পরম কর্ত্তব্য, এরূপ মনে করে উৎসাহপূর্বক

শাস্ত্রবিধিমত তাদের পূজা করা, কিন্তু তাদের কাছে কোনও প্রকারের কামনা না করা।

তাদের পুজনের উদ্দেশ্য রেখে রোকড় জাবেদা খাতিয়ান প্রভৃতিতেও সকাম শব্দ না লেখা, যেমন মারোয়াড়ীদের মধ্যে হালখাতার দিনে কিংবা দেওয়ালীর সময় লক্ষ্মী পুজা করার পর "লক্ষ্মীদেবী অনেক লাভ করাবেন", রোকড়বাক্স ভরে রাখবেন, সকল-সিদ্ধি করাবেন", "মা-কালীর ভরসা", "মা গঙ্গার ভরসা", প্রভৃতি অনেক সকাম শব্দ লেখা হয়ে থাকে। সেরূপ না লিখে "শ্রী লক্ষ্মীনারায়ণ আনন্দরূপে সর্বত্র রয়েছেন", এবং "খুব আনন্দ এবং উৎসাহের সঙ্গে মা লক্ষ্মীর পুজা সম্পন্ন হয়েছে" প্রভৃতি নিষ্কাম মাঙ্গলিক শব্দ লেখা উচিৎ। এবং প্রতিদিনের রোকড়, নকল প্রভৃতিতেও এরূপে লিখে প্রারম্ভ করা।

(ঘ) মাতাপিতা আদি গুরুজনের সেবাতে আলস্য এবং কামনার ত্যাগ।

মাতা, পিতা, আচার্য্য এবং অন্যান্য পূজনীয় যারা আশ্রম, অবস্থা এবং গুণে যে কোনও ভাবে নিজের চেয়ে বড়, তাদের সকল প্রকারে নিত্য সেবা করা এবং তাদের নিত্যপ্রতি প্রণাম করা মনুষ্যমাত্রের পরম কর্ত্তব্যং, হৃদয়ে এই ভাব রেখে সর্ব্বথা আলস্য ত্যাগ করে নিষ্কামভাবে, উৎসাহপূর্বক ভগবদাজ্ঞানুসারে তাদের সেবায় তৎপর থাকা।

(ঙ) যজ্ঞ, দান ও তপস্যাদি শুভকর্মে আলস্য ও কামনার ত্যাগ।

পঞ্চ মহাযজ্ঞাদি* নিত্যকর্ম এবং অন্যান্য নৈমিত্তিক কর্মরূপ যজ্ঞ প্রভৃতি করা এবং অন্ন, বস্ত্র, বিদ্যা, ঔষধ ও অর্থ প্রভৃতি পদার্থের দান দ্বারা জীবসমূহের যথাযোগ্য সুখ প্রদানের জন্য কায়মনোবাক্যে নিজের শক্তি অনুসারে চেষ্টা করা এবং নিজের ধর্ম পালনে সর্ব প্রকারের কষ্ট সহ্য করা প্রভৃতি শাস্ত্রবিহিত কর্মে ইহলোক এবং পরলোকের সকল ভোগের কামনার সর্বথা পরিত্যগ করে নিজের পরম কর্ত্তব্য মনে করে শ্রদ্ধার সঙ্গে উৎসাহপূর্বক ভগবদাজ্ঞানুসারে কেবল ভগবদর্থেই ঐ সকল কর্মের আচরণ করা।

---

* পঞ্চ মহাযজ্ঞ যথা :-দেবযজ্ঞ (অগ্নিহোত্রাদি), ঋষিযজ্ঞ (বেদপাঠ, সন্ধ্যা, গায়ত্রীজপাদি) পিতৃযজ্ঞ (তর্পণ, শ্রাদ্ধাদি) মনুষ্যযজ্ঞ (অতিথি সেবা) এবং ভূতযজ্ঞ (বলিবৈশ্বকর্ম)।

(চ) সংসারযাত্রা নির্বাহের জন্য ন্যায়সঙ্গত কর্মদ্বারা জীবিকার্জ্জনে আলস্য ও কামনার ত্যাগ ।

জীবিকা-নির্বাহের কর্ম যেমন বৈশ্যের ক্ষেত্রে কৃষিকার্য্য, গোরক্ষা এবং ব্যবসা-বাণিজ্যের কথা বলা হয়েছে সেইরূপ নিজ নিজ বর্ণ এবং আশ্রম অনুসারে শাস্ত্রে যে ভাবে বিধান করা হয়েছে, সেই সকল পালনের দ্বারা হিতসাধন করতে থেকে গৃহস্থধর্ম পালনের জন্য ভগবানের আজ্ঞা (নির্দেশ) রয়েছে । এইজন্য নিজের কর্ত্তব্য মনে করে লাভ-লোকসানকে সমান জ্ঞান করে সব রকমের কামনাকে ত্যাগ করে উৎসাহপূর্বক উপরোক্ত কর্ম করা ।☆

(ছ) শরীরসম্বন্ধীয় কর্মে আলস্য ও কামনা ত্যাগ ।

শরীর নির্বাহের জন্য শাস্ত্রোক্ত রীতিতে ভোজন, বস্ত্র ও ঔষধাদি সেবনরূপ যে সমস্ত শরীর সম্বন্ধীয় কর্ম আছে তাতে সব প্রকারের ভোগবিলাসের কামনা ত্যাগ করে এবং সুখ, দুঃখ, লাভ লোকসান, জীবন, মরণ প্রভৃতিকে সমান মনে করে শুধুমাত্র ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্যই যোগ্যতা অনুসারে তাঁর আচরণ করা ।

পূর্বে বলা চার শ্রেণীর ত্যাগের সঙ্গে এই পঞ্চম শ্রেণীর ত্যাগ যুক্ত হলে সম্পূর্ণ দোষ এবং সব রকমের কামনার বিনাশ হয়ে শুধুমাত্র এক ভগবদ্ প্রাপ্তির তীব্র ইচ্ছা জাগলে একে জ্ঞানের প্রথম ভুমিকায় পরিপক্ব অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ বুঝতে হবে ।

☆ উপরোক্ত ভাবে যে কর্ম করে তার কর্মে লোভ না থাকার জন্য তার মধ্যে কোনও প্রকারের দোষ আসতে পারে না কেননা জীবিকা-অর্জনের কর্মে লোভই বিশেষভাবে পাপ করাবার হেতু হয়ে থাকে । সেইজন্য গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার সাধারন ভাষা-টিকার ১৮ অধ্যায়ের ৪৪ নং শ্লোকের টীপ্পনীতে যেরূপ বৈশ্যের প্রতি ব্যবসা-বাণিজ্যের দোষসমূহ ত্যাগ করার জন্য বিস্তারিত ভাবে লেখা আছে, সেইরূপ নিজ-নিজ বর্ণাশ্রম অনুসারে সব কর্মে সবরকমের দোষ ত্যাগ করে কেবল ভগবানের আজ্ঞা মনে করে ভগবানের নির্মিত্ত নিষ্কামভাবে সব্দ কর্মের আচরণ করা ।

(৬) সংসারের সকল পদার্থে এবং কর্মে মমতা ও আসক্তির সর্বথা ত্যাগ ।

অর্থ বাড়ী-ঘর এবং বস্ত্রাদি সকল বস্তু এবং স্ত্রী, পুত্র, বন্ধু-বান্ধব এবং মান বড়াই ও প্রতিষ্ঠা ইত্যাদি ইহলোকের ও পরলোকের যত বিষয়ভোগরূপ পদার্থ আছে, সেগুলি ক্ষণভঙ্গুর এবং বিনাশশীল হওয়ার জন্য অনিত্য মনে করে ওতে মমতা এবং আসক্তি না রাখা আর কেবল এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই অনন্যভাবে বিশুদ্ধ প্রেম হওয়ায় মন, বাণী, এবং শরীর দ্বারা হওয়া সম্পূর্ন ক্রিয়াসমূহে এবং শরীরেও মমতা এবং আসক্তির সর্বথা অভাব হয়ে যাওয়া ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ ।★

উক্ত ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগপ্রাপ্ত পুরুষের সংসারের যাবতীয় পদার্থে বৈরাগ্য হয়ে কেবল এক পরমপ্রেমময় ভগবানেই অনন্য প্রেম হয়ে যায় । এইজন্য ভগবানের গুণ, প্রভাব এবং রহস্যপূর্ণ ও বিশুদ্ধ প্রেমের কথা শোনা এবং শোনানো আর মনন করা এবং নির্জন স্থানে থেকে নিরন্তর ভগবানের ভজন, ধ্যান ও শাস্ত্র-মর্মের বিচার করাই তাদের প্রিয় মনে হয় । বিষয়াসক্ত মানুষদের মাঝে থেকে হাস্য-পরিহাস, বিলাস, প্রমোদ, নিন্দা, বিষয়ভোগ এবং ব্যর্থ কথাবার্তায় নিজের সময়ের ক্ষণমাত্রও ব্যয় করা ভাল লাগে না এবং তাদের দ্বারা সব কর্ত্তব্য কর্ম ভগবানের স্বরূপ এবং নামের স্বতঃ চিন্তনে থেকেই আসক্তি ব্যতিরেকে কেবল ভগবদর্থ-ই হয়ে থাকে ।

এই প্রকার সব পদার্থে এবং কর্মে মমতা ও আসক্তির ত্যাগ হয়ে কেবল এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই বিশুদ্ধ প্রেম হওয়া জ্ঞানের দ্বিতীয় ভুমিকাতে পরিপক্ক অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ বুঝতে হবে ।

★ সব পদার্থে এবং কর্মে তৃষ্ণা ও ফলের ইচ্ছার ত্যাগের কথা তো তৃতীয় এবং পঞ্চম শ্রেণীর ত্যাগে বলা হয়েছে, কিন্তু উপরোক্ত ভাবে ত্যাগ হলেও তাতে মমতা ও আসক্তির অবশেষ থেকে যায় । যেমন, ভজন, ধ্যান এবং সৎসঙ্গের অভ্যাশের ফলে ভরতমুনির সম্পূর্ণ পদার্থে এবং কর্মে তৃষ্ণা এবং ফলেচ্ছার ত্যাগ হলেও হরিণে এবং হরিণ পালনরূপ কর্মে মমতা এবং আসক্তি বর্ত্তমান ছিল । এইজন্য সংসারের সকল পদার্থে এবং কর্মে মমতা ও আসক্তির ত্যাগকে ষষ্ঠ শ্রেনীর ত্যাগ বলা হয়েছে ।

(৭) সংসার, শরীর ও সমস্ত কর্মে সূক্ষ্ম বাসনা এবং অহংভাবের সর্বথা ত্যাগ।

সংসারের সব পদার্থই মায়ার কার্য্য হওয়ায় সর্বথা অনিত্য এবং এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই সর্বত্র সমভাবে পরিপূর্ণ আছেন, এরূপ দৃঢ় নিশ্চয় করে শরীরের সঙ্গে সঙ্গে সংসারের সব পদার্থে এবং সব কর্মে সূক্ষ্ম বাসনার সর্বথা অভাব হয়ে যাওয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণে তাদের চিত্র সংস্কাররূপেও না থাকা এবং শরীরে অহংভাবের সর্বথা অভাব হয়ে মন, বাণী ও শরীর দ্বারা সম্পাদিত সকল কর্মে কর্ত্তৃত্ব-অভিমানের লেশমাত্রাও না থাকা। ইহাই সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগ।●

এই সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগরূপ পরবৈরাগ্য ⚘প্রাপ্ত পুরুষের অন্তঃকরণের বৃত্তিসমূহ সমস্ত সংসার থেকে অত্যন্ত উপরত হয়ে যায়। যদি কোন কালে কোন সাংসারিক বিষয়ের স্ফুরণ হয়ও তবে তার সংস্কার বদ্ধমূল হয় না, কেন না তাঁর এক সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেব পরমাত্মাতেই গাঢ় স্থিতি নিরন্তর স্থিত থাকে।

এই জন্য তাঁর অন্তঃকরণে সকল দুগুণের অভাব হয়ে অহিংসা ১, সত্য ২, অস্তেয় ৩, ব্রহ্মচর্য্য ৪, অপশুণতা ৫, লজ্জা, অমানিত্ব ৬, নিষ্কপটতা, শৌচ ৭, সন্তোষ ৮, তিতিক্ষা ৯, সৎসঙ্গ, সেবা, যজ্ঞ, দান, তপ ১০, স্বাধ্যায় ১১, শম ১২, দম ১৩, বিনয়, আর্জব ১৪, দয়া ১৫, শ্রদ্ধা ১৬, বিবেক ১৭, বৈরাগ্য ১৮, নির্জনবাস, অপরিগ্রহ ১৯, সমাধান ২০, উপরামতা, তেজ ২১, ক্ষমা ২২, ধৈর্য্য ২৩, অদ্রোহ ২৪, অভয় ২৫, নিরহঙ্কারিতা, শান্তি ২৬, এবং ঈশ্বরে অনন্যভক্তি ইত্যাদি সদ্গুণের আবির্ভাব স্বভাবতঃ হয়ে যায়।

● সংসারের সমস্ত পদার্থে এবং কর্মে তৃষ্ণা ও ফলেচ্ছা এবং মমতা আর আসক্তির সর্বথা অভাব হলেও তাতে সূক্ষ্মবাসনা ও কর্ত্তৃত্বাভিমান থেকে যায়, এই জন্য সূক্ষ্মবাসনা ও অহংকারের ত্যাগকে সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগ বলা হয়েছে।

⚘পূর্বোক্ত ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ প্রাপ্ত পুরুষের বিষয়ের সঙ্গে সংসর্গ হলে কদাচিৎ তাতে কিছু আসক্তি হতেও পারে কিন্তু এই সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগী পুরুষের বিষয়ের সংসর্গ হলে তাতে আসক্তি হতে পারে না, যেহেতু তাঁর জ্ঞানে এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কোনও বস্তু থাকে না, এই জন্য এই ত্যাগকে 'পর বৈরাগ্য' বলা হয়েছে।

---

১) মন, বাণী ও শরীর দ্বারা কাকেও কোনো প্রকার কষ্ট না দেওয়া।
২) অন্তঃকরণ ও ইন্দ্রিয় দ্বারা যেরূপ বোঝা যায় সেইরূপ প্রিয় শব্দে বলা।
৩) সম্পূর্ণরূপে চুরির অভাব।
৪) অষ্টবিধ মৈথুনের অভাব।
৫) কারও নিন্দা না করা।

এই প্রকার শরীরের সহিত সব পদার্থে এবং কর্মে বাসনা ও অহংভাবের অত্যন্ত অভাব হয়ে এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপেই একীভাবে নিত্য নিরন্তর দৃঢ়স্থিতি থাকাই হল জ্ঞানের তৃতীয় ভূমিকাতে পরিপক্ক অবস্থা-প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ।

উপরোক্ত গুণসমূহের মধ্যে কিছু গুণ প্রথম ও দ্বিতীয় ভূমিকাতেই প্রাপ্ত হয়ে যায় কিন্তু সমস্ত গুণের আবির্ভাব প্রায় তৃতীয় ভূমিকাতেই হয়ে থাকে। কেননা এই সকল ভগবৎ-প্রাপ্তির গতি সমীপে উপস্থিত পুরুষদের লক্ষণ এবং প্রতক্ষ্যভাবে ভগবদ্ স্বরূপের জ্ঞান হওয়ায় হেতু। সেই জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ প্রায় এই সমস্ত গুণকে শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৩ অধ্যায়ে (শ্লোক সংখ্যা ৭ থেকে ১১ পর্য্যন্ত) জ্ঞানের নামে এবং ১৬ অধ্যায়ে (শ্লোক সংখ্যা ১—৩ পর্য্যন্ত) দৈবী সম্পদ্ নামে বলেছেন।

---

৬) সৎকার মান ও পূজাদি আকাঙ্খার অভাব।
৭) বাহির ও ভিতরের পবিত্রতা (সত্যতাপূর্বক শুদ্ধ ব্যবহার দ্বারা অর্থের ও তার দ্বারা পাওয়া অন্নের দ্বারা আহারের এবং যথাযোগ্য বর্ত্তনে আচরণের তথা জল মৃত্তিকাদি দ্বারা শরীরের বহিঃ শুদ্ধি হয় এবং রাগ, দ্বেষ ও কপটাদি বিকারের নাশ হয়ে অন্তঃকরণ স্বচ্ছ এবং শুদ্ধ হওয়ায় নাম অন্তঃশুদ্ধি)।
৮) তৃষ্ণার সর্বথা অভাব।
৯) শীত, উষ্ণ, সুখ, দুঃখ প্রভৃতি দ্বন্দ সহ্য করা।
১০) স্বধর্ম পালনের জন্য কষ্ট সহ্য করা।
১১) বেদ এবং সৎশাস্ত্রের অধ্যয়ন ও ভগবানের নাম ও গুণকীর্তন।
১২) মনকে বশ করা।
১৩) ইন্দ্রিয় সমূহকে বশ করা।
১৪) শরীর এবং ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণের সরলতা।
১৫) দুঃখীজনের প্রতি করুণা।
১৬) বেদ, শাস্ত্র, মহাত্মা, গুরু ও পরমেশ্বরের বাক্য প্রতক্ষ্যের ন্যায় বিশ্বাস।
১৭) সৎ এবং অসৎ পদার্থের যথার্থ জ্ঞান।
১৮) ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমুদয় পদার্থে আসক্তির অত্যন্ত অভাব।
১৯) মমত্ববুদ্ধিযুক্ত সংগ্রহের অভাব।
২০) অন্তঃকরণের সংশয় এবং বিক্ষেপের অভাব।
২১) শ্রেষ্টপুরুষদের সেই শক্তির নাম তেজ, যার প্রভাবে বিষয়াসক্ত ও নীচ প্রকৃতির মানুষও পাপাচরন থেকে নিবৃত্ত হয়ে তাদের কথানুসারে শ্রেষ্ঠ কর্মে প্রবৃত্ত হয়।
২২) নিজের প্রতি অপরাধকারিগণকেও কোনও প্রকারে দন্ড দেবার ভাব মনে পোষণ না করা।
২৩) গুরুতর বিপত্তি উপস্থিত হলেও নিজের স্থিতি থেকে বিচলিত না হওয়া।
২৪) নিজের প্রতি দ্বেষ পোষণ কারিগণের প্রতিও দ্বেষ না করা।
২৫) ভয়ের সর্বথা অভাব।
২৬) ইচ্ছা এবং বাসনার অত্যন্ত অভাব হওয়া এবং অন্তঃকরণে নিত্য নিরন্তর প্রসন্ন থাকা।

এই সকল গুণকে শাস্ত্রকারগণ সামান্য ধর্ম্মরূপে স্বীকার করেছেন, কাজেই মানুষ মাত্রেরই এতে অধিকার আছে। অতএব উপরোক্ত সদগুণ নিজের অন্তঃকরণে জাগাবার জন্য সকলকেই ভগবানের শরনাপন্ন হয়ে বিশেষভাবে প্রযত্ন করা আব ্যক।

উপসংহার

এই প্রবন্ধে সাত শ্রেণীর ত্যাগে বিভক্ত করে ভগবৎ-প্রাপ্তি বলা হয়েছে। তার মধ্যে প্রথম পাঁচ শ্রেণীর ত্যাগ পর্য্যন্ত জ্ঞানের প্রথম ভূমিকার লক্ষণ এবং ষষ্ঠ শ্রেণীর ত্যাগ দ্বিতীয় ভূমিকার লক্ষণ এবং সপ্তম শ্রেণীর ত্যাগ পর্য্যন্ত তৃতীয় ভূমিকার লক্ষণ বলা হয়েছে। উক্ত তৃতীয় ভুমিকাতে পরিপক্ক অবস্থাপ্রাপ্ত পুরুষ সেই কালেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়ে যায়। পুনরায় তার এই ক্ষণভঙ্গুর বিনাশশীল অনিত্য সংসারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ হয় না, যেমন অজ্ঞাননিদ্রা থেকে জেগে ওঠা পুরুষের মায়ার কার্য্যরূপ অনিত্য সংসারের সঙ্গে কোন সম্বন্ধ থাকে না। যদিও লোক-দৃষ্টিতে সেই জ্ঞানীপুরুষের শরীরদ্বারা প্রারব্ধবশতঃ সফল কর্ম্ম হচ্ছে বলে প্রতীত হয় এবং ঐ সকল কর্মে সংসারের বহু লাভ হয়ে থাকে। কেননা, কামনা, আসক্তি ও কর্তৃত্বাভিমান রহিত হওয়ার জন্য সেই মহাত্মার মন, বাণী ও শরীর দ্বারা নিস্পন্ন হওয়া আচরণ লোকের নিকটে প্রমানস্বরূপ বিবেচিত হয় এবং ঐরূপ পুরুষের ভাবানুসারেই শাস্ত্র নির্ম্মিত হয় তথাপি সেই সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবকে প্রাপ্ত পুরুষ এই ত্রিগুণময়ী মায়া থেকে সর্বদাই অতীত, এইজন্য তিনি গুণের কার্য্যরূপ প্রকাশ, প্রবৃত্তি এবং নিদ্রা আদি প্রাপ্ত হলে তার প্রতি দ্বেষ করেন না বা নিবৃত্ত হলে তার আকাঙ্খা করেন না। যেহেতু সুখ, দুঃখ, লাভহানি, মান-অপমান এবং নিন্দা-স্তুতি আদিতে এবং মৃত্তিকা, প্রস্তর ও সুবর্ণাদিতে সর্বত্রই ওনার সমভাব হয়ে যায়, সেই জন্য ঐ মহাত্মার কোন ও প্রিয় বস্তুর প্রাপ্তি এবং অপ্রিয়ের নিবৃত্তিতে হর্ষ হয় না বা কোনও অপ্রিয়ের প্রাপ্তি এবং প্রিয় বস্তুর বিয়োগে শোক দুঃখাদি হয় না। যদি ঐ ধীর পুরুষের শরীর কোন

কারণে শস্ত্রদ্বারা ছেদনও করা হয় বা অন্য কোন প্রকারে তার গুরুতর দুঃখ এসে উপস্থিত হয়, তবুও সে (সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবে অনন্যভাবে স্থিত পুরুষ) সেই স্থিতি থেকে বিচলিত হন না । কেননা তার অন্তঃকরণে সমস্ত সংসার মৃগতৃষ্ণার জলের ন্যায় প্রতীয়মান হয় এবং কেবল এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার অতিরিক্ত কোন সত্ত্বাই প্রতীয়মান হয় না, বিশেষ কি বলা যায়, প্রকৃতপক্ষে সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাকে প্রাপ্ত পুরুষের ভাব তিনি স্বয়ংই জেনে থাকেন, তা মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রকাশ করার সামর্থ কারও নেই । অতএব যত শীঘ্র সম্ভব অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জেগে উক্ত সাত শ্রেণীতে বিভক্ত ত্যাগ দ্বারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার জন্য সৎপুরুষগণের শরণ গ্রহণ করে তাদের উপদেশানুসারে সাধনে তৎপর হয়ে লেগে পড়া আবশ্যক । কেননা এই অতি দুর্লভ মনুষ্যজন্ম বহু জন্মর পরে পরম দয়ালু ভগবানের কৃপাতেই পাওয়া যায় । সেজন্য বিনাশশীল ক্ষণভঙ্গুর সংসারের অনিত্য ভোগ্যবস্তুর উপভোগে নিজের জীবনের অমূল্য সময় নষ্ট করা উচিৎ নয় ।

ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ ওঁ শান্তিঃ
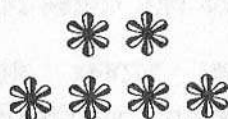
শরণাগতি

তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত ।
তৎ প্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ॥

(গীতা ১৮।৬২)

মনুষ্য জীবনের চরম লক্ষ্য আত্যন্তিক আনন্দের প্রাপ্তি, আত্যন্তিক আনন্দ হচ্ছে পরমাত্মায়, অতএব পরমাত্মার প্রাপ্তিই হচ্ছে মনুষ্য জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য । এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য শাস্ত্রকারগণ এবং মহাত্মাগণ অধিকারী-ভেদে অনেক উপায় এবং সাধন দেখিয়েছেন কিন্তু বিবেচনা করে দেখলে সেই সমস্ত সাধন সমূহের মধ্যে পরমাত্মার শরণাগতির সমান সরল, সুগম, সুখসাধ্য অন্য কোনও সাধন দেখা যায় না । সেইজন্য প্রায় সব শাস্ত্রেই এর প্রশংসা করা হয়েছে । শ্রীমদ্ভগবদ্‌গীতায় তো উপদেশের আরম্ভ এবং পর্য্যাবসান দুই-ই শরণাগতিতে সম্পন্ন হয়েছে । প্রথমে অর্জুন **"শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্"** (গীতা-২/৭) আমি আপনার শিষ্য, শরণাগত, আমায় যথার্থ উপদেশ দিন, এরূপ বলেছে এবং এরপর ভগবান উপদেশ আরম্ভ করেছেন এবং উপদেশের উপসংহার করতে গিয়ে বলেছেন যে —

সর্ব্বধর্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ।
অহং ত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥

"সম্পূর্ণ ধর্মকে অর্থাৎ সম্পূর্ণ কর্মের আশ্রয়কে পরিত্যাগ করে কেবল এক সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবরূপ আমারই অনন্য ভাবে শরণ গ্রহণ কর । আমি তোমাকে সব পাপ থেকে মুক্ত করব, তুমি শোক করিও না ।"

এর আগেও ভগবান শরণাগতিকে যে মহত্ত্ব দিয়েছেন ততটা অন্য কোন সাধনাকে দেন নি । জাতি কিংবা আচরণে কেউ যত নীচ বা

পাপী হোক না কেন, ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া মাত্রই সে অনায়াসে পরমগতি প্রাপ্ত হয়ে যায় —

ভগবান বলেছেন যে —

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
(গীতা ৯।৩২)

"হে অর্জুন, স্ত্রী, বৈশ্য, শূদ্রাদিক এবং পাপযোনি বিশিষ্ট যে কেউ হোক না কেন, তাঁরাও আমার শরণাপন্ন হলে পরমগতি প্রাপ্ত হয়।"

শ্রুতিতে বলা হয়েছে ঃ –

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতেদ্ধ্যেবাক্ষরংপরম ।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥
এতদালম্বনং শ্রেষ্টমেতদালম্বনং পরম্ ।
এতদালম্বন জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে ॥
(কঠ• ১।২।১৬-২০)

"সেই অক্ষরই ব্রহ্মস্বরূপ, সেই অক্ষরই পররূপ, সেই অক্ষরকেই জেনে নিয়ে যে পুরুষ যেমন ইচ্ছা রাখে, সে তাকেই প্রাপ্ত হয়ে যায়। এই অক্ষরের আশ্রয় (শরণ) শ্রেষ্ঠ। সেই আশ্রয় সর্বোৎকৃষ্ট, সেই আশ্রয়কে জানতে পেরে (সে) ব্রহ্মলোকে পুজিত হয়।

মহর্ষি পাতঞ্জলি অন্যান্য সব উপায়ের চাইতে ইহাকে সুগম বলেছেন। তিনি বলছেন–

ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা (যোগদর্শন ১।২৩)

"ঈশ্বরের শরণাগতিতে সমাধী প্রাপ্ত হয়। আগে গিয়ে পাতঞ্জলি এর ফল জানিয়েছেন –

ততঃ পত্যক্‌তেচনাধি গমোৎপ্যন্তরায়াভাবশ্চ ।
(যোগদর্শন ১।২৯)

"সেই ঈশ্বর প্রনিধাতে পরমাত্মার প্রাপ্তি এবং (সাধনকালে আসা) সম্পূর্ণ বিঘ্নেরও অত্যন্ত অভাব হয়ে যায়। ভগবান শ্রীরামের ঘোষনা হচ্ছে ঃ–

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রতং মম॥

(বাল্মিকী রামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

প্রমাণসমূহের তো কেবল দিগদর্শন মাত্র করা হয়েছে। শাস্ত্রে শরণাগতির মহিমার অসংখ্য প্রমাণ রয়েছে। কিন্তু বাস্তবে শরণাগতি কাকে বলে, ইহা বিচারনীয় বিষয়। শুধু মুখে বলে দেওয়া যে, "হে ভগবান! আমি আপনার শরণে আছি"–এটা শরণাগতির স্বরূপ নয়। সাধারণভাবে শরণাগতির অর্থ করা হয়, মন, বানী এবং শরীরকে সর্বতোভাবে ভগবানে অর্পণ করা, কিন্তু এই অর্পণও শুধু "শ্রীকৃষ্ণার্পণমস্তু" বলে দিলেই হয়ে যায় না। যদি এতেই অর্পণের সিদ্ধিলাভ হোত, তাহলে এ পর্যান্ত না জানি কত ভগবানের শরণাগত ভক্ত হয়ে যেত, কাজেই এখন বোঝা উচিৎ যে অর্পণ কাকে বলে?

শরণ, আশ্রয়, অনন্য ভক্তি, অব্যভিচারিণী ভক্তি, অবলম্বন, নির্ভরতা এবং আত্মসমর্পন প্রভৃতি শব্দ প্রায় একই অর্থে প্রযুক্ত হয়।

এর পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কারও কোন কালেই বিন্দুমাত্র ভরসা না রেখে, লজ্জা, ভয়, মান, বড়াই এবং আসক্তির ত্যাগ করে, শরীর এবং সংসারে অহং-মমতারহিত হয়ে কেবল এক পরমাত্মাকেই নিজের পরম আশ্রয়, পরমগতি এবং সর্ব্বস্য বুঝে তথা অনন্য ভাবে, অতিশয় শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেম পূর্বক নিরন্তর ভগবানের নাম, গুণ, প্রভাব এবং স্বরূপের চিন্তন করে যাওয়া এবং ভগবানের ভজন-স্মরণ রেখেই তাঁর আজ্ঞানুসারে সমস্ত কর্ত্তব্য-কর্ম নিঃস্বার্থভাবে কেবল ভগবানের জন্যই আচরণ করতে থাকা – ইহাকেই "সর্ব প্রকারে পরমাত্মার অনন্য শরণ" বলা হয়।

এই শরণাগতির বিষয়ে প্রধানতঃ চারটি কথা সাধকদের জানা প্রয়োজন –

(১) সব কিছু পরমাত্মার মনে করে তাকে অর্পণ করা।
(২) তাঁর প্রত্যেক বিধানে পরম সন্তুষ্ট থাকা।
(৩) তাঁর আজ্ঞানুসারে তাঁরই জন্য সমস্ত কর্ত্তব্য করা।
(৪) নিত্য-নিরন্তর স্বাভাবিক (অটুট ভাবে) তাকে স্মরণে রাখা।

এই চারটি বিষয় একটু বিস্তারিত ভাবে বিবেচনা করুন।

সর্বস্য অর্পণ

সব কিছু পরমাত্মাকে অর্পণ করার মানে এই নয় যে, ঘর-বাড়ী ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়া বা কর্তব্য কর্মের পরিত্যাগ করে কর্মহীন হয়ে চুপচাপ বসে থাকা। সাংসারিক বস্তুতে আমরা ভুলবশতঃ যে মমতা আরোপিত করে রেখেছি, তা তুলে ফেলতে হবে – ইহাই হচ্ছে, তাঁরই বস্তু তাকেই অর্পণ করে দেওয়া। বস্তু তো তাঁরই, আমাদের কাছে থেকে তা বলপূর্বক নিয়ে নেওয়া হয় কিন্তু ভ্রমবশে আমরা তা নিজের বলে মেনে নেই, সেইজন্য নেওয়ার সময় আমাদের কাঁদতেও হয়।

একজন ধনীর কারবার রয়েছে, সেখানে একজন মুনিম (গোমস্তা) নিযুক্ত রয়েছে। বিশ্বাসী ধনী ব্যক্তি তাঁকে (সৎ) এবং কর্তব্য পরায়ণ মনে করে সম্পত্তির রক্ষা, কারবারের সঞ্চালন এবং নিয়মানুসারে ব্যবহার করার সব দায়িত্ব দিয়ে রেখেছেন। এখন মুনিমের কাজ হচ্ছে সে যেন মালিকের কোনও বস্তুর উপর নিজের কিঞ্চিৎমাত্রও অধিকার না রেখে এবং কারও উপর মমতা বা অহংকার না রেখে মালিকের আজ্ঞা এবং তাঁর নিয়ত করা বিধি অনুযায়ী সমস্ত কাজকর্ম খুব দক্ষতা, সাবধানতা এবং বিশ্বস্তভাবে করতে থাকা। কোটি-কোটি টাকার লেন-দেন করুন, কয়েক কোটির সম্পত্তির মালিকের মত তদারকি করুন, মালিকের হয়ে হস্তাক্ষর করুন, কিন্তু নিজের বলে যেন না মানে। মূলধন মালিকের, কারবারে মুনাফা হলে মালিকের এবং লোকসানের উত্তরদায়িত্বও মালিকের।

সেই কর্মচারী যদি ভূল, প্রমাদ বা বেইমানী করে মালিকের ধন কে নিজের ভেবে নিজের কাজে লাগাতে চায়, মালিকের সম্পত্তি বা মুনাফায় নিজ অধিকারে নিয়ে নেয়, তাহলে সে চোর, বেইমান অথবা অপরাধী সাব্যস্ত হয়। আদালতে মোকদ্দমা হলে সেই সম্পত্তি তাঁর কাছ থেকে কেড়ে নেওয়া হয়, তাঁকে কঠোর দন্ড পেতে হয়, তাঁর নামে এত কলঙ্ক হয় যে, সে সকলের নজরে অবিশ্বাসী হয়ে চিরদিনের জন্য দুঃখী হয়ে যায়। এই প্রকার যদি সে মালিকের সম্পত্তির তদারকির কাজে

ফাঁকি দেয়, মালিকের নিয়ম ভাঙ্গে তাহলেও সে অপরাধী, অতএব মুনিমের পক্ষে এই দুটোই নিষিদ্ধ ।

এই প্রকার এই সমস্ত জগৎ হচ্ছে সেই পরমাত্মার, তিনিই সমস্ত পদার্থের উৎপাদনকারী, তিনিই নিয়ন্ত্রণকর্ত্তা, তিনিই আঁধার, তিনিই স্বামী । তিনিই আমাদের নিজেদের কর্মবশে যে যোনি, যে স্থিতি পাওয়া উচিৎ, উহাতে উৎপন্ন করে নিজের কিছু বস্তুর তদারকির এবং সেবার ভার দিয়েছেন এবং আমাদের জন্য কর্ত্তব্যের বিধি জানিয়ে দিয়েছেন । কিন্তু আমরা ভ্রান্তিবশে পরমাত্মার পদার্থকে নিজের বলে মেনে নিয়েছি, সেইজন্য আমাদের দুর্গতি হয় । যদি আমরা আমাদের এই ভুল মিটিয়ে ফেলে এরূপ বুঝে নেই যে, যা কিছু রয়েছে তা পরমাত্মার, আমরা তো তাঁর সেবকমাত্র, তাঁর সেবা করাই হচ্ছে আমাদের ধর্ম, তাহলে সেই পরমাত্মা বিশ্বাসী জেনে আমাদের উপরে প্রসন্ন হন এবং আমরা তাঁর কৃপা এবং পুরস্কারের পাত্র হই । মায়ার বন্ধন থেকে ছাড়া পাওয়াই হচ্ছে সবচেয়ে বড় পুরস্কার । যা কিছু রয়েছে সবই পরমাত্মার, এরূপ বুদ্ধি হলে মমতা চলে যায়, আর যা কিছু রয়েছে সে সবই কেবল পরমাত্মা, এরূপ বুদ্ধি হলে অহংকারের নাশ হয়ে যায় অর্থাৎ এক পরমাত্মাকেই জগতের উপাদান এবং নিমিত্ত-কারণ জেনে নিলে তাতে মমতা এবং অহংকার (আমি এবং আমার) নষ্ট হয়ে যায় । "আমি, আমার"-ই হচ্ছে বন্ধন, ভগবানের শরণাগত ভক্ত "আমি, আমার" এর বন্ধন থেকে মুক্ত হয়ে পরমাত্মাকে বলে যে, কেবলমাত্র এক তুমিই আছ এবং সমস্তই তোমার ।

ইহাই হচ্ছে অর্পণ, এই অর্পণের সিদ্ধি হয়ে গেলে সাধক বন্ধনমুক্ত হয়ে যায়, তাঁর আর কোনও প্রকারের কোন চিন্তা থাকে না । যে চিন্তা করে, সে নিজেকে বদ্ধ বলে মানে, বাঁধন থেকে যে মুক্তি চায়, বাস্তবে সে পরমাত্মাকে তত্ত্বের সঙ্গে জেনে তাঁর শরণ হয় নি । নিজের উদ্ধারের চিন্তা তো শরণাগত সাধকের চিত্ত থেকে চলে যায় । ইহাই হচ্ছে বাস্তবিক কথা । শরণ গ্রহণ করার পরেও যদি শরণাগতকে চিন্তা করতে হয় তাহলে এটা কি ধরনের শরণাগতি ? যে যার শরণাগত তাঁর চিন্তা সেই স্বামীকে করতে হয় ।

जो जाकी शरणो लियो, ताकहँ ताकी लाज ।
उलटे जल मछली चले, बध्यो जात गजराज ॥

অর্থাৎ যে যার শরণ গ্রহণ করেছে, তারই সব দায়িত্ব । মাছ যেমন জলের আশ্রয়েই আছে, সে স্রোতের বিপরীত যেতে পারে, কিন্তু প্রচন্ড শক্তিশালী যে হাতি, সে স্রোতের তোড়ে ভেসে যায় ।

যখন একটি পায়রা মহারাজা শিবির শরণ গ্রহণ করার ফলে, দয়া এবং শরণাগত বৎসলতার বশীভূত হয়ে তিনি নিজের শরীরের মাংসের বিনিময়েও সেই পায়রাকে রক্ষা করতে পারেন, তাহলে সেই পরমেশ্বর, যিনি অনাথের নাথ, দয়ার অনন্ত অতল সাগর, জগতের ইতিহাসে শরণাগত বৎসলতার সবচেয়ে বড় ঘটনা যার শরণাগত বৎসলতার সামনে সাগরের তুলনায় এক জলকণার সদৃশও নয়, তাঁর শরণাপন্ন হলে কি তিনি আমাদের রক্ষা ও উদ্ধার করবেন না ? যদি এর পরেও আমাদের মনে নিজেদের উদ্ধারের জন্য চিন্তা হয় এবং আমরা নিজেকে তাঁর শরনাগত বলে ভাবি, তাহলে এটা আমাদের নীচতা, শরণাগতির রহস্যই আমরা জানি না । বাস্তবে শরণাগত ভক্তের উদ্ধার হওয়া না হওয়াতে প্রয়োজনই বা কি ? সে তো নিজে নিজেকে মন বুদ্ধির সহিত তাঁর শ্রীচরণে সমর্পণ করে সর্বথা নিশ্চিন্ত হয়ে যায়, সে উদ্ধারের পরোয়াই বা কেন করবে ? শরণাগতির রহস্যকে জানে এমন ভক্তের উদ্ধারের চিন্তা হওয়া তো দূরের কথা এই প্রসঙ্গের স্মৃতিকেও সে পছন্দ করে না । যদি ভগবান স্বয়ং তাকে কখনও উদ্ধারের কথা বলেন, তাহলে সে শরণাগতিতে ত্রুটি মনে করে লজ্জিত ও সঙ্কুচিত হয়ে নিজেকে ধিক্কার দেয় । সে মনে করে যে, আমার মনের কোথাও মুক্তির ইচ্ছা লুকিয়ে না থাকলে আজ এই অপ্রিয় প্রসঙ্গ ওঠার অবকাশই থাকত না ? মুক্তি তো ভগবদ্-প্রেমের কুচিপাথর মাত্র (দাঁড়িপাল্লার উঁচু পাল্লাকে সমান করবার জন্য তাতে রাখা ওজন-বিশেষ), সেই প্রেমধন ছেড়ে পাথরের ইচ্ছা রাখা অত্যন্ত লজ্জার বিষয় । মুক্তির ইচ্ছাকে কলঙ্ক মনে করে নিজের দুর্বলতা তথা নীচাশয়তার অনুভব করে, ভগবানে

নিজের অবিশ্বাস জেনে সে একান্তে পরমাত্মার সামনে কেঁদে ডাকতে থাকে।

"হে প্রভো ! আমার হৃদয়ে যে পর্য্যন্ত মুক্তির ইচ্ছা রয়ে গেছে সে পর্য্যন্ত আমি আপনার দাস কোথায় হলাম ? আমি তো মুক্তির গোলাম। আপনাকে ছেড়ে অন্যের আশা রাখছি, মুক্তির জন্য আপনার ভক্তি করছি এবং এতেই নিজেকে নিষ্কাম প্রেমী, শরণাগত ভক্ত বলে মানছি। হে প্রভূ ! এ আমার দম্ভাচরণ। হে স্বামীন্ ! দয়া করে এ দম্ভের বিনাশ করুন। আমার হৃদয়ে মুক্তিরূপী কামনার একেবারে মূলোচ্ছেদ করে দিয়ে আপনার অনন্য প্রেমের ভিক্ষা দিন। আপনার মত তুলনা-বিহীন দয়াময়ের কাছ্ থেকে কিছু চাওয়াও ছেলেমানুষী, কিন্তু আতুর (কাতর) কি না করে ?

এই প্রকার শরণাগত ভক্ত সব কিছু ভগবদ্-অর্পণ করে সর্বপ্রকারে নিশ্চিন্ত হয়ে যায়।

ভগবানের প্রত্যেক বিধানে সন্তোষ

এই অবস্থায় যা কিছু ঘটে সে তাতেই সন্তুষ্ট থাকে। প্রারব্ধবশে, অনিচ্ছা বা পরেচ্ছায় যা কিছু লাভ-লোকসান, সুখ-দুঃখের প্রাপ্তি হয় সে উহাকে পরমাত্মার দয়াপূর্ণ বিধান মনে করে সদা সমানভাবে সন্তুষ্ট, নির্বিকার এবং শান্ত থাকে। গীতায় বলা হয়েছে ঃ –

যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্টো দ্বন্দ্বাতীতো বিমৎসরঃ।
সমঃ সিদ্ধাবসিদ্ধৌ চ কৃত্বাপি ন নিবধ্যতে ॥ (৪।২২)

আপনা আপনি যা কিছু পাওয়া যায় তাতেই সে সন্তুষ্ট, হর্ষ-শোক, দ্বন্দ্বের অতীত এবং মৎসরতা অর্থাৎ ঈর্ষা রহিত তথা সিদ্ধি আর অসিদ্ধিতে সমভাব যুক্ত পরুষ কাজ করেও বদ্ধ হয় না।

বাস্তবে শরণাগত ভক্ত তত্ত্বের সঙ্গে এটা জানে যে দৈবযোগে যা কিছু এসে যায় তা ঈশ্বরের ন্যায়সঙ্গত বিধান এবং তাঁর দয়াপূর্ণ আজ্ঞায় হয়ে থাকে। সেইজন্য সে উহাকে পরম সুহৃদ প্রভূ দ্বারা পাঠানো পুরস্কার মনে করে আনন্দে মস্তক নত করে গ্রহণ করে। যেমন কোন

প্রেমী ভদ্রলোক নিজের কোনও প্রেমী ন্যায়কারী সুহৃদ ভদ্রলোক ব্যক্তি দ্বারা কৃত ন্যায়কে নিজের ইচ্ছার প্রতিকূল মনে করলেও সেই ভদ্রলোকের ন্যায়পরায়ণতা, বিবেক-বুদ্ধি, বিচারশীলতা, সুহৃদতা, পক্ষ-পাতহীনতা এবং প্রেমে বিশ্বাস রেখে হর্ষের সাথে স্বীকার করে নেয়, এই প্রকার শরণাগত ভক্তও ভগবানের অতি কঠোর বিধানকে সহর্ষে সাদরে স্বীকার নেয়, কেননা সে জানে যে আমার সুহৃদ অকারণ করুণাময় ভগবান যা কিছু বিধান করেন, তা তাঁর দয়া, প্রেম, ন্যায় এবং মঙ্গল কামনায় পরিপূর্ণ রয়েছে। সে ভগবানের কোনও বিধানে কখনও ভূলেও মন ছোট করে না।

কখনও কখনও ভগবান নিজের শরণাগত ভক্তের কঠিন পরীক্ষা নিয়ে থাকেন, তিনি সবই জানেন, তিন কালের কিছুই তাঁর অগোচরে নেই, তবুও ভক্তের হৃদয় থেকে মান, অহংকার, দুর্বলতা ইত্যাদি সমূলে অপহরণ করে তাকে নির্মল এবং পরিপক্ব করে পরম হিত করার জন্য পরীক্ষার লীলা করে থাকেন।

পরামাত্মার সজ্জন-ব্যক্তিগণ, যারা শরণাগতির তত্ত্বকে উপলব্ধি করে থাকেন তাদের তো কোনও বিষয় নিজের মনের প্রতিকূল প্রতীত হতেই পারে না। বাজীকরের কোনও চেষ্টা তার ঝুঁমুরাকে নিজের মনের প্রতিকূল বা দুঃখদায়ক হয় না। সে তাঁর স্বামীর ইচ্ছার অধীন হয়ে খুব হর্ষের সাথে তাঁর প্রত্যেক ক্রিয়াকে স্বীকার করে নেয়। এই ভাবে ভক্তও ভগবানের প্রত্যেক লীলায় প্রসন্ন থাকে। সে জানে এই সমস্ত আমার প্রভূর মায়াখেলা। সেই অদ্ভূত খেলোয়াড়ের এই সমস্ত হচ্ছে বিভিন্ন ধরণের খেলা। তিনি যে তার লীলাখেলায় আমায় সঙ্গে নিয়েছেন, এটা তো তাঁর অপার দয়া। এটা আমার অনেক সৌভাগ্য যে আমি সেই লীলাময়ের লীলাখেলায় এক যন্ত্র হতে পেরেছি, এরূপ মনে করে সে তাঁর প্রত্যেক লীলায়, তাঁর প্রতিটি খেলায় তাঁর চাতুরী এবং তার পিছনে তাঁর দিব্য দর্শন পেয়ে পদে পদে প্রসন্ন হয়। এটা তো সিদ্ধ ভক্তদের কথা, কিন্তু শরাণাপন্ন হওয়া সাধকও প্রত্যেক সুখ-দুঃখকে তাঁর দয়াপূর্ণ বিধান মনে করে প্রসন্ন থাকে। এখানে এই প্রশ্ন হতে পারে যে,

সুখের প্রাপ্তিতে তো প্রসন্ন হওয়া স্বাভাবিক এবং যুক্তিযুক্ত কিন্তু দুঃখে সুখের ন্যায় প্রসন্ন থাকা কি ভাবে সম্ভব ? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, পরমাত্মার তত্ত্বকে যে উপলব্ধি করতে পেরেছে তাঁর দৃষ্টিতে সুখের প্রাপ্তির ফলে হওয়া প্রসন্নতা এবং শান্তিও কেবল বিকারমাত্র। সে তো পুণ্য-পাপ বশতঃ প্রাপ্ত অনুকূল বা প্রতিকূল বিষয়-বস্তু থেকে উদ্ভূত সুখ-দুঃখ, এই দুই থেকেই অতীত। কিন্তু সাধনাকালেও প্রসন্নতা তো হওয়াই উচিৎ। যেমন কঠিন রোগের সময় বুদ্ধিমান রোগী সৎ-কবিরাজের দেওয়া অত্যন্ত কটু উপযোগী ঔষধ হর্ষের সাথে সেবন করে থাকে এবং কবিরাজের উপকার স্বীকার করে, এই প্রকার নিঃস্বার্থ কবিরাজরূপী পরম সুহৃদ পরমাত্মা দ্বারা বিধান করা কষ্টকে সহর্ষ স্বীকার করে তাঁর কৃপা এবং সদাশয়তার (উদারচেতা) জন্য ঋণী হয়ে সুখী থাকা উচিৎ। ভগবানের প্রিয় প্রেমী শরণাগত ভক্ত মহান্ দুঃখরূপ পরিণামকে খুবই আনন্দের সঙ্গে উপভোগ করে পদে পদে তাঁর দয়া স্মরণকরে পরম প্রসন্ন হতে থাকে। সে মনে করে যে, দয়ালু ডাক্তার যেমন পেকে যাওয়া ফোঁড়াকে কেটে দুষিত পুঁজ বের করে তাকে রোগমুক্ত করে দেয়, এরূপ ভগবান ভক্তের হিতার্থে কখনো কখনো কষ্টরূপী চেরা-ফাড়া করে তাকে নিরোগ করছেন। এরূপ কাজে তার শুধু দয়া ভরে রয়েছে। এই ভেবে ভক্ত আপন ভগবানের প্রত্যেক বিধানে পরম সন্তুষ্ট থাকে। সে দুঃখে উদ্বিগ্ন হয় না এবং সুখের স্পৃহা করে না।

("দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনা সুখেষু বিগতস্পৃহ)।" (গীতা ২।৫৬)

ভগবানের আজ্ঞানুসারে কর্ম

কাজেই সুখের ইচ্ছা না থাকায় সে আসক্তি বা কামনাবশে কোনও নিষিদ্ধ কাজ করতে পারে না। তার প্রতিটি কাজ ঈশ্বরের আজ্ঞানুসারে হয়। তাঁর কোনও ক্রিয়া পরমাত্মার ইচ্ছার প্রতিকূল হয় না, কেননা পরমাত্মার ইচ্ছাতেই সে নিজের ইচ্ছা মিলিয়ে দেয়, সে নিজের কোন স্বতন্ত্র ইচ্ছা রাখে না। যখন একজন সাধারণ শ্রদ্ধাবান সেবকও নিজের মনিবের প্রতিকূল কোন কাজ করতে চায় না, কখনও ভুলে কোন

বিপরীত আচরণ হয়ে গেলে সে লজ্জিত ও সংকুচিত হয়ে নিজের ভুলের জন্য অত্যন্ত অনুশোচনা করে, তাহলে সেই নিষ্কাম প্রেম ভাব নিয়ে শরণাপন্ন হওয়া শ্রদ্ধাবান ঈশ্বরভক্ত পরমাত্মার প্রতিকূল কিঞ্চিৎমাত্র কার্য্যও কিভাবে করতে পারে ? যেমন সতী শিরোমণি পতিব্রতা স্ত্রী আপন পরম প্রিয় পতির ভ্রুকুটির দিকে তাকিয়ে সদা-সর্বদা ছায়ার মত পতির অনুকূল আচরণ করে, সেই ভাবে ঈশ্বর প্রেমী শরণাগত ভক্ত ভগবদ্-ইচ্ছার অনুসরণ করে, সব কিছু তাঁরই মনে করে তার জন্যই কাজ করে থাকে।

এখানে এ প্রশ্ন হতে পারে যে, ঈশ্বর যখন সকলের কাছে প্রত্যক্ষ ভাবে নেই তখন ঈশ্বরের আজ্ঞা (আদেশ) বা ইচ্ছা কি ভাবে জানা যাবে ? এর উত্তর এই যে, (এক) শাস্ত্রের আজ্ঞাই এক প্রকারে ঈশ্বরের আজ্ঞা, কেননা ত্রিকালজ্ঞ ভক্ত ঋষিগণ ভগবানের অভিপ্রায় জেনেই প্রায় শাস্ত্রসমূহের নির্মাণ করেছেন। (দ্বিতীয়তঃ) শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ন্যায় গ্রন্থে ভগবদাজ্ঞা প্রত্যক্ষ রয়েছে। এ ছাড়া ভগবান সর্বব্যাপী এবং সর্বান্তর্য্যামী হবার ফলে সকলের হৃদয়ে প্রত্যক্ষ বিদ্যমান রয়েছেন। মানুষ যদি স্বার্থ ত্যাগ করে সরল জিজ্ঞাসু-হৃদয়ে হৃদয় স্থিত ঈশ্বরকে জিজ্ঞাসা করে তাহলে সাধারণতঃ যথার্থ উত্তর পেয়েই যায়। মিথ্যা কথা বলতে, চুরি করতে অথবা হিংসা আদি কর্মে কারও মন সায় দেয় না। ইহাই ভগবানের ইচ্ছার সংকেত।

অন্তঃকরণের অজ্ঞানের বিশেষ আবরণের ফলে যে প্রশ্নের উত্তর সন্দেহযুক্ত হয়, যার নির্ণয় করতে আমাদের বুদ্ধি সমর্থ হয় না, সেই বিষয়ে স্বার্থরহিত সদাচারী ধর্মের তত্ত্বকে জানে এমন ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করে নির্ণয় করা উচিৎ। যে বিষয়ে নিজের মনে কোন সন্দেহ নেই, সেই বিষয়েও উত্তম পুরুষদের সঙ্গে পরামর্শ করে নেওয়াও লাভদায়ক, কেননা যে পর্য্যন্ত মানুষ পরমাত্মাকে তত্ত্বের সঙ্গে জেনে না যায় সে পর্য্যন্ত ভ্রম বশতঃ কোথাও কোথাও অসত্যের সত্য রূপে প্রতীত হওয়া সম্ভব, এইজন্য নির্ণীত বিষয়ও সৎপুরুষদের সম্মতি নিয়ে মার্জন করে নেওয়া উচিৎ। অন্তঃকরণ শুদ্ধ হলে পরমাত্মার সংকেত যথার্থভাবে বুঝতে পারা যায়। তখন সাধক যা কিছু করে তা সমস্তই প্রায় ঈশ্বরের অনুকূলই করে থাকে।

এরূপ দেখা যায় যে মালিকের ইচ্ছানুসারে চলে এমন স্বামীভক্ত সেবক, যে সদা মালিকের সংকেত কাজ করে থাকে, সে মালিকের ভাব সামান্য ইঙ্গিত পেলেই বুঝে নেয় । যখন সাধারণ মানুষ এরূপ হতে পারে, তখন ঈশ্বরের শরণাগত ভক্ত, শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং প্রেমের বলে ঈশ্বরের তাৎপর্য্যকে বুঝে নেয়, এতে আশ্চর্য্যের কি আছে ?

ঈশ্বরের ইচ্ছা জানার বিষয়ে আরও একটি দিক রয়েছে । এটা বোঝা উচিত যে ঈশ্বর সর্বজ্ঞ, সর্বসুহৃদ্, দয়াসাগর, সবার আত্মা এবং সকলের হিতে রত । অতএব কোনও জীবের, কোনও প্রকারে কোনও কালে অহিত বা অনিষ্ট করায় উনার সম্মতি থাকতে পারে না, সেইজন্য যে কাজ যথার্থরূপে অন্যের হিত হয়, তাই ঈশ্বরের ইচ্ছার অনুকূল কাজ এবং যাতে জীবের অনিষ্ট হয়, তাহা উনার ইচ্ছার প্রতিকূল কাজ ।

কিছু লোক ভ্রমবশতঃ শাস্ত্র কিংবা ধর্মের দোহাই দিয়ে অন্যের অহিত, অনিষ্ট বা হিংসা প্রভৃতিকে ধর্ম বলে মেনে নেয়, কিন্তু এরূপ মেনে নেওয়া অনুচিত । হিংসা এবং অহিত কখনও ধর্ম কিংবা ঈশ্বরের অভিপ্রেত হতে পারে না । অবশ্য যদি কারও হিতের দৃষ্টিতে মাতা-পিতা কিংবা গুরুদ্বারা স্নেহ ভাবে নিজের বালক কিংবা শিষ্যকে তাড়না করার মত দন্ড প্রভৃতি দেওয়া হয় তবে তা হিংসার অন্তর্ভূক্ত নয় ।

অতএব ভক্ত প্রত্যেক কাজ ভগবদ্-ইচ্ছার অনুকূলই করে থাকে, ফলে সে পাপ বা নিষিদ্ধ কর্ম তো কখনও করতেই পারে না, তাঁর প্রতিটি কাজ স্বাভাবিক ভাবেই সরল, সাত্ত্বিক এবং লোকহিতকারী হয়, কেননা সংসারে তাঁর না আছে কোন স্বার্থ, না কোনও বস্তুতে আসক্তি এবং না আছে তাঁর কোনও কালে কারও থেকে ভয় ।

শরণাগত ভক্তের ক্ষেত্রে তো বলারই কি আছে ? যথার্থভাবে যে শুধু ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করে নেয় তারও ক্ষেত্রে ভয় এবং পাপ থাকতেই পারে না । রাজা বা রাজকর্মচারী নির্জন স্থানে এবং অন্ধকারময়ী রাত্রিতে সব সময় উপস্থিত থাকেন না, কিন্তু কেবল রাজ্যের সত্ত্বার জন্য লোকে প্রায় নিয়মবিরুদ্ধ কাজ করে না । রাজকর্মচারী যেখানে থাকে সেখানে তো আইন ভাঙ্গা খুবই কঠিন । রাজসত্ত্বার যখন এই প্রতাপ, তখন যে পরমাত্মাকে সর্বত্র দেখে তাঁর দ্বারা

পাপ কি করে হতে পারে ? ঈশ্বর সর্বব্যাপি হওয়ায় সব জায়গায় উনার হওয়া সিদ্ধই রয়েছে। তাহলে ভয় কিসের ? কেননা যখন একজন রাজকর্মচারী সঙ্গে থাকলেও চোরের ভয় হয় না, তখন রাজেশ্বর ভগবান যার সঙ্গে রয়েছেন তার ভয়ের সম্ভাবনাই বা কোথায় ? যারা নিজেদের ভক্ত বলে পরিচয় দিয়েও পাপে ফেঁসে রয়েছে কিংবা কথায় কথায় মৃত্যু আদিকে ভয় পায়, তারা আসলে ঈশ্বরের অস্তিত্বই মানে না। যারা ঈশ্বরকে মানেন তাঁরা তো নিত্য নিষ্পাপ এবং নির্ভয় থাকেন।

ভগবানের নিরন্তর চিন্তন

শরণাগত সাধকের যদি কোনও প্রকারের ভয় থেকে থাকে তাহলে তা শুধু এটাই যে কখনও যেন তার চিত্ত থেকে প্রিয়তম পরমাত্মার বিস্মৃতি না হয়। বাস্তবে সে কখনও পরমাত্মাকে ভুলতেই পারে না, কেননা ক্ষণমাত্রের জন্যও পরমাত্মার চিন্তনের বিয়োগ সে সইতে পারে না, **"তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা"** (নারদ ভক্তিসূত্র)। সম্পূর্ণ কর্ম পরমাত্মাকে অর্পণ করে প্রতিপল তাকে স্মরণে রাখা এবং ক্ষণমাত্রের বিস্মৃতি হলে মণিহীন সর্প বা জল থেকে আলাদা করা মাছের ন্যায় পরম ব্যাকুল হয়ে ছটপট করা তার স্বভাব হয়ে যায়। তাঁর দৃষ্টিতে এক পরমাত্মাই তার পরম জীবন, পরম ধন, পরম আশ্রয়, পরম গতি ও পরম লক্ষ্য হয়ে রয়ে যায়, প্রতিপল তার নাম-গুণের চিন্তন করা, তার প্রেমে তন্ময় হয়ে থাকা, বাহ্যজ্ঞান ভূলে উন্মত্ত হয়ে যাওয়া, পরম উল্লাসে প্রেমে দোলা খেতে থাকা, ইহাই তার দিনচর্চ্চা হয়ে যায়।

ক্বচিদ্রুদন্ত্যচ্যুতচিন্তয়া ক্বচি
দ্ধসন্তি নন্দন্তি বদন্ত্যলৌকিকাঃ।
নৃত্যন্তি গায়ন্ত্যনুশীলয়ন্ত্যয়ং
ভবন্তি তুষ্ণীং পরমেত্য নিবৃতাঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১১।৩।৩২)

"সেই ভক্তগণ কখনও তো সেই অচ্যুতের চিন্তন করতে করতে কাঁদতে থাকেন, কখনও হাস্য করেন, কখনও আনন্দিত হন, কখনও অলৌকিক কথা বলতে থাকেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও গান করেন,

কখনও সেই অজন্মা প্রভূর লীলার অনুকরণ করেন আবার কখনও পরমানন্দকে পেয়ে শান্ত চুপ হয়ে থাকেন ।

এই প্রকার পরমাত্মার শরণের তত্ত্ব জেনে সেই ভক্ত ভগবানের তদ্রুপতাকে প্রাপ্ত হয়ে যায় :–

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মানস্তন্নিষ্ঠাস্তৎ পরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ (গীতা ৫।১৭)

"তদ্রুপ যাদের বুদ্ধি, তদ্রুপ যাদের মন এবং সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই নিরন্তর একই ভাবে যাদের স্থিতি, এরূপ পরমেশ্বর পরায়ণ পুরুষ জ্ঞান দ্বারা পাপ-রহিত হয়ে অপুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরমগতি প্রাপ্ত হন ।" এরূপ পুরুষদের জন্যই শ্রীভগবান বলেছেন, আমি তার অত্যন্ত প্রিয় এবং সে আমার অত্যন্ত প্রিয়, **"প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽর্থত্য মহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥"** (গীতা ৭।১৭) তার কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং আমার কাছে সে অদৃশ্য হয় না । **"তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥"** (গীতা ৬।৩০)

এরূপ পুরুষের দ্বারা শরীরের যে ক্রিয়া হয়ে থাকে তাকে ক্রিয়া বলা যায় না । আনন্দে মগ্ন থেকে সেই ভগবানের শরণাগত ভক্ত লীলাময় ভগবানের আনন্দময়ী লীলারই অনুকরণ করে থাকে অতএব তার কর্মও লীলামাত্রের মতনই হয় । ভগবান বলছেন :–

সর্ব্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ত্তত ॥ (গীতা ৬।৩১)

যে পুরুষ একীভাবে স্থিত হয়ে সম্পূর্ন ভুতসমূহে আত্মারূপে স্থিত সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবরূপ আমাকে ভজনা করে, সেই যোগী সর্বপ্রকারে ব্যবহার করেও আমাতেই বর্ত্তমান রয়েছেন ; কেননা তার অনুভবে আমি ভিন্ন অন্য কিছুই নেই ।

সেইজন্য সে সকলের সঙ্গে নিজের আত্মার মতনই ব্যবহার করে থাকে, তার দ্বারা কখনও অনিষ্ট হতে পারে না । এরূপ অভিন্নদর্শী পরমাত্মপরায়ণ তদ্রুপ ভক্তগণের মাঝে কেউ স্বামী শুকদেবের মতন

লোকের উদ্ধারের জন্য উদাসীনের ন্যায় বিচরণ করেন, কেউ অর্জুনের মতন ভগবদাজ্ঞানুসারে আচরণ করতে থেকে কর্তব্য কর্মের পালনে নিযুক্ত থাকেন, কেউ প্রাতঃস্মরণীয়া ভক্তিমতী গোপীগণের ন্যায় অদ্ভুত প্রেমলীলায় মত্ত্ব থাকেন আর কেউ জড়ভতের ন্যায় জড় এবং উন্মত্তবৎ চেষ্টা করতে থাকেন।

এরূপ শরণাগত ভক্ত স্বয়ং তো উদ্ধারস্বরূপই রয়েছেন এবং জগতের উদ্ধারকারী, এরূপ মহাপুরুষগণের দর্শন, স্পর্শ, ভাষণ এবং চিন্তন দ্বারাই মনুষ্য পবিত্র হয়ে যায়। তাঁরা যেখানে গমন করেন সেখানকার পারিপার্শ্বিক পরিবেশ শুদ্ধ হয়ে যায়, পৃথিবী পবিত্র হয়ে তীর্থ হয়ে যায়, এরূপ পুরুষেরই সংসারে জন্মগ্রহণ করা সার্থক এবং ধন্য। এরূপ মহাত্মাদের জন্যই ইহা বলা হয়েছে ঃ–

কূলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা।
বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন॥
অপারসংবিৎসুখসাগরেঽস্মিন্ ।
লীনং পরে ব্রহ্মনি যষ্য চেতঃ ॥

(স্কঃ পুঃ মাহেঃ খঃ কৌ খঃ ৫৫।১৪০)
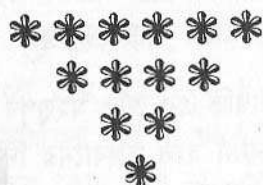
॥ শ্রী হরিঃ ॥

অনন্য প্রেমই ভক্তি

অনির্বচনীয় ব্রহ্মানন্দের প্রাপ্তির জন্য ভগবদ্ভক্তির ন্যায় কোনও যুগে অন্য কোনও সুগম উপায় নেই । কলিযুগে তো একেবারেই নেই । কিন্তু সবচেয়ে আগে এটা জানতে হবে, ভক্তি কাকে বলে ? ভক্তি বলাতে যত সহজ, করার বেলায় ততই কঠিন, কেবল বাহ্য আড়ম্বরের নাম ভক্তি নয় । ভক্তি দেখানোর জিনিষ নয়, উহা তো হৃদয়ের পরম গুপ্তধন । ভক্তির স্বরূপ যত গুপ্ত রাখা হয় ততই তা অধিক অধিক মূল্যবান বলে বিবেচিত হয় । ভক্তি-তত্ত্বকে বোঝানো খুব কঠিন । সেই ভাগ্যবানদের অবশ্য ইহা বুঝতে খুব আয়াস বা পরিশ্রম করতে হয় না, যারা সেই দয়াময় পরমেশ্বরের শরণাপন্ন হয়ে যান । অনন্য শরণাগত ভক্তকে ভক্তির তত্ত্ব পরমেশ্বর স্বয়ং বুঝিয়ে দেন । একবারও যে সৎ হৃদয়ে ভগবানের শরণাপন্ন হয়ে যায়, ভগবান তাকে অভয় করে দেন, ওটা তাঁর ব্রত ।

সকৃদেব প্রপান্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে ।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্ব্রতং মম ॥

(বাল্মীকি রামায়ণ ৬/১৮/৩৩)

ভগবানের শরণাগতি এক অতি মহত্ত্বপূর্ণ সাধন কিন্তু এতে অনন্যতা থাকা চাই । পূর্ণ অনন্যতা হলে ভগবানের দিক থেকে তৎক্ষণাৎ ইপ্সিত উত্তর পাওয়া যায় । বিভীষণ অত্যন্ত আতুর হয়ে একমাত্র শ্রীরামের আশ্রয়েই নিজের রক্ষা সম্ভব মনে করে শ্রীরামের শরণে আসে । ভগবান রাম তাকে সেই মুহূর্তে স্বীকার করে নিয়েছিলেন । কৌরবদের রাজসভায় সব দিক দিয়ে নিরাশ হয়ে দেবী দ্রৌপদী যে মুহূর্তে অশরণ-শরণ শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করেছিল, সঙ্গে সঙ্গেই তার বস্ত্র অনন্তগুণ হয়ে গিয়েছিল । ইহা অনন্য ভাবে শরণাপন্ন হবার উদাহরণ । এই শরণাগতি

সাংসারিক কষ্ট-নিবৃত্তির জন্য হয়েছিল। এই ভাব রেখে ভক্তকে কেবল ভগবানের জন্যই ভগবানের শরণাগত হওয়া উচিৎ। তাহলে তত্ত্ব উপলদ্ধিতে বিলম্ব হবে না। যদিও এই প্রকার ভক্তির পরম তত্ত্ব ভগবানের শরণাপন্ন হলেই জানা যেতে পারে তবুও শাস্ত্র এবং সন্ত-মহাত্মাদের উক্তির আধারে নিজের অধিকার মনে না করেও নিজের চিত্তের প্রসন্নতার জন্য আমি যা কিছু লিখছি, ভক্তজন এরজন্য আমাকে ক্ষমা করবেন।

পরমাত্মায় পরম অনন্য বিশুদ্ধ প্রেম হওয়াকেই ভক্তি বলা হয়। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অনেক জায়গায় এর বিবেচন রয়েছে, যেমন ঃ –

ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী (১৩/১০)
মাং চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে (১৪/২৬)

প্রভৃতি এই ধরনের ভাব নারদ এবং শন্ডিল্য-সূত্রেও পাওয়া যায়। অনন্য প্রেমের সাধারণভাবে স্বরূপ এই যে এক ভগবান ছাড়া অন্য কিছুতে কোন সময়ও আসক্তি না হয়, প্রেমের মগ্নতায় এক ভগবান ভিন্ন অন্য কিছুরও যেন জ্ঞান না থাকে। যেখানে যেখানে মন যায় সেখানেই ভগবান দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ হয়ে হয়ে অভ্যাস বেড়ে গেলে নিজের বিস্মৃতি হয়ে কেবল এক ভগবানই বয়ে যান। ইহাই হচ্ছে বিশুদ্ধ অনন্য প্রেম। পরমেশ্বরে প্রেমের হেতু কেবল পরমেশ্বর কিংবা তার শুধু প্রেমই যেন হয় – প্রেমের জন্যই শুধু প্রেম করা, অন্য কোন হেতু যেন না থাকে। মান, বড়াই, প্রতিষ্ঠা এবং ইহলোকে ও পরলোকের কোনও পদার্থের ইচ্ছার গন্ধও যেন সাধকের মনে না থাকে, ত্রৈলোক্যের রাজ্যের জন্যও যেন তার মনে লোভের কোন ভাব না আসে। স্বয়ং ভগবান প্রসন্ন হয়ে ভোগ্য-পদার্থ প্রদান করার জন্য যদি আগ্রহ করেন, তবুও তা স্বীকার করে না। এতে যদি ভগবান রুষ্টও হন, তারও পরোয়া করে না। নিজের স্বার্থের কথা শোনা মাত্রই যেন তার অতিশয় বৈরাগ্য এবং উপরামতা হয়। ভগবানের কাছ থেকে বিষয়াদির প্রলোভন পেলে মনে অনুশোচনা হয়ে এই ভাবের উদয় হয় যে, অবশ্যই আমার প্রেমে কোন

দোষ রয়েছে, আমার মনে সত্যিকারের বিশুদ্ধ ভাব থাকলে এবং এই স্বার্থযুক্ত কথা শুনে যথার্থই আমার ক্লেশ হলে, ভগবান আমাকে কখনও লোভ দিতেন না। বিনয়, অনুরোধ এবং ভয় দেখালেও পরমাত্মার প্রেম ছাড়া কোন অবস্থাতেই অন্য কোন বস্তু যেন স্বীকার করা না হয়। নিজের প্রেম-হঠে অটল-অচল থাকবে। সে যেন ইহাই বুঝে যে, যতক্ষন পর্য্যন্ত ভগবান আমাকে নানা প্রকারের বিষয়ের প্রলোভন দিয়ে তাতে আকর্ষণ করছেন, এবং আমার পরীক্ষা নিচ্ছেন, ততক্ষন পর্য্যন্ত নিশ্চয়ই আমার মধ্যে বিষয়াসক্তি রয়েছে। যদি সত্যিকারের প্রেম থাকত, তাহলে নিজের প্রেমাস্পদ ভিন্ন অন্য কথাও আমি সইতে পারতাম না। বিষয়সমুহের দেখা, শোনা, এবং সহ্য করে যাচ্ছি, এতে ইহাই প্রমানিত হয় যে, আমি আসল প্রেমের অধিকারী নই। সেই জন্যই তো ভগবান আমাকে লোভ দেখাচ্ছেন। উত্তম তো ইহাই হত যে এই চর্চ্চা শোনার সাথে সাথে আমি মূর্ছিত হয়ে পড়ে যেতাম। এই অবস্থা হচ্ছে না, কাজেই নিঃসন্দেহে আমার হৃদয়ে কোথাও না কোথাও বিষয়-বাসনা লুকিয়ে রয়েছে। বিশুদ্ধ প্রেমে উন্নত সাধকের ইহাই স্বরূপ।

এরূপ বিশুদ্ধ প্রেম হলে যে আনন্দ হয় তা অকথণীয়। পরমাত্মার কোনও এক অনন্য প্রেমীই এরূপ প্রেমের বাস্তবিক মহত্ত্ব জানেন। প্রেমের সাধারনত তিনটি সংজ্ঞা বয়েছে, গৌন, মুখ্য ও অনন্য। যেমন ছোট্ট বাছুর কে ছেড়ে গরু মাঠে ঘাস খেতে যায়, সেখানে ঘাস খায়। এক্ষেত্রে ঘাসে গরুর প্রেম গৌণ, বাছুরে মুখ্য এবং নিজের জীবনে রয়েছে অনন্য প্রেম, কেননা সে বাছুরের জন্য ঘাস এবং জীবনের জন্য বাছুরকেও ত্যাগ করতে পারে। এই প্রকার উত্তম সাধক সাংসারিক কাজ করা কালীনও অনন্য-ভাবে পরমাত্মার চিন্তন করে থাকেন। সাধারণ ভগবদ্-প্রেমী সাধক নিজের মনকে পরমাত্মায় লাগাবার চেষ্টা করে কিন্তু অভ্যাস এবং আসক্তিবশে ভজন-ধ্যান করার সময়েও তাঁর মন বিষয়সমূহে চলেই যায়। ভগবানে যার মূখ্য প্রেম রয়েছে, সে সব সময় ভগবানকে স্মরণে বেখেই সব কাজ করে, এবং যার ভগবানে অনন্য

প্রেম হয় তাঁর কাছে তো সমস্ত চরাচর বিশ্ব এক বাসুদেবময় প্রতীত হতে থাকে। এরূপ মহাত্মা খুবই দুর্লভ (গীতা ৭/১৯)

এই প্রকারের অনন্য প্রেমী ভক্তদের মধ্যে কেউ-কেউ তো প্রেমের এত গভীরে ডুবে যান যে, লোকদৃষ্টিতে তারা পাগলের মত হন। কারও কারও বালকের ন্যায় চেষ্টা হয়ে থাকে। তাদের সাংসারিক কাজকর্ম আলগা হয়ে যায়। কেউ এই ধরনেরও প্রেমী পুরুষ হন, যারা অনন্য প্রেমে নিমগ্ন হয়েও মহান ভাগবত শ্রীভরতের ন্যায় বা ভক্তরাজ শ্রীহনুমানের ন্যায় সর্বদাই প্রভূ শ্রীরামচন্দ্রের সেবার জন্য প্রস্তুত থাকেন। এই ভক্তদের সব কাজই লোকহিতার্থে হয়ে থাকে। একটি মুহূর্ত্তের জন্যও এই মহাত্মাগণ পরমাত্মাকে ভোলেন না, এবং ভগবানও তাদের ভুলতে পারেন না। ভগবান এইরূপই বলেছেন ঃ–

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রনশ্যতি ॥

॥ শ্রী হরিঃ ॥

গীতায় ভক্তি

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা এক অদ্বিতীয় আধ্যাত্মিক গ্রন্থ, ইহা কর্ম উপাসনা এবং জ্ঞানের তত্ত্বে পরিপূর্ণ ভাণ্ডার। এটা কেউ বলতে পারবে না যে গীতায় প্রধান ভাবে কোনও একটি বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে। যদিও গ্রন্থটি ছোট্ট এবং সূত্ররূপে এতে সব বিষয়ের বর্ণনা রয়েছে, কিন্তু কোনও বিষয়ের বর্ণনা স্বল্প হলেও তা অপূর্ণ নয়, সেই জন্য বলা হয়েছে –

গীতা সুগীতা কর্ত্তব্যা কিমন্যৈঃ শাস্ত্রবিস্তরৈঃ।
য়া স্বয়ং পদ্মনাভস্য মুখপদ্মাদ্বিনিঃসৃতা ॥

(মহাভারত ভীষ্মপর্ব ৪৩/১)

এই কথনের দ্বারা অন্য শাস্ত্রসমূহকে নিষেধ করা হয় নি, এর দ্বারা তো গীতার মহত্ত্ব দেখানো হয়েছে, বাস্তবে গীতায় জ্ঞানের উপলব্ধি করা হলে আর জানার বাকি থাকে না। গীতায় নিজ-নিজ জায়গায় কর্ম, উপাসনা এবং জ্ঞান এই তিনটিরই বিশদ এবং পূর্ণ বর্ণনা থাকার জন্য এতে কোন্ বিষয়টি প্রধান এবং কোনটি গৌণ তা বলা যায় না। সুতরাং যার যে বিষয়টি প্রিয়, যে সিদ্ধান্ত মান্য রয়েছে, গীতায় তাহাই ভাসিত হতে থাকে। সেইজন্য ভিন্ন-ভিন্ন টীকাকারগণ নিজের নিজের ভাবনা অনুসারে ভিন্ন-ভিন্ন অর্থ করেছেন কিন্তু তার মধ্যে কোন একটিকেও আমরা অসত্য বলতে পারি না। বেদ যেমন পরমাত্মার নিঃশ্বাস সেইরূপ গীতাও সাক্ষাৎ ভগবানের বাণী হবার ফলে ইহাও সাক্ষাৎ ভগবদ্-স্বরূপ। অতএব ভগবানের ন্যায় গীতার স্বরূপও ভক্তগণের কাছে ভাবনা অনুসারে ভিন্ন ভিন্ন প্রকারে ভাসিত হয়। কৃপাসিন্ধু ভগবান তাঁর প্রিয় সখা ভক্ত অর্জুনকে নিমিত্ত করে সমস্ত সংসারের কল্যাণের জন্য এই অদ্ভুত গীতা-শাস্ত্রের উপদেশ করেছেন। এরূপ গীতা শাস্ত্রের কোনও তত্ত্বের উপরে বিবেচনা করা আমার সদৃশ্য

সাধারণ লোকের কাছে ছেলেমানুষী মাত্র। এ বিষয়ে আমি কিছু বলার অধিকার না জেনেও যা কিছু বলে যাচ্ছি তা শুধু নিজের মনের বিনোদনের জন্য। আপনাদের কাছে আমার নিবেদন যে বিজ্ঞজন আমার এই শিশুসুলত চেষ্টার জন্য ক্ষমা করবেন।

গীতায় কর্ম, ভক্তি এবং জ্ঞান এই সিদ্ধান্তেরই নিজ নিজ জায়গায় প্রধানতা দেওয়া হয়েছে তবুও এটা বলা যায় যে গীতা এক ভক্তিপ্রধান গ্রন্থ, এতে এমন কোন অধ্যায় নেই যাতে ভক্তির কিছু না কিছু প্রসঙ্গ নেই। গীতার আরম্ভ ও সমাপ্ত ভক্তিতেই হয়েছে। আরম্ভে অর্জুন **শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্** (গীতা ২/৭) বলে ভগবানের শরণাপন্ন হন এবং শেষে ভগবান **"সর্ব্বধর্মান্‌পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ"** (গীতা ১৮/৬৬) বলে শরণাগতিরই পূর্ণ সমর্থন করেছেন। শুধু সমর্থনই নয়, সমস্ত ধর্মের আশ্রয় সর্বথা পরিত্যাগ করে কেবল ভগবদাশ্রয় – নিজের আশ্রয়ে আসার জন্য আজ্ঞা করেছেন এবং এর সঙ্গে সকল পাপ থেকে মুক্ত করে দেবারও দায়িত্ব নিয়েছেন। ইহা খুবই স্পষ্ট যে শরণাগতি হচ্ছে ভক্তিরই একটি স্বরূপ। তার মানে এই নয় যে গীতায় ভক্তি বলতে অবিবেকপূর্বক করা অন্ধভক্তি বা অজ্ঞান প্রেরিত আলস্যময় কর্মত্যাগরূপ জড়তা কে বলা হয়েছে, গীতায় ভক্তি হচ্ছে ক্রিয়াত্মক এবং বিবেকপূর্ণ। পূর্ণপুরুষ পরমাত্মার পূর্ণতার সমীপে পৌঁছে যাওয়া সাধক দ্বারা গীতার ভক্তি করা হয়। গীতার ভক্তির চিহ্ন বারো অধ্যায়ে ভগবান স্বয়ং বলেছেন। গীতার ভক্তিতে পাপের স্থান নেই। বাস্তবে ভগবানের যে শরণাগত ভক্ত সবদিকে সবার মধ্যে সবসময়ে ভগবানকে দেখে থাকে, সে কি করে লুকিয়েও পাপ করতে পারে ? যে শরণাগত ভক্ত নিজের জীবনকে পরমাত্মার হাতে অর্পণ করে তার ইশারায় নৃত্য করতে প্রস্তুত, তার দ্বারা পাপ কি করে হতে পারে ? যে ভক্ত সমগ্র জগতে পরমাত্মার স্বরূপ মনে করে সকলের সেবা করা নিজের কর্ত্তব্য মনে করে, সে কি করে নিষ্ক্রিয় কুঁড়ে হয়ে থাকতে পারে ? এবং যার পরমাত্মস্বরূপের জ্ঞানের প্রকাশ রয়েছে সে কি করে অন্ধ-তমশায় প্রবেশ করতে পারে ?

[275] ক০ প্রা০ ত০ (বাংলা) 4 A

এইজন্য ভগবান অর্জুনকে স্পষ্ট করে বলেছেন ঃ –

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ ।

ময্যার্পিতমনোবুদ্ধি র্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ (গীতা ৮/৭)

যুদ্ধ কর, কিন্তু সব সময় আমাকে (ভগবানের) স্মরণে রেখে আমাতে (ভগবানে) অর্পিত মন-বুদ্ধিদ্বারা যুক্ত হয়ে । ইহাকেই নিস্কামকর্মযুক্ত ভক্তিযোগ বলা হয় এবং এর দ্বারা নিঃসন্দেহে পরমাত্মার প্রাপ্তি হয় । এই প্রকার আজ্ঞা গীতার ৯/২৭ এবং ১৮/৬৭ প্রভৃতি শ্লোকেও দেওয়া হয়েছে ।

এর মানে এই নয় যে কেবল কর্মযোগ বা কেবল ভক্তিযোগের জন্য ভগবান স্বতন্ত্রভাবে কিছুই বলেন নি । **"কর্মণ্যেবাধিকারস্তে"** (২/৪৭) **"যোগস্থ কুরু কর্মানি"** (২/৪৮) প্রভৃতি শ্লোকে কেবল কর্মের এবং **"মন্মনা ভব"** (৯/৩৪) প্রভৃতি শ্লোকে কেবল ভক্তির বর্ণনা রয়েছে কিন্তু এর মধ্যেও কর্মে ভক্তি এবং ভক্তিতে কর্মের অনোন্যাশ্রিত প্রচ্ছন্ন সম্বন্ধ রয়েছে । সমত্বরূপ যোগে স্থিত হয়ে ফলের অধিকার ঈশ্বরের দায়িত্বে ছেড়ে দিয়ে যে কর্ম করে, সেও **প্রকারান্তরে** ঈশ্বরস্মরণরূপ ভক্তি করে থাকে এবং যে ভক্তি পুজা, নমস্কার প্রভৃতি ভগবদ্-ভক্তিমূলক ক্রিয়া করে সেই সাধকও তত্ত্বতঃ ক্রিয়ারূপ কর্মই করে থাকে । সাধারণ সকামকর্মে এবং এরমধ্যে এইটুকুই তফাৎ যে সকামকর্মী কর্মের অনুষ্ঠান সাংসারিক কামনা সিদ্ধির জন্য করে এবং নিস্কামকর্মী তা ভগবদ্-প্রীত্যর্থ করে থাকে । স্বরূপতঃ কর্মের ত্যাগ করাকে গীতায় নিন্দা করা হয়েছে এবং উহাকে তামস ত্যাগ বলা হয়েছে (১৮/৭) এবং ৩য় অধ্যায়ের ৪র্থ শ্লোকে কর্মত্যাগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত না হওয়ার কথা বলে পরের শ্লোকে (৩/৫) স্বরূপে কর্মত্যাগকে অশক্য (অসাধ্য) বলা হয়েছে । অতএব গীতার অনুসারে প্রধানতঃ অনন্যভাবে ভগবানের স্বরূপে স্থিত হয়ে ভগবানের আজ্ঞা মনে করে ভগবানের জন্য মন, বাণী, শরীরের দ্বারা নিজের বর্ণাশ্রম অনুসারে সমস্ত কর্মের আচরণ করাই হচ্ছে ভগবানের ভক্তি এবং

এর ফলেই পরম সিদ্ধিরূপী মোক্ষের প্রাপ্তি হতে পারে। ভগবান ঘোষণা করেছেন ঃ–

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যচর্য্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ (গীতা ১৮/৪৬)

"যে পরমাত্মা দ্বারা সর্ব প্রকারের ভূত সমূহের উৎপত্তি হচ্ছে এবং যার দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ ব্যাপ্ত রয়েছে, সেই পরমেশ্বরকে নিজের নিজের স্বাভাবিক কর্মদ্বারা পূজা করে মানুষ পরম সিদ্ধিলাভ করে।

এই প্রকারের কর্ম বন্ধনের কারণ না হয়ে মুক্তিরই কারণ হয়ে থাকে, এতে পতনের কোনও ভয় থাকে না। ভগবান সাধককে ভগবদ্-প্রাপ্তির জন্য এবং সাধনোত্তর সিদ্ধকালে জ্ঞানীকেও লোকসংগ্রহ অর্থাৎ জনগণকে সৎমার্গে আনার জন্য নিজের উদাহরণ দিয়ে কর্ম করার আদেশ দিয়েছেন, যদিও তার ক্ষেত্রে কোন, কর্তব্যের শেষ থাকে না – "**তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে** (৩/১৭)

এ ছাড়া অর্জুন ক্ষত্রিয়, গৃহস্থ এবং কর্মঠ পুরুষ ছিলেন, সেইজন্য তাকে কর্মসহিত ভক্তি করার জন্য বিশেষভাবে বলা হয়েছিল এবং বাস্তবিক পক্ষে সর্বসাধারণের হিতের জন্যও ইহাই আবশ্যক। সংসারে তমোগুণ অধিক ব্যাপ্ত রয়েছে। তমোগুণের কারণে লোকে ভগবদ্-তত্ত্বে অনভিজ্ঞ হয়ে একান্তভাবে ভজন ধ্যান করার অছিলায় নিদ্রা, আলস্য ও অকর্মণ্যতার বশীভূত হয়ে যায়। এরূপ দেখাও যায় যে, কিছু লোক "আমি তো নিরন্তর একান্তে থেকে কেবল ভজন-ধ্যানই করে যাব" – এরূপ ঠিক করে কর্ম ত্যাগ করে, কিন্তু অল্প দিনেই তাদের মন একান্ত থেকে সরে আসে। কিছু লোক ঘুমিয়ে সময় কাটায়, কেউ আবার বলে, "কি করব, ধ্যানে মন লাগে না"। ফলে কেউ তো কুঁড়ে হয়ে যায় আবার কেউ প্রমাদবশে ইন্দ্রিয়াদির আরামকারী ভোগে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। প্রকৃত ভজন, ধ্যানকারী তো কেউ কেউ হয়ে যাক। একান্তে থেকে ভজন-ধ্যান করা খারাপ নয়, কিন্তু এটা সাধারণ কথা নয়। এর জন্য প্রচুর অভ্যাসের আবশ্যকতা রয়েছে, এবং সেই অভ্যাস কর্ম করতে করতেই ক্রমশঃ বাড়িয়ে এবং গাঢ় করা যেতে পারে, সেইজন্য ভগবান

বলেছেন যে নিত্য-নিরন্তর আমাকে স্মরণ রেখে কাজে লেগে থেকে ফলাসক্তি রহিত হয়ে আমার আজ্ঞায় আমার প্রীতির জন্য কর্ম করা উচিৎ। পরমেশ্বরের ধ্যানের গাঢ় স্থিতি লাভের জন্য কর্মের সংযোগ বাধক নয় আবার কর্মের বিয়োগও সাহায্যকারী নয়। প্রীতি এবং সত্যিকারের শ্রদ্ধাই এতে প্রধান কারণ। প্রীতি এবং শ্রদ্ধা জাগলে কর্ম উহাতে বাধক হয় না উপরন্তু তাঁর প্রতিটি কর্ম ভগবদ্ প্রীতির জন্যই অনুষ্ঠিত হয়ে শুদ্ধ-ভক্তি রূপে পরিণত হয়ে যায়। কাজেই এ ভাবেও কর্মত্যাগের আবশ্যকতা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু আমার এই কথনে একান্তে থেকে নিরন্তর ভক্তি করার নিষেধও করা হয় নি। অধিকারীদের জন্য **"বিবিক্তদেশসেবিত্তম"** এবং **অরতির্জনসংসদি** (১৩ /১০)

সাধনা উচিতই, কিন্তু সংসারে প্রায় কর্মের-ই অধিকারী পাওয়া যায়। একান্তবাসের বাস্তবিক অধিকবারী তাঁরাই যারা ভগবানের ভক্তিতে মগ্ন রয়েছে, যাদের হৃদয় অনন্যপ্রেমে পরিপূর্ণ, যারা ভগবানের ক্ষণমাত্র বিস্মরণেই পরম ব্যাকুল হয়ে যান, ভগবদ্ প্রেমের বিহ্বলতায় বাহ্যজ্ঞান লুপ্তপ্রায় হওয়ার দরুণ যাদের সাংসারিক কার্য্য সুচারুরূপে সম্পন্ন হতে পারে না এবং যাদের সাংসারিক ঠাট-বাট, ভোগের দর্শন শ্রবণমাত্রেই তাপ হতে থাকে, এরূপ অধিকারীদের পক্ষে জনসমুদায় থেকে আলাদা হয়ে একান্তদেশে নিরন্তর অটল সাধনা করা অধিক শ্রেয় হয়ে থাকে। এরা কর্ম ছেড়ে দেয় না, কর্মই এদের ছেড়ে দিয়ে আলাদা হয়ে যায়। এরূপ লোকের একান্তে কখনও আলস্য বা বিষয়-চিন্তন হয় না। একান্তের ফলে এদের ভগবদ্ প্রেমের ধারায় উত্তরোত্তর বন্যা আসে এবং তা অতি শীঘ্রই পরমাত্মারূপী মহাসমুদ্রে মিশিয়ে দিয়ে এদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব সমুদ্রের বিশাল অসীম অস্তিত্বে অভিন্নরূপে মিলিয়ে দেয়। কিন্তু যাদের একান্তে থাকাকালীন সাংসারিক বিক্ষেপ সন্তপ্ত করে, তাঁরা অধিক সময় পর্য্যন্ত কর্মরহিত হয়ে একান্ত বাসের অধিকারী নয়। জগতে এই ধরণের লোকই অধিক রয়েছে। অধিক সংখ্যক লোকের পক্ষে যে উপায় উপযোগী হয়ে তাকে, প্রায় তাহাই বলা হয়ে থাকে, এটাই নীতি। সেইজন্য শাস্ত্রোক্ত সাংসারিক কর্মের গতিকে ভগবানের দিকে ঘুরিয়ে দেওয়ারই বিশেষ প্রযত্ন করা উচিৎ, কর্ম-ত্যাগ নয়।

উপরে বলা হয়েছে যে, অর্জুন গৃহস্থ, ক্ষত্রিয় এবং কর্মশীল ছিলেন, কাজেই কর্মের সমন্ধে বলা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে, গীতাগ্রন্থ কেবলমাত্র গ্রহস্থ, ক্ষত্রিয় বা কেবল কর্মীদের জন্য। এতে কোন সন্দেহ নেই যে গীতারূপী দুগ্ধামৃত অর্জুনরূপী বৎসের সুদেই বিশ্ব প্রাপ্ত হতে পেরেছে, কিন্তু ইহা এত সার্বভৌম এবং সুমধুর যে, সকল দেশ, সকল জাতি, সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমের লোক ইহা অবারিতরূপে পান করে অমরত্ত্ব লাভ করতে পারে। ভগবদ্-প্রাপ্তিতে যেরূপ সকলের অধীকার রয়েছে তেমনিই সকলেই গীতারও অধিকারী। অবশ্য এর জন্য সদাচর, শ্রদ্ধা, ভক্তি ও প্রেমের আবশ্যকতা, যাদের শ্রদ্ধা নেই, যারা শুনতে চায় না, আচরণ ভ্রষ্ট, ভক্তিহীন তাঁদের মধ্যে ভগবান এর প্রচারের জন্য নিষেধ করেছেন। (গীতা ১৮।৬৭) ভগবানের আশ্রিত জন যে কেওই হোক না কেন, সবাই এই অমৃতপানের পাত্র। (গীতা ১৮।৬৮)

যদি এরূপ বলা হয় যে, গীতায় কেবল সাখ্যযোগ এবং কর্মযোগ নামক এই দুই নিষ্ঠারই বর্ণনা রয়েছে, ভক্তির তৃতীয় কোন নিষ্ঠাই নেই, তাহলে গীতাকে ভক্তিপ্রধান কি করে বলা যায় ? এর উত্তর এই যে, যদিও ভগবান ভক্তির আলাদা তৃতীয় নিষ্ঠা বলেন নি কিন্তু আগে বুঝে নেওয়া উচিৎ যে নিষ্ঠা কাকে বলে এবং উপাসনাকে বাদ দিয়ে কি যোগ এবং সাংখ্যনিষ্ঠা সম্পন্ন হতে পারে ? উপাসনারহিত কর্ম জড় হবার দরুণ কখনও মুক্তিদায়ক হতে পারে না এবং উপাসনা রহিত জ্ঞানও প্রশংসনীয় নয়। গীতায় ভক্তি, জ্ঞান এবং কর্ম দুই এর মধ্যেই ওতপ্রোত ভাবে রয়েছে। নিষ্ঠার অর্থ হচ্ছে পরমাত্মার স্বরূপে স্থিতি। পরমেশ্বরের স্বরূপে যে স্থিতি ভেদরূপে হয়ে থাকে অর্থাৎ পরমেশ্বর অংশী, আমি তার অংশ, পরমেশ্বর সেব্য আমি তাঁর সেবক, এই ভাব রেখে পরমাত্মার প্রীতির জন্য তাঁর আজ্ঞা অনুসারে ফলের আসক্তি ত্যাগ করে যে কর্ম করা হয় তাঁর নাম নিষ্কাম কর্মযোগনিষ্ঠা এবং সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মে অভেদরূপে যে স্থিতি হয় অর্থাৎ ব্রহ্মে স্থিত থেকে প্রকৃতি দ্বারা হওয়া সমগ্র কর্মকে প্রকৃতির বিস্তার এবং মায়ামাত্র মনে করে বাস্তবে এক সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কিছুই নেই, এরূপ নিশ্চয় রেখে যে অভেদ স্থিতি হয়ে থাকে তাঁকে সাখ্যনিষ্ঠা বলা

হয় । এই দুই নিষ্ঠাতেই উপাসনা ভরে রয়েছে । অতএব ভক্তিকে তৃতীয় স্বতন্ত্র নিষ্ঠা নামে বলার কোন আবশ্যকতা নেই । এতে যদি কেউ বলে যে তাহলে তো নিষ্কাম কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগ ছাড়া কেবল ভক্তিমার্গের দ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হতেই পারে না, কিন্তু এরূপ বলা ঠিক নয়, কেননা ভগবান বিভিন্ন স্থানে কেবলমাত্র ভক্তিযোগের দ্বারাও পরমাত্মার প্রাপ্তির কথা বলেছেন । প্রত্যক্ষভাবে দর্শন পাবার জন্য তো এতদূর পর্য্যন্ত বলেছেন যে অনন্য ভক্তি ছাড়া অন্য কোন উপায়ে তা হতে পারে না । (গীতা ১১/৫৪) **"ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি"** (গীতা ১৩/২৪) বলে ধ্যানযোগরূপী ভক্তিকে ভগবান আরও স্পষ্ট করে দিয়েছেন । এই ধ্যানযোগের প্রয়োগ উপর্যুক্ত দুই সাধনের সঙ্গেও করা হয় আবার আলাদা ভাবেও করা হয় । এই উপাসনা অর্থাৎ ভক্তিমার্গ খুবই সুগম এবং মহত্ত্বপূর্ণ । এতে ঈশ্বরের উপর ভরসা রাখা হয় এবং তাঁর বল (সামর্থ) প্রাপ্ত হতে থাকে । অতএব আমাদের গীতায় বলা অনুযায়ী এই নিষ্কাম বিশুদ্ধ অনন্যভক্তির আশ্রয় নিয়ে নিজের সমস্ত স্বাভাবিক কর্ম ভগবানের প্রীতির জন্য করা উচিৎ ।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

শ্রীপ্রেম-ভক্তি-প্রকাশ

পরমাত্মায় শরণাপন্ন হওয়া পুরুষের মন পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করে ঃ–

হে প্রভো ! হে বিশ্বম্ভর ! হে দীনদয়ালো ! হে কৃপাসিন্ধো ! হে অন্তর্যামিন্ ! হে পতিতপাবন ! হে সর্বশক্তিমান ! হে দীনবন্ধো ! হে নারায়ণ ! হে হরে ! দয়া করুন ! দয়া করুন ! হে অন্তর্যামিন্ ! সংসারে আপনার নাম দয়াসিন্ধু এবং সর্বশক্তিমান বলে বিখ্যাত, কাজেই দয়া করা আপনার কাজ।

হে প্রভো ! যদি আপনার নাম পতিতপাবন হয় তাহলে একবার এসে দর্শন দিন। আমি আপনাকে বারবার প্রণাম করে বিনয় করছি, হে প্রভো ! দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করুন। হে প্রভো ! আপনি ছাড়া এই সংসারে আমার আর কেউ নেই, একবার দর্শন দিন, দর্শন দিন, আর ব্যাকুল করবেন না। আপনার নাম বিশ্বম্ভর, তবে আমার আশা কেন পূরণ করছেন না। হে করুনাময়, হে দয়াসাগর, দয়া করুন। আপনি দয়ার সমুদ্র, কাজেই, যৎকিঞ্চিৎ দয়া করলে আপনার দয়ার সাগরে দয়ার কোন অভাব হবে না। আপনার কিঞ্চিৎ দয়ায় সম্পূর্ণ সংসারের উদ্ধার হতে পারে, তাহলে এক তুচ্ছ জীবের উদ্ধার করা আপনার কাছে কি বড় কথা ? হে প্রভো ! যদি আপনি আমার কর্ত্তব্যের দিকে তাকান তাহলে তো এই সংসার থেকে আমার নিস্তার পাবার কোনও উপায় নেই। কাজেই আপনি নিজের পতিতপাবন নামের দিকে তাকিয়ে এই তুচ্ছ জীবকে দর্শন দিন। আমি না কোন ভক্তি জানি, না যোগ জানি, না কোন ক্রিয়া-কর্ম জানি যে, এই কর্ত্তব্যের দ্বারা আপনার দর্শন পেতে পারি। আপনি অন্তর্যামী হয়ে যদি দয়াসিন্ধু না হতেন তাহলে আপনাকে

কেউ দয়াসিন্ধু বলতো না, যদি আপনি দয়ার সাগর হয়েও অন্তরের ব্যথাকে না জানতেন তাহলে কেউ আপনাকে অন্তর্যামী বলতো না। দুই গুণের সঙ্গে যুক্ত হয়েও যদি আপনি সামর্থবান না হতেন তাহলে কেউ আপনাকে সর্বশক্তিমান এবং সর্বসামর্থবান বলতো না। যদি আপনি কেবল ভক্তবৎসল-ই হতেন তাহলে কেউ আপনাকে পতিতপাবন বলতো না। হে প্রভো ! হে দয়াসিন্ধো ! একবার দয়া করে দর্শন দিন ॥ ১ ॥

জীবাত্মা নিজের মনকে বলে –

রে দুষ্ট মন ! কপটপূর্ণ প্রার্থনা করলে কি অন্তর্যামী ভগবান প্রসন্ন হবেন ? তিনি কি জানেন না যে তোমার এই সমস্ত প্রার্থনা নিস্কাম নয় ? এবং তোমার মধ্যে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস এবং প্রেম কিছুই নেই। যদি তোমার এরূপ বিশ্বাস হয় যে ভগবান অন্তর্যামী তাহলে প্রার্থনা কিজন্য করছ ? বিনা প্রেমে মিথ্যা প্রার্থনা করলে ভগবান তা কখনও শোনেন না আর যদি প্রেম থাকে তাহলে বলবারই বা কি প্রয়োজন ? কেননা ভগবান স্বয়ং-ই শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন –

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ (৪।১১)

যে যেভাবে ভজনা করে আমিও তার সেই ভাবেই ভজনা করে থাকি। এবং

যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ (গীতা ৯।২৯)

যারা (ভক্তগণ) আমাকে ভক্তির সঙ্গে ভজনা করেন তারা আমার মধ্যে এবং আমি তাদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রকট হই।☆

রে মন ! হরি দয়াসিন্ধু হয়েও যদি দয়া না করেন তাহলেও কোন চিন্তা নেই, আমাদের তো নিজের কর্তব্য কর্ম করে যাওয়াই উচিৎ। হরি একজন প্রেমী, তিনি প্রেমী চেনেন, প্রেমের বিষয়কে প্রেমই জানেন, সেই অন্তর্যামী ভগবান কি তোমার শুস্কপ্রেমে দর্শন দিতে পারেন ?

☆ যেমন সূক্ষ্মরূপে সব জায়গায় ব্যাপ্ত অগ্নি সাধনদ্বারা প্রকট করলেই প্রত্যক্ষ হয়, সেইরূপে সর্ব জগতে স্থিত হয়েও পরমেশ্বর ভক্তির সঙ্গে ভজনকারীর অন্তঃকরণে প্রত্যক্ষরূপে প্রকট হয়ে থাকেন।

যখন বিশুদ্ধ প্রেম এবং শ্রদ্ধা বিশ্বাসরূপী রজ্জু তৈরী হবে তখন সেই রজ্জুতে বেঁধে গিয়ে হরি নিজেই চলে আসবেন । রে মূর্খ মন ! মিথ্যা প্রার্থনায় কি করে কাজ হবে ? কেননা হরি হচ্ছেন অন্তর্যামী । রে মন ! তোমাকে নমস্কার, তোমার কাজই হচ্ছে সংসারে ঘুরপাক খাওয়া, তা তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় চলে যা । তোমার সঙ্গ করার ফলেই আমি এই অসার সংসারে অনেক দিন ঘুরে বেড়িয়েছি, হরি চরণের আশ্রয় গ্রহণ করার ফলে তোমার সকল ছলনা জানতে পেরেছি । তুমি আমার জন্য কপটভাব রেখে দীনবচনে ভগবানের নিকট প্রার্থনা করছো, কিন্তু তুমি জান না যে, হরি অন্তর্যামী । শ্রীযোগবসিষ্ঠে ঠিকই লেখা হয়েছে যে, মনের অমন না, হলে অর্থাৎ মনের নাশ না হলে ভগবৎ প্রাপ্তি হয় না । বাসনার ক্ষয় মনের নাশ এবং পরমেশ্বরের প্রাপ্তি এই তিনটি একই কালে হয়ে থাকে । সেইজন্য তোমার কাছে আমার বিনীত অনুরোধ তুমি এখানে থেকে সসম্মানে বিদায় হও, এই পক্ষী তোমার মায়ারূপী ফাঁসে আর ফাঁসবার নয়, কেননা সে এখন হরির শ্রীচরণের আশ্রয় নিয়েছে । তুমি কি নিজের দুর্দশা করিয়েই তবে এখান থেকে বিদায় নেবে ? আহা কোথায় সেই মায়া, কোথায় কাম-ক্রোধাদি শত্রুগণ ? এখন তো তোমার সম্পূর্ণ সেনার ক্ষয় শুরু হয়ে গেছে, কাজেই তোমার প্রভাব ফেলার আশাকে পরিত্যাগ করে যেখানে খুশী পলায়ন কর ॥ ২ ॥

মন আবার পরমাত্মার কাছে প্রার্থনা করে –

প্রভো ! প্রভো ! দয়া করুন, হে নাথ ! আমি আপনার শরণাপন্ন । হে শরণাগত প্রতিপালক ! এই শরণাগতের ইজ্জত রাখুন । হে প্রভো ! রক্ষা করুন, রক্ষা করুন, একটি বার এসে দর্শন দিন । আপনি ছাড়া এই সংসারে আমার আর কোন আধার নেই, অতএব আপনাকে বারংবার নমস্কার করছি, প্রণাম করছি । আর দেরী করবেন না, শীঘ্র এসে দর্শন দিন । হে প্রভো ! হে দয়াসিন্ধো ! একবার এসে এই দাসের খবর নিন । আপনি না আসার ফলে প্রাণ টিকে থাকারও কোন আধার চোখে পড়ছে না । হে প্রভো ! দয়া করুন, দয়া করুন,

আমি আপনার শরণাপন্ন, একবার আমার দিকে দয়াদৃষ্টি দিয়ে দেখুন। হে প্রভো ! হে দীনবন্ধো ! হে দীনদয়ালো ! আর ব্যাকুল করবেন না, দয়া করুন। আমার দুষ্টতার দিকে না তাকিয়ে নিজের পতিতপাবন স্বভাবের প্রকাশ করুন ॥ ৩ ॥

জীবাত্মা আবার নিজের মনকে বলে –

রে মন ! সাবধান ! সাবধান ! কি জন্য ব্যর্থ প্রলাপ বকছো ? সেই সচ্চিদানন্দঘন হরি তোমার মিথ্যা বিনয় চান না। তোমার কপটতা আর চলবে না, তুমি আমার জন্য কেন হরির কাছে কপটপূর্ণ প্রার্থনা করছ ? আমি এরকম প্রার্থনা চাই না, তোমার যেখানে ইচ্ছা হয় সেখানে চলে যাও।

যদি হরি অন্তর্যামী হন, তাহলে প্রার্থনা করার কিসের আবশ্যকতা। যদি তিনি প্রেমী হন তাহলে ডাকার কি আবশ্যকতা ? যদি তিনি বিশ্বম্ভর হন তাহলে চাইবার কি আবশ্যকতা ? তোমাকে নমস্কার, তুমি এখান থেকে বিদায় হও, বিদায় হও। ॥ ৪ ॥

জীবাত্মা নিজের বুদ্ধি ও ইন্দ্রিয়াদিকে বলে –

হে ইন্দ্রিয়গণ ! তোমাদের নমস্কার ! তোমরাও বিদায় হও ! যেখানে বাসনা থাকে সেখানেই টিকে থাকা হয়। আমি শ্রীহরির চরণ-কমলের আশ্রয় নিয়েছি, কাজেই এখন তোমাদের প্যাঁচ (কৌশলবাজী) আর চলবে না। হে বুদ্ধি ! তোমাকেও নমস্কার ! যখন তুমি সংসারে ডোবাবার জন্য আমাকে শিক্ষা দিচ্ছিলে তখন তোমার জ্ঞান কোথায় গিয়েছিল ? সেই শিক্ষা কি আর এখন কাজে লাগতে পারে ?

জীবাত্মা পরমাত্মাকে বলে –

হে প্রভো ! আপনি অন্তর্যামী, কাজেই আপনি এসে দর্শন দিন আমি তা বলছি না ; কেননা যদি আমার পূর্ণ প্রেম থাকত তাহলে কি আপনি উপেক্ষা করতে পারতেন ? বৈকুণ্ঠে কি লক্ষ্মীদেবীও আপনাকে আটকাতে পারতেন ? যদি আমার আপনার উপর পূর্ণ শ্রদ্ধা হোত তাহলে কি আপনি বিলম্ব করতে পারতেন ? সেই প্রেম এবং বিশ্বাস কি আপনি এড়াতে পারতেন ? আশ্চর্য্য ! আমি ব্যর্থই নিজেকে নিস্কামী এবং

আসক্তিহীন বলে মনে করছি এবং ব্যর্থই নিজেকে আপনার শরণাগত বলে মেনে রেখেছি। কিন্তু কোন চিন্তা নেই, আপনা-আপনি যা কিছু প্রাপ্ত হয় তাতেই আমার সন্তুষ্ট থাকা উচিৎ; কেননা গীতায় আপনি এরূপই বলেছেন।☆ সেইজন্য আপনার শ্রীচরণের প্রেম ভক্তিতে মগ্ন থেকে যদি আমার নরক প্রাপ্তিও হয় তবে তা স্বর্গের চেয়েও শ্রেয়। কাজেই এরূপ পরিপ্রেক্ষিতে আমার কিসের চিন্তা ? যখন আপনাতে আমার প্রেম জাগবে তখন কি আপনারও তা হবে না ? যখন আপনার দর্শন ছাড়া আমি টিকতে পারব না তখন কি আপনিও টিকে থাকতে পারবেন ? আপনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন –

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ (৪।১১)

"যে আমাকে যে ভাবে ভজনা করে আমিও তাঁদের সেইভাবেই ভজনা করি।" কাজেই আমি একথা বলছি না যে আপনি এসে দর্শন দিন, আর আপনারও বা কিসের পরোয়া ? কিন্তু চিন্তার কিছু নেই, আপনি যা ভাল মনে করবেন, তাতেই আমার আনন্দ মনে করা উচিৎ।

জীবাত্মা জ্ঞাননেত্রদ্বারা পরমেশ্বরের ধ্যান করতে থেকে আনন্দে বিহ্বল হয়ে বলে –

আহা ! আহা ! আনন্দ ! আনন্দ ! প্রভো ! প্রভো ! আপনি এসেছেন ? ধন্য ভাগ্য ! ধন্য ভাগ্য আমার ! আজ আমি পতিতও আপনার শ্রীচরণের দর্শনের প্রভাবে কৃতার্থ হলাম। কেন হব না, আপনি স্বয়ং শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন –

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি ।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি ॥
(৯।৩০-৩১)

★যদৃচ্ছালাভসন্তুষ্ট : (গীতা ৪/২২, সন্তুষ্ট : যেনকেনচিত (গীতা ১২/১৯)

যদি (কেউ) অতিশয় দুরাচারীও অনন্যভাবে আমার ভক্ত হয়ে আমাকে (নিরন্তর) ভজনা করে, সে সাধু মানবার যোগ্য, কেননা সে যথার্থ নিশ্চয়কারী।

সেইজন্য সে ধর্মাত্মা হয়ে যায় এবং সর্বদা স্থায়ী পরম শান্তি প্রাপ্ত হয়। হে অর্জুন, তুমি নিশ্চয়পূর্বক সত্য জান যে আমার ভক্ত নষ্ট হয় না।

জীবাত্মা পরমাত্মার আশ্চর্যময় সগুন-রূপ ধ্যানে দেখতে থেকে নিজের মনে মনে তাঁর শোভা বর্ণনা করে –

আহা ! কত সুন্দর ভগবানের শ্রীচরণযুগল, যা রাশিকৃত নীলমনীর ন্যায় দীপ্ত হয়ে অনন্ত সূর্য্যের সদৃশ্য প্রকাশিত হচ্ছে। চকচকে নখযুক্ত অতি কোমল আঙ্গুল, যাতে রত্নজড়িত সুবর্ণের নূপুর শোভায়মান হচ্ছে। যেরূপ ভগবানের চরণকমল, সেরূপই জানু, (হাটু), উরু আদি অঙ্গও রাশিকৃত নীলামণির ন্যায় পীতাম্বরের ভিতর থেকে চকমক করছে। আহা ! সুন্দর চার ভুজা কেমন শোভায়মান হচ্ছে ! উপরের দুই হস্তে শঙ্খ এবং চক্র এবং নীচের দুই হস্তে গদা এবং পদ্ম বিরাজমান (শোভায়মান) রয়েছে। চার ভূজায় কেয়ুর এবং বালা প্রভৃতি সুন্দর সুন্দর আভুষণ শোভায়মান হচ্ছে। আহা ! ভগবানের বক্ষঃস্থল কতো সুন্দর। যার মধ্যভাবে শ্রীলক্ষীর এবং ভৃগুলতার চিহ্ন বিরাজমান তথা নীলকমলের বর্ণের ন্যায় ভগবানের গ্রীবাও কতো সুন্দর, যাতে রত্নজড়িত হার এবং কৌস্তুভমনি শোভিত হচ্ছে এবং মুক্তা তথা বৈজয়ন্তি এবং সুবর্ণের বিভিন্ন ফুলের মালায় সুশোভিত। সুন্দর চিবুক, লাল ওষ্ঠ এবং ভগবানের অতি সুন্দর নাসিকা, যার অগ্রভাগ মুক্তোয় শোভিত। ভগবানের দুই নেত্র কমলপত্রের সমান বিশাল এবং নীল-কমলের পুষ্পের ন্যায় প্রস্ফুটিত। কানে রত্নজড়িত সুন্দর মকরাকৃত কুন্ডল এবং ললাটে শ্রীধারী তিলক এবং মাথায় রত্নজড়িত কিরীটি (মুকুট) শোভায়মান রয়েছে। আহা ! ভগবানের শ্রীমুখ পূর্ণিমার চন্দ্রের ন্যায় গোল গোল কত মনোহর, যার প্রকাশে মুকুটাদি সম্পূর্ণ রত্ন ভূষণাদি চকমক করছে।

আহা ! আজ আমি ধন্য, আমি ধন্য যে এরূপ স্মিত হাস্যময়ী আনন্দমূর্ত্তি শ্রীহরি ভগবানের দর্শন করতে পারছি।

এই প্রকার আনন্দে বিহ্বল হয়ে জীবাত্মা ধ্যানে নিজের সম্মুখে সওয়া হাত দূরে বার বছরের সুকুমার অবস্থা-রূপ, ভূমি থেকে সওয়া হাত উচুঁতে আকাশে বিরাজিত পরমেশ্বরকে দেখতে থেকে উনার মানসিক পূজা করে।

মানসিক পূজার বিধি

ওঁ পাদযো পাদ্যং সমর্পযামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১ ॥

এই মন্ত্র বলে শুদ্ধ জল দিয়ে শ্রীভগবানের চরণ-কমল ধুয়ে সেই জল নিজের মাথায় ধারণ করা ॥ ১ ॥

ওঁ হস্তযোরর্ঘ্যং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ২ ॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীহরি ভগবানের হস্তকমলের উপর পবিত্র জল দেওয়া ॥ ২ ॥

ওঁ আচমনীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ানায় নমঃ ॥ ৩ ॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীনারায়ণ দেবকে আচমন করান ॥ ৩ ॥

ওঁ গন্ধং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ৪ ॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীভগবানের ললাটে সুগন্ধি (কুমকুম) লাগানো ॥৪ ॥

ওঁ মুক্তফলং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ৫ ॥

এই মন্ত্র বলে ভগবাণের ললাটে মুক্তো লাগান ॥ ৫ ॥

ওঁ পুষ্পং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ৬ ॥

এই মন্ত্রবলে শ্রীভগবানের মস্তকে এবং নাসিকার সামনে আকাশে পুষ্প ছেড়ে দেওয়া ॥ ৬ ॥

ওঁ মালাং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ৭ ॥

এই মন্ত্র বলে পুষ্পের মালা শ্রীহরির গলায় পরানো ॥ ৭ ॥

ওঁ ধূপমাঘ্রায়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ৮ ॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীভগবানের সামনে অগ্নিতে ধূপ দেওয়া ॥ ৮ ॥

ওঁ দীপং দর্শয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ৯ ॥

এই মন্ত্র বলে ঘৃতের দীপক জ্বালিয়ে শ্রীবিষ্ণু ভগবানের সামনে রাখা ॥ ৯ ॥

ওঁ নৈবেদ্যং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১০ ॥

এই মন্ত্র বলে মিশ্রী দ্বারা শ্রীহরি ভগবানকে ভোগ নিবেদন করা ॥ ১০ ॥

ওঁ আচমনীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১১ ॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীভগবানকে আচমন করানো ॥ ১১ ॥

ওঁ ঋতুফলং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১২ ॥

এই মন্ত্র বলে ঋতুফল (কলা প্রভৃতি) দ্বারা শ্রীভগবানের ভোগ লাগানো ॥ ১২ ॥

ওঁ পুনরাচমণীয়ং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১৩ ॥

এই মন্ত্র বলে শ্রীভগবাকে পুনরায় আচমন করানো ॥ ১৩ ॥

ওঁ পুগীফলং সতাম্বূলং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নম ॥১৪ ॥

এই মন্ত্র বলে সুপারী সহিত নাগরপান প্রীভগবানকে অর্পণ করা ॥ ১৪ ॥

ওঁ পুনরাচমণীমং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১৫ ॥

এই মন্ত্র বলে পুনরায় শ্রীহরিকে আচমন করানো । তারপর সুবর্ণ-থালে কর্পূর প্রদীপ্ত করে শ্রীনারায়ণ দেবের আরতি করা ॥ ১৫ ॥

ওঁ পুষ্পাঞ্জলিং সমর্পয়ামি নারায়ণায় নমঃ ॥ ১৬ ॥

এই মন্ত্র বলে সুন্দর সুন্দর পুষ্প দ্বারা অঞ্জলি ভরে প্রীহরির মস্তকে পুষ্প রাখা ॥ ১৬ ॥

তারপর চারবার প্রদক্ষিণা করে শ্রীনারায়ণ দেবকে সাষ্টাঙ্গ দন্ডবৎ প্রণাম করা ॥ ৯ ॥

উক্ত প্রকারে শ্রীহরি ভগবানের মানসিক পূজা করে তাকে নিজ হৃদয় আকাশে শয়ন করিয়ে জীবাত্মা নিজের মনে মনেই শ্রীভগবানের স্বরূপ এবং গুণের বর্ণনা করতে করতে বারংবার প্রণাম করে –

শান্তাকারং ভুজগশয়ণং পদ্মনাভং সুরেশং
বিশ্বাধারং গগন সদৃশং মেঘবর্ণং শুভাঙ্গম্ ।
লক্ষীকান্তং কমলনয়নং যোগিভির্ধ্যানগম্যং
বন্দে বিষ্ণুং ভবভয়হরং সর্বলোকৈকনাথম্ ॥

যার আকৃতি অতিশয় শান্ত, যিনি শেষনাগের শয্যার উপরে শয়ন করে আছেন, যার নাভিতে কমল রয়েছে এবং দেবতাগণের যিনি ঈশ্বর এবং সম্পূর্ন জগতের আধার, যিনি আকাশের সদৃশ সর্বত্র ব্যাপ্ত, নীলমেঘের মত যার বর্ণ, যার সকল অঙ্গ অতিশয় সুন্দর, যিনি যোগিগণদ্বারা ধ্যানদ্বারা প্রাপ্ত হয়ে থাকেন, যিনি সকল লোকের স্বামী, যিনি জন্ম মরণরূপ ভয়ের বিনাশকারী, এইরূপ শ্রীলক্ষ্মীপতি কমলনেত্র ভগবাণ বিষ্ণুকে আমি প্রণাম করি।

অসংখ্য সূর্য্যের সমান যার প্রকাশ, অনন্ত চন্দ্রমার সমান যার শীতলতা, কোটি কোটি অগ্নির সমান যার তেজ, অসংখ্য মরুদ্‌গণের সমান যার পরাক্রম, অনন্ত ইন্দ্রের সমান যার ঐশ্বর্য্য, কোটি কোটি কামদেবের সমান যার সুন্দরতা, অসংখ্য পৃথিবীর সমান যার ক্ষমা, কোটি কোটি সমুদ্রের সমান যিনি গম্ভীর, কোন ভাবেই কেউ যার উপমা করতে পারে না, বেদ এবং শাস্ত্রসকলও যার স্বরূপের কেবল কল্পনামাত্র করতে পেরেছ, কেউ যার শেষ পায় নি, এরূপ অনুপমেয় শ্রীহরি ভগবানকে আমার বারংম্বার নমস্কার।

সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিষ্ণুভগবান যিনি মৃদু স্মিত হাস্য করছেন, যার সমস্ত অঙ্গের লোমকুলে স্বেদবিন্দুতে চমকিত হয়ে শোভিত হচ্ছে, এরূপ পতিতপাবন শ্রীহরি ভগবানকে আমার বারংবার নমস্কার ।। ১০ ।।

জীবাত্মা মনে মনেই শ্রীহরি ভগবানকে পাখা দ্বারা হাওয়া করতে করতে তার চরণ সেব্য করতে থেকে তাঁর স্তুতি করে।

আহা ! হে প্রভো । আপনিই ব্রহ্মা, আপনিই বিষ্ণু, আপনিই মহেশ, সূর্য্য, আপনিই চন্দ্রমা এবং নক্ষত্র, আপনিই ভূর্ভুবঃ স্বঃ তিন লোক তথা সপ্তদ্বীপ এবং চতুর্দশ ভুবন আদি যা কিছুই রয়েছে, সমস্তই আপনার-ই স্বরূপ, আপনিই বিরাট স্বরূপ, আপনিই হিরণ্যগর্ভ, আপনিই চতুর্ভূজ এবং মায়াতীত, শুদ্ধ ব্রহ্মও আপনিই অনেক রূপ ধারণ করেছেন, সেইজন্য সমস্ত সংসার আপনারই স্বরূপ তথা দ্রষ্টা, দর্শন যা কিছুই রয়েছে, সে সব কিছু আপনিই★ অতএব

★একো বিষ্ণুর্মহদ্‌ভূতং পৃথগ্যভূতান্যনেকশঃ (বিষ্ণুসহস্রনাম ১৪০) পৃথক পৃথক সম্পূর্ন ভুতসমূহের উৎপাদনকারী মহান্ ভূত এক বিষ্ণুই অণেক রূপে স্থিত রয়েছেন ।" তথা এককোহহং বহু স্যাম্ (ইতি শ্রুতিঃ) "সৃষ্টির আদিতে ভগবাণ সংকল্প করলেন যে) এক আমিই অনেক রূপে হয়ে যাই !"

নমঃ সমস্তভূতানামাদি ভূতায় ভূভৃতে ।
অনেকরূপরূপায় বিষ্ণবে প্রভবিষ্ণবে ।।

সম্পূণ প্রাণীসমূহের আদিভূত, যিনি পৃথিবীকে ধারণ করেছেন এবং যুগে যুগে যিনি আবির্ভূত হন, সেই অনন্ত রূপধারী ভগবান বিষ্ণুকে নমস্কার ।

ত্বমেব মাতা চ পিতা ত্বমেব
ত্বমেব বন্ধুশ্চ সখা ত্বমেব ।
ত্বমেব বিদ্যা দ্রবিণং ত্বমেব
ত্বমেব সর্বং মম দেবদেব ।।

আপনিই মাতা এবং আপনিই পিতা, আপনিই বন্ধু এবং আপনিই মিত্র, আপনিই বিদ্যা এবং আপনিই ধন, হে দেবগণের দেব ! আপনিই আমার সর্বস্ব ।। ১১ ।

উক্তভাবে পরমাত্মার প্রেম ভক্তিতে যুক্ত পুরুষের যখন পরমাত্মায় অতিশয় প্রেম হয়ে যায়, সেই কালে তার নিজের শরীরাদিরও কোন হূঁশ থাকে না, ভক্ত সুন্দরদাস বাবাজী প্রেম ভক্তির লক্ষন বর্ণনা করতে গিয়ে বলেছেন যে –

ইন্দর ছন্দ

प्रेम लग्यो परमेश्र्वरसों तब भुलि गयो सिगरो घरबारा ।
ज्यों उन्मत्त फिरै जित ही तित, नेह रही न शरीर सँभारा ॥
श्वास उसास उठे सब रोम, चलै दृग नीर अखण्डित धारा ।
सुन्दर कौन करै नवधा विधि, घाकि पर्‍यो रस पी मतवारा ॥

নারাচ ছন্দ

न लाज तीन लोककी, न वेदको कह्यो करै ।
न शंक भूत प्रेतकी, न देव यक्षतें डरै ॥
सुने न कान औरकी, द्रसै न और ईच्छना ।
कहै न मुख और बात, भक्ति-प्रेम लच्छना ॥

বীজুমালা ছন্দ

प्रेम अधीनो छाक्यो डोलै, क्योंकि क्योंही बाणी बोलै।
जैसे गोपी भुली, देहा तैसो चाहे जासों नेहा॥

মনহরন ছন্দ

नीर बिनु मीन दुःखी, क्षीर बिनु शिशु जैसे,
पीरकी ओषधि बिनु, कैसे रह्यो जात है।
चातक ज्यों स्वातिबुंद, चन्दकी चकोर जैसे,
चन्दनकी चाह करि, सर्प अकुलात है॥
निर्धन ज्यों धन चाहे, कामिनीको कन्त चाहे ;
ऐसी जाके चाह ताहि, कछु न सुहात है।
प्रेमकी प्रवाह ऐसो, प्रेम तहाँ नेम कैसो ;
सुन्दर कहत यह, प्रेमहीकी बात है॥

ছপ্যয় ছন্দ

कबहुँक हँसि उठि नृत्य करै, रोवन फिर लागे।
कबहुँक गद्‌गद्-क ण्ठ, शब्द निकषे नहिं आगे॥
कबहुँक हृदय उमंग, बहुत ऊँचे स्वर गावे।
कबहुँक है मुख, गगन ऐसे रहि जावे॥
चित्त-वित्त हरिसों लग्यी, सावधान कैसे रहै।
यह प्रेम लक्षणा भक्ति है, शिष्य सुनहु सुन्दर कहै॥ १२॥

সগুণ ভগবান অন্তর্দ্ধান হয়ে গেলে জীবাত্মা শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন সর্বব্যাপী পরব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপে মুগ্ধ হয়ে বলে –

আহা ! আনন্দ ! আনন্দ ! অতি আনন্দ ! সর্বত্র একমাত্র বাসুদেব-বাসুদেবই রয়েছেন । *আহা ! সর্বত্র কেবল এক আনন্দই আনন্দ পরিপূর্ণ রয়েছে ।

---

*বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেব সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ॥ (গীতা ৭।১৯)
অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত জ্ঞানী সব কিছু হচ্ছে বাসুদেবই, এইভাবে আমাকে ভজনা করে সেই মহাত্মা অতি দুর্লভ

কোথায় কাম, কোথায় ক্রোধ, কোথায় লোভ, কোথায় মোহ, কোথায় মদ, কোথায় মৎসরতা, কোথায় মান, কোথায় ক্ষোভ, কোথায় মায়া, কোথায় মন, কোথায় বুদ্ধি, কোথায় ইন্দ্রিয়সমূহ, সর্বত্র একমাত্র সচ্চিদানন্দ সচ্চিদানন্দ-ই ব্যাপ্ত।

আহা ! আহা ! সর্বত্র এক সত্যরূপ, চেতনরূপ, আনন্দরূপ, ঘনরূপ, পূর্ণরূপ, জ্ঞানস্বরূপ, কূটস্থ, অক্ষর, অব্যক্ত, অচিন্ত্য, সনাতন, পরব্রহ্ম, পরম অক্ষর, পরিপূর্ণ, অনির্দেশ্য, নিত্য, সর্বগত, অচল, ধ্রুব, অগোচর, মায়াতীত, অগ্রাহ্য, আনন্দ, পরমাণন্দ, মহানন্দ, আনন্দ-ই আনন্দ পরিপূর্ণ রয়েছে, আনন্দ ভিন্ন আর কিছুই নেই ॥ ১৩ ॥

শান্তিঃ শান্তিঃ শান্তিঃ

॥ হরিঃ ॥

ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের জন্য নামজপ হল সর্বোপরি সাধন

নামের মহিমা বাস্তবে সেই পুরুষ-ই জানতে পারে, যার মন নিরন্তর শ্রীভগবানের সংলগ্ন থাকে, নামের প্রিয় স্মৃতিতে যার ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চ এবং অশ্রুপাত হয়, যে জলের বিয়োগে মাছের ব্যাকুলতার ন্যায় ক্ষণমাত্রের জন্য নামের বিয়োগেও বিকল হয়ে ওঠে, যে মহাপুরুষ নিমেষমাত্রের জন্যও ভগবানের নামকে ছাড়তে পারে না এবং যে নিস্কামভাবে নিরন্তর প্রেমপূর্বক নাম জপ করে তাতে মগ্ন হয়ে গেছে এরূপ মহাত্মা পুরুষই এই বিষয়ের পূর্ণতয়া বর্ণনা করার অধিকারী এবং তারই লেখায় সংসারের বিশেষ লাভ হতে পারে।

যদ্যপি আমি একজন সাধারণ মানুষ, সেই অপরিমিত গুণনিধান ভগবানের নামের অবর্ণনীয় মহিমা বর্ণনা করার সামর্থ্য আমার নেই, তথাপি আমার কতিপয় বন্ধুর অনুরোধে কিছু নিবেদন করার সাহস করছি। অতএব এই লেখায় যদি কিছু ত্রুটি থেকে থাকে তাহলে তার জন্য আপনারা ক্ষমা করবেন।

মহিমার দিগদর্শন

ভগবন্নামের মহিমা অপার, সকল যুগেই এর মহিমার বিস্তার রয়েছে। শাস্ত্র এবং সাধু-মহাত্মাগণ মুক্তকণ্ঠে সকল যুগের জন্যই এর মহিমার কীর্ত্তণ করেছেন, পরন্তু কলিযুগের পক্ষে তো এর সমান মুক্তির অন্য কোনও উপায়-ই বলা হয়নি। যথা –

হরের্নাম হরের্নাম হরেনামৈব কেবলম্ ।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরণ্যথা ॥

(নারদ পুরাণ ১ /৪১/১৫)

"কলিযুগে কেবল হরিনামই হচ্ছে কল্যাণের পরম সাধন, একে বাদ দিয়ে অন্য কোন উপায়-ই নেই"।

কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্তনাৎ ॥

(ভাগবত) ২/৩/৫২)

সত্যযুগে ভগবান বিষ্ণুর ধ্যান করলে, ত্রেতায় যজ্ঞে, দ্বাপরে ভগবানের সেবা পূজা করলে যে ফল হয়, কলিযুগে কেবল হরির নাম-সংকীর্তন করলে সেই ফল প্রাপ্ত হয় ।

कलियुग केवल नाम अधारा ।
सुमिरि सुमिरि भव उतरहु पारा ॥
कलियुग सम जुग आन नहिं जौं नर कर बिस्वास ।
गाई राम गुन गन बिमल भव तर बिनहिं प्रयास ॥
राम नाम मनिदीप धरु जीह देहरी द्वारा ।
तुलसी भीतर बाहेरहुँ जौं चाहसि उजियार ॥
सकल कामना हीन जे राम भगति रस लीन ।
नाम सुप्रेम पियुष हृद तिन्हहुँ किए मन मीन ॥
सबरी गीध सुसेवकनि सुगति दीन्हि रघुनाथ ।
नाम उधारे अमित खल बेद बिदित गुन गाथ ॥
रामचन्द्र के भजन बिनु जो चह पद निर्वान ।
ग्यानवंन्त अपि सो नर पसु बिनु पुँछ बिषान ॥
बारि मथें घृत होई बरु सिकता ते बरु तेल ।
बिनु हरि भजन न भव तरिअ यह सिद्धांत अपेल ॥

नामु सप्रेम जपत अनयासा । भगत होहिं मुद मंगल बासा ।
नामु जपत प्रभु कीन्ह प्रसादु । भगत सिरोमनि भे प्रहलादु ॥
सुमिरि पवनसुत पावन नामु । अपने बस करि राखे रामु ।
अपतु अजामिलु गजु गनिकाऊ । भए मुकुत हरि नाम प्रभाउ ॥
चहुँ जुग तीनि काल तिहुँ लोका । भए नाम जापि जीव बिसोका ।
कहौ कहां लगि नाम बड़ाई । रामु न सकहिं नाम गुन गाई ॥

অর্থাৎ কলিযুগে কেবলমাত্র হরি নাম-ই অবলম্বন। এই নাম স্মরণ করে ভবসাগর পেরোনো যায়। কলিযুগের সমান অন্য কোন যুগ নেই, অবশ্য বিশ্বাস থাকা চাই। লোকে কোন প্রয়াস ছাড়াই শুধুমাত্র ভগবান রামের পবিত্র গুণের কীর্ত্তন করেই ভবসাগর (পেরিয়ে যায়) তুলসি দাস বাবাজি বলেছেন– রাম নাম রূপি স্বপ্রজ্বলিত দীপকে জিহ্বা রূপী দ্বারের উপরে রাখলে উহা ভিতরে এবং বাহিরকে প্রকাশিত করে। মৎস যেরূপ জলেই একান্তভাবে নিজেকে নিবিষ্ট করে রাখে, তদনুরূপ যার সমস্ত কামনা বিলীন হয়ে গেছে, সে নিরন্তর ভগবানের ভক্তিরূপে নিমজ্জিত হয়ে নামরূপী সুধার প্রেমমহিত পান করতে থাকে। ভগবান রাম তো শবরী, জটায়ু প্রভৃতি মুক্ত করেছেন কিন্তু রাম নামের প্রভাবে অগণিত পতিত উদ্ধার হয়েছে, বেদ প্রভৃতিতে এরূপ বর্ণিত রয়েছে।

ভগবান রামের ভজনা ছাড়া যে নির্বাণ পদ লাভের ইচ্ছা রাখে সেরূপ কথিত জ্ঞানী বাস্তবে লেজ এবং সিং বিহীন পশুর সমতূল্য।

জল মন্থন করলে ঘৃত হলেও হতে পারে, বালুকণা থেকে তেল বেরোলেও বেরোতে পারে কিন্তু হরি ভজনা ছাড়া কিছুতেই ভগবাসগর পেরোনো যাবে না, ইহা নিশ্চিত সিদ্ধান্ত। প্রেমমহিত নামের জপ করলে অনায়াসেই ভক্তের আনন্দ মঙ্গলময় ধামে বাস হয়।

নাম জপের প্রভাবেই প্রভূ প্রল্হাদ কে ভক্ত শিরোমণী করেছেন।

পবনপুত্র হনুমান পবিত্র নামের স্মরণের জোরেই ভগবান রামকে নিজের অধীনে করে রখেছেন। হরির নামের প্রভাবেই অজামিল, গজ এবং গণিকাও মুক্ত হয়েছেন।

চারি যুগে, তিন কালে তিন লোকে নাম জপের প্রভাবে জীবের শোক বিনষ্ট হয়েছে।

নামের আর কতো মাহাত্ম্য বলবো ? স্বয়ং ভগবান রামও নামের গুণ গাইতে পারবেন না!

নামের মহিমার প্রমাণের কোন শেষ নেই। আমাদের শাস্ত্র সমূহ এতে ভরে রয়েছে, কিন্তু অধিক বিস্তারের ভয়ে এখানে এইটুকু লেখা

হয়েছে । সংসারে যত মত মতান্তর রয়েছে প্রায় সবাই ঈশ্বরের নাম-মহিমাকে স্বীকার করে এবং এর কীর্ত্তন করে থাকে । তবে রুচি এবং ভাব অনুসারে অবশ্যই নামে ভিন্নতা থাকে, কিন্তু পরমাত্মার যে কোন নাম হোক না কেন, সবেতেই একই লাভ হয়ে থাকে । অতএব যার কাছে যে নাম রুচিকর মনে হয় সে যেন সেই নামেরই ধ্যানসহিত জপের অভ্যাস করে ।

আমার অনুভব

আমার কয়েকজন বন্ধু আমাকে এ বিষয়ে আমার অনুভব লেখার জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু যখন আমি ভগবানের নামে বিশেষ সংখ্যায় জপ-ই করিনি, কাজেই আমি অনুভব কি লিখব ? ভগবদ্-কৃপায় যৎকিঞ্চিৎ যা কিছু নামস্মরণ আমার দ্বারা হয়েছে, তারও মাহাত্ম্য সম্যকরূপে লেখা কঠিন ।

ছেলেবেলা থেকেই আমি নামের অভ্যাস করতে লেগে গিয়েছিলাম । যার ফলে ক্রমে ক্রমে আমার মনের বিষয়বাসনা কমে যেতে থাকে এবং পাপ থেকে সরে আসতে আমায় খুবই সাহায্য করে । কাম-ক্রোধ প্রভৃতি অবগুণ কমে যেতে থাকে, অন্তঃকরণে শান্তির বিকাশ হয় । কখনও কখনও শ্রীরামচন্দ্রের ভাল ধ্যানও হতে থাকে । সাংসারিক স্ফুরণা অনেক কমে আসে । ভোগ-সমূহ থেকে বৈরাগ্য হয়ে যায় । সেই সময় বনবাস অথবা একান্ত জায়গার পরিবেশ আমার কাছে অনুকূল প্রতীত হতে থাকে ।

এই ভাবে অভ্যাস চলাকালীন একদিন স্বপ্নে সীতা এবং লক্ষ্মণসহিত ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন লাভ হয় এবং উনার সঙ্গে কথাবার্তাও হয় । শ্রীরামচন্দ্র আমাকে বর চাইবার জন্য অনেক করে বললেন কিন্তু আমার চাইবার ইচ্ছা হয় না, শেষে খুব আগ্রহ করলেও আমি এ ছাড়া আর কিছু চাইনি যে," আমার আপনার সঙ্গে যেন কখনও বিয়োগ না হয়।" এই সবই হল নামেজপের ফল ।

নামজপের ফলে এরপর আমার আরও অধিকতর লাভ হয়, যার মহিমা বর্ণন করতে আমি অসমর্থ । হ্যাঁ, এটুকু অবশ্যই বলতে পারি যে,

নাম-জপে আমার যে লাভ হয়েছে, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার অভ্যাস বাদে অন্য কোনও সাধনার দ্বারা আমার সেই লাভ হয় নি।

যখনই সাধন পথে বড় ধরণের কোন বাধা আমার সম্মুখে উপস্থিত হত, তখনই আমি প্রেমপূর্বক ভাবসহিত নামজপ করতাম এবং তাঁর প্রভাবে আমি সেই সমস্ত বিঘ্নসমূহ থেকে রেহাই পেয়ে যেতাম। অতএব আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, সাধন পথের বিঘ্নসমূহকে নষ্ট করার পক্ষে স্বরূপ-চিন্তন সহিত প্রেমপূর্বক ভগবন্নামের জপ করার সমান অন্য কোন সাধন নেই। সাধারণ সংখ্যায় নাম জপ করার ফলেই যখন আমায় পরম শান্তি, এত অপার আনন্দ এবং এত অনুপম লাভ হয়েছে, যার বর্ণনা আমি করতে পারি না, তাহলে যে পুরুষ ভগন্নামের নিস্কামভাবে ধ্যানসহিত নিত্য-নিরন্তর জপ করে, তাঁর আনন্দের মহিমা কে বলতে পারে ?

নামজপ কেন করা উচিৎ

শ্রুতি বলছেন যে –

এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্ ।
এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ ॥

(কঠ ১/২/১৬)

"এই ওঁ অক্ষর-ই ব্রহ্ম, ইহাই পরব্রহ্ম, এই ওঁ রূপ অক্ষরকে জেনে যে মানুষ যে বস্তু চায়, সে উহাই পেয়ে থাকে।"

শ্রুতির এই কথনানুসারে কল্পবৃক্ষরূপ ভগবদ্-ভজনের প্রতাপে মানুষ যে বস্তু চায়, উহাই পেতে পারে। কিন্তু আত্মার কল্যাণকামী সত্যিকারের প্রেমী ভক্তগণকে তো নিস্কামভাবেই ভজনা করা উচিৎ। শাস্ত্রে নিস্কাম প্রেমী ভক্তির-ই অধিক প্রশংসা করা হয়েছে। ভগবান-ও বলেছেন যে –

চতুর্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জুন ।
আর্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥
তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে ।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ ॥

(গীতা ৭/১৬–১৭)

"হে ভরতবংশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ অর্জুন ! উত্তম কর্মশীল অর্থার্থী "(সাংসারিক পদার্থের জন্য যে ভজনা করে), আর্ত, জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী অর্থাৎ নিস্কামী এরূপ চার প্রকারের ভক্তগণ আমার ভজনা করে । তাদের মধ্যেও নিত্য আমাতে একীভাবে যুক্ত অনন্য প্রেমভক্তি সম্পন্ন জ্ঞানী ভক্ত অতি উত্তম, কেননা সে আমাকে তত্ত্বের সঙ্গে জানে । এরূপ জ্ঞানীর আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং সেই জ্ঞানী আমার অত্যন্ত প্রিয় ।

এরূপ নিস্কাম প্রেমপূর্বক ভাবে হওয়া ভগবদ্ ভজনার প্রভাব যে মানুষ জানে, সে এক ক্ষণের জন্যও ভগবানকে ভোলে না এবং ভগবানও তাকে ভোলান না । স্বয়ং ভগবান বলেওছেন যে –

যো মাং পশ্যচি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি ।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ॥

(গীতা ৬/৩০)

"যে পুরুষ সর্বভূতে সকলের আত্মরূপ বাসুদেব যে আমি তাকেই ব্যাপক দেখে আর সমস্ত ভূতসমুদায়কে বাসুদেবরূপ আমাতে দেখে, তাঁর কাছে আমি অদৃশ্য হই না এবং সে আমার কাছে অদৃশ্য হয় না, কেননা সে আমাতে একইভাবে স্থিত রয়েছে ।"

প্রকৃত প্রেমী কি কখনও নিজের প্রেমাস্পদকে ছেড়ে অন্যকে নিজের মনে স্থান দিতে পারে ? ভাগ্যবান যে পুরুষ পরম সুখময় পরমাত্মার প্রভাব জেনে তাকেই নিজের একমাত্র প্রেমাস্পদ বলে মেনে নেয়, তিনি তো অহর্নিশ তারই প্রিয় নামের স্মৃতিতে মগ্ন থাকেন, তিনি কখনও অন্য কেন বস্তুর ইচ্ছা করেন না এবং তা সইতেও পারেন না ।

অতএব যে পর্য্যন্ত এরূপ অবস্থা না হয়, সে পর্য্যন্ত এরূপ অভ্যাস করা উচিৎ । নামোচ্চরণ করার সময় মন প্রেমে এরূপ মগ্ন হয়ে যাওয়া উচিৎ যাতে নিজের শরীরেরও হুঁশ না থাকে । অতি ভয়ংকর সংকটে পড়লে বিশুদ্ধ প্রেমভক্তি এবং ভগবদ্ সাক্ষাৎকার ভিন্ন অন্য কোনও সাংসারিক বস্তুর কামনা, যাচনা বা ইচ্ছা কখনও করা উচিৎ নয় ।

নিস্কামভাবে প্রেমপূর্বক বিধিবদ্ যে সাধক জপ করে যায় সে অতিশীঘ্র উত্তম লাভ নিতে পারে।

যদি কেহ এরূপ সন্দেহ প্রকাশ করেন যে, অনেকেই তো ভগবন্নামের জপ করে থাকেন, কিন্তু তাদের ক্ষেত্রে তো বিশেষ কোন লাভ পরিলক্ষিত হয় না, তাহলে এর উত্তর এইরূপ হতে পারে যে, হয় তারা বিধিপূর্বক জপের অভ্যাস-ই করেন নি অথবা নিজের জপরূপী পরমধনের বদলে তুচ্ছ সাংসারিক ভোগ সমূহকে ক্রয় করে থাকবেন, অন্যথা তাদের অবশ্যই বিশেষ লাভ হতো, এতে কোন সন্দেহ নেই।

সেইজন্য নামজপ ছোট বা বড় কোনও প্রকারের কামনার জন্য না করে কেবল ভগবানের বিশুদ্ধ প্রেমের জন্যই করা উচিৎ।

নাম জপ কি ভাবে করা উচিৎ ?

মহর্ষি পাতঞ্জলি বলেছেন –

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ (যোগ ১/২৭)

"সেই পরমাত্মার বাচক অর্থাৎ (নাম হচ্ছে ওঁ কার)

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্ (যোগ ১/২৮)

"সেই পরমাত্মার নামজপ এবং অর্থের ভাবনা অর্থাৎ স্বরূপের চিন্তন করা"।

ততঃ প্রত্যক্চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ । (যোগ ১/২৯)

"উপর্যুক্ত সাধনের ফলে সম্পূর্ণ বিঘ্নের নাশ এবং পরমাত্মার প্রাপ্তিও হয়ে যায়।"

ফলে ইহা সিদ্ধ হলো যে, নামজপ নামীর স্বরূপচিন্তনের সঙ্গে করা উচিৎ। স্বরূপচিন্তনযুক্ত নামজপে অন্তরায়ের বিনাশ এবং ভগবদ্-প্রাপ্তি হয়।

যদিও নামী নামেরই অধীন। শ্রী তুলসীদাস বাবাজী বলেছেন যে

देखिअहिं रुप नाम आधीना । रुप ग्यान नहिं नाम बिहिना ॥
सुमिरिअ नाम रुप बिनु देखें । आवत हृदयँ सनेह बिसेषें ॥

"অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপ নাম বিহীন নয়, রূপ হচ্ছে নামেরই অধীন। স্বরূপের লক্ষ্য না করে নামজপ করা হলেও হৃদয়ে বিশেষ স্নেহ হয়।"

সেইজন্য স্বরূপ চিন্তনের চেষ্টা ছাড়াও কেবলমাত্র নাম জপের প্রতাপেও যথা সময়ে সাধকের ভগবদ্ স্বরূপের সাক্ষাৎকার নিজে-নিজেই হতে পারে, কিন্তু এতে বিলম্ব হয়ে যায়। ভগবানের মনোমোহন স্বরূপের চিন্তন করতে করতে জপের অভ্যাস করলে অতি শীঘ্রই লাভ হতে পারে, কেননা নিরন্তর চিন্তন হলে স্মৃতিতে অন্তরায় হতে পারে না।

সেইজন্য শ্রীভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন –

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুদ্ধ চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্ ॥ (গীতা ৮/৭)

"অতএব হে অর্জুন" তুমি নিরন্তর আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধও কর, এভাবে আমাতে মন বুদ্ধি অর্পিত তুমি নিঃসন্দেহে আমাকে প্রাপ্ত হবে"। ভগবানের এই আজ্ঞানুসারে চলতে-ফিরতে, পান-ভোজনে, জাগ্রত-ঘুমন্ত এবং প্রতিটি সাংসারিক কার্য্য করার সময় সাধকের নাম জপ করার সঙ্গে সঙ্গে মন-বুদ্ধিপূর্বক ভগবানের স্বরূপের চিন্তন এবং নিশ্চয় করে যাওয়া উচিৎ, যাতে ক্ষণমাত্রের জন্যও তাঁর স্মৃতির বিয়োগ না হয়।

যদি কেউ জিজ্ঞাসা করে যে, কোন্ নামের জপ অধিক লাভদায়ক ? এবং নামের সঙ্গে ভগবানের কোন্ স্বরূপের ধ্যান করা উচিৎ ? তাহলে এর উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, পরমাত্মার নাম-অনেক, তার মধ্যে সাধকের যে নামে অধিক রুচি এবং শ্রদ্ধা রয়েছে, তাঁর কাছে সেই নামজপে বিশেষ লাভ হয়। অতএব সাধকের নিজের রুচি অনুযায়ী যা অনুকূল মনে হয়, ভগবানের সেই নামেরই জপ এবং স্বরূপের চিন্তন করা উচিৎ। ইহা অবশ্য লক্ষণীয় যে, যে নামের জপ করা হয়, স্বরূপের চিন্তনও সেই অনুসারে হওয়া উচিৎ। উদাহরণার্থ –

"ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"। এই মন্ত্রের জপকারীকে সর্বব্যাপী বাসুদেবের ধ্যান করা উচিৎ। **ওঁ নমো নারায়ণায়** – এই

মন্ত্রের জপকারীকে চতুর্ভুজ শ্রীবিষ্ণু ভগবানের ধ্যান করা উচিৎ। **"ওঁ নমো শিবায়"** এই মন্ত্রের জপকারীকে ত্রিনেত্র ভগবান শিবের ধ্যান করা উচিৎ। কেবলমাত্র ওঁ কারের জপকারীর সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন শুদ্ধব্রহ্মের চিন্তন করা উচিৎ। শ্রীরামনামের জপকারীকে শ্রীদশরথনন্দন ভগবান শ্রীরামচন্দ্রের স্বরূপের চিন্তন করা লাভপ্রদ।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে ॥

(কলিসাং ১)

এই মন্ত্রের জপকারীর পক্ষে শ্রীরাম, কৃষ্ণ, বিষ্ণু কিংবা সর্বব্যাপী প্রভৃতি সকল রূপেরই নিজের ইচ্ছা এবং রুচি অনুযায়ী ধ্যান করা যেতে পারে, কেননা এই নাম সকল রূপের বাচক হতে পারে।

এই সমস্ত উদাহরণ দ্বারা ইহাই বোঝা উচিৎ যে, গুরু দ্বারা সাধক যে নাম-রূপের উপদেশ প্রাপ্ত হয়েছেন, যে নাম এবং যে রূপে শ্রদ্ধা, প্রেম এবং বিশ্বাসের আধিক্য হয় এবং যা নিজের আত্মার অনুকূল প্রতিত হয়, সেই নাম-রূপের জপ-ধ্যানে তাঁর অধিক লাভ হতে পারে।

পরন্তু নামজপের সঙ্গে ধ্যান অবশ্য হওয়া চাই। বাস্তবিক পক্ষে নামের সঙ্গে নামীর স্মৃতি হওয়াও অনিবার্য্য। মানুষ যে যে বস্তুর স্বরূপের নামের উচ্চারণ করে, সেই সেই বস্তুর স্বরূপের স্মৃতি তাঁর একবার অবশ্য হয়ে থাকে এবং যে রূপের স্মৃতি হয়, তদনুরূপ ভাল-মন্দ পরিণামও অবশ্য হয়ে থাকে। যেমন কোন মানুষ কাম-বশীভূত হয়ে যখন কোনও মেয়ে-মানুষের স্মরণ করে তখন তাঁর স্মৃতির সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শরীরে কাম জাগ্রত হয়ে বীর্য্যপাত প্রভৃতি দুর্ঘটনা ঘটিয়ে দেয়। এইভাবে বীর-রস এবং করুণা-রস প্রধান বৃত্তান্তের স্মৃতির ফলে মানুষের তদনুসারে বৃত্তি এবং ভাব হয়ে যায়। সাধু পুরুষকে স্মরণ করলে মনে শ্রেষ্ঠ ভাবের জাগৃতি হয় এবং দুরাচারীর স্মৃতির ফলে মন্দ ভাবের আবির্ভাব হয়। যখন লৌকিক স্মরণের এরূপ অনিবার্য পরিণাম

হয়, তখন পরমাত্মার স্মরণের ফলে পরমাত্মার ভাব এবং গুণের অন্তঃকরণে আবির্ভাব হবে, এতে সন্দেহ-ই বা কিসের ?

অতএব সাধকের ভগবানের প্রেমে বিহ্বল হয়ে নিস্কাম ভাবে নিত্য-নিরন্তর রাত-দিন কর্তব্য-কর্মে নিয়োজিত থেকেও ধ্যানসহিত শ্রীভগবানের নামের জপের বিশেষ চেষ্টা করা উচিত।

সৎ সঙ্গের দ্বারাই নাম-জপে শ্রদ্ধা জন্মায়

নামের এত মহিমা হওয়া সত্ত্বেও লোকে প্রেম এবং ধ্যানযুক্ত হয়ে নামজপে কেন প্রবৃত্ত হয় না ? এর উত্তর হচ্ছে এই যে,ভগবদ্-ভজনের আসল মর্ম, সেই মানুষ-ই জানতে পারে, যার উপরে ভগবানের পূর্ণ দয়া হয়।

যদ্যপি ভগবানের দয়া সদা সকলের উপরে সমানভাবে রয়েছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত মানুষ সেই অপার দয়া চিনতে না পারে, সে পর্য্যন্ত সেই দয়া থেকে তাঁর লাভ হয় না। যেমন, কারও বাড়িতে ধন পোঁতা রয়েছে, কিন্তু যে পর্য্যন্ত সে তা জানতে না পারে, সেই পর্য্যন্ত তাঁর কোন লাভ হয় না, কিন্তু সেই লোকই যখন কোন সন্ধানশীল ব্যাক্তির কাছ্ থেকে তা জেনে যায় এবং পরিশ্রম করে সেই ধন হস্তগত করে নেয়, তখন সে লাভবান হয়ে যায়। এই প্রকারে ঈশ্বরের দয়ায় তাঁর প্রভাব জানে এমন পুরুষের সঙ্গের ফলে ভগবানের নিত্য দয়া জানা যায়, দয়ার ফলে জ্ঞানদ্বারা ভজনার মর্ম বোঝা যায়, তার ফলে ভজনায় প্রবৃত্তি হয় এবং ভজনার নিত্য-নিরন্তর অভ্যাসে তার সমস্ত সঞ্চিত পাপ সমূলে, বিনষ্ট হয়ে যায় এবং সে পরমাত্মার প্রাপ্তিরূপ পূর্ণ লাভ পেয়ে যায়।

নামে পাপনাশের স্বাভাবিক শক্তি রয়েছে –

এখানে যদি কেউ সন্দেহ করে যে, যদি ভগবান ভজনাকারীর পাপের নাশ করে থাকেন কিংবা তাকে ক্ষমা করেন, তাহলে কি ওনাতে বিষমতার দোষ ঘটে না ? এর উত্তর হচ্ছে এই যে, যেমন অগ্নিতে জ্বালাবার এবং প্রকাশ করার শক্তি স্বাভাবিক ভাবে রয়েছে, এরূপ

ভগবানের নামেও পাপসমূহকে বিনষ্ট করার শক্তি স্বাভাবিক ভাবে রয়েছে। সেইজন্য ভগবান শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলেছেন যে –

সমোহহং সর্ব্বভূতেষু ন মে দ্বেষ্যোঽস্তি ন প্রিয়ঃ।
যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যামযি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥

(গীতা ৯/২৯)

"আমি সকল ভূতে সমানভাবে ব্যাপক রয়েছি, না কেউ আমার অপ্রিয় আর না কেউ আমার প্রিয়, পরন্তু যে ভক্তগণ আমাকে প্রেমের সঙ্গে ভজনা করেন তাঁরা আমাতে এবং আমিও তাঁদের মধ্যে প্রত্যক্ষ প্রকট হই।"

এতে ইহা স্পষ্ট যে, যেরূপ শীতে কম্পমান অনেক পুরুষগণের মধ্যে যে পুরুষ অগ্নির নিকটে গিয়ে অগ্নির তাপ গ্রহণ করে, তার শীত (ঠান্ডা) নিবারণ করে অগ্নি তার ব্যাথা দূর করে, কিন্তু যারা অগ্নির সমীপে যায় না, তাদের কষ্ট দূর হয় না। এতে অগ্নির বিষমতার কোন দোষ আসে না, কেননা সে সর্বদাই সকলকে নিজের তাপ দিয়ে তাঁদের কষ্টের নিবারণ করতে প্রস্তুত রয়েছে। যদি কেউ তাঁর কাছেই না যায় তাহলে এতে অগ্নি কি করবে ? এই প্রকার যে ব্যাক্তি ভগবানের ভজনা করে, তাঁরই অন্তঃকরণকে শুদ্ধ করে ভগবান তাঁর দুঃখের সর্বদা বিনাশ করে তাঁর কল্যাণ করে থাকেন। সেইজন্য ভগবানে বিষমতার কোন দোষ ঘটে না।

নাম-ভজনাতেই জ্ঞান হয়ে যায়

(সন্দেহ) ঃ এই কথা মেনে নেওয়া হলো যে, ভগবন্নামে পাপের বিনাশ হয়ে থাকে, কিন্তু তাঁর ফলে পরমপদের প্রাপ্তি কি ভাবে হতে পারে ? কেননা পরমপদের প্রাপ্তি তো কেবলমাত্র জ্ঞানের দ্বারাই হয়ে থাকে ?

(উত্তর) ঃ ইহা ঠিক কথা। পরমপদের প্রাপ্তি জ্ঞানের দ্বারাই হয়ে থাকে, কিন্তু শ্রদ্ধা, প্রেম এবং বিশ্বাসপূর্বক নিস্কামভাবে করা ভজনার প্রভাবে ভগবান তাকে সেই জ্ঞান প্রদান করে থাকেন যার দ্বারা তাঁর

ভগবানের স্বরূপের তত্ত্বজ্ঞান হয়ে যায় এবং তাতে সেই সাধকের অবশ্যই পরমপদের প্রাপ্তি হয়ে যায়। ভগবান বলেছেন –

"মচ্চিত্তা মদগত প্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্ ।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥
তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্ ।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে ॥
তেষামেবানুকম্পার্থমহমজ্ঞানজং তমঃ ।
নাশয়াম্যাত্মভাবস্থো জ্ঞানদীপেন ভাস্বতা ॥

(গীতা ১০/ ৯–১১)

"নিরন্তর আমাতে মন নিবেশকারী, আমাতেই প্রাণ অর্পণকারী ভক্তগণ সর্বদা আমারই ভক্তির চর্চার দ্বারা নিজেদের মধ্যে আমার প্রভাব বুঝিয়ে এবং গুণ ও প্রভাবসহিত আমার কথনা করে সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন এবং বাসুদেব আমাতেই নিরন্তর রমণ করেন, সেই সকল নিরন্তর আমার ধ্যানে লগ্ন এবং প্রেমপূর্বক ভজনাকারী ভক্তগণকে আমি তত্ত্বজ্ঞানরূপী সেই যোগ প্রদান করি, যার দ্বারা তাঁরা আমাকেই প্রাপ্ত হন। তাদের উপর অনুগ্রহ করার জন্যই তাঁদের অন্তঃকরণে একীভাবে স্থিত আমি স্বয়ং, অজ্ঞানদ্বারা উৎপন্ন অন্ধকারকে প্রকাশময় তত্ত্বজ্ঞানরূপ দীপদ্বারা নষ্ট করে থাকি।"

অতএব নিরন্তর প্রেমপূর্বক নিস্কাম নামজপ এবং স্বরূপ চিন্তনের ফলে স্বতঃ-ই জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং সেই জ্ঞানের দ্বারা সাধকের অতি সত্ত্বর পরমপদের প্রাপ্তি হয়ে যায়।

নামের উপেক্ষা করা উচিৎ নয়

কিছু ভাইগণ নামজপের মাহাত্ম্যকে না বোঝার জন্য এর নিন্দা করে বসেন, তাঁরা বলে থাকেন যে রাম, রাম করা আর টাঁয়-টাঁয় করা একই সমান। সঙ্গে সঙ্গে এও বলে থাকেন যে নামজপের শঠতায় অলস হয়ে গিয়ে নিজের জীবনকে নষ্ট করা হয়। এই ধরণের আরও অনেক রকমের কথাবার্তা বলা হয়ে থাকে।

এই সমস্ত ভাইদেব কাছে আমার এই প্রার্থনা যে,পরীক্ষা না করে এই ভাবে নামজপের নিন্দা করে সেই জপকারীগণের হৃদয়ে অশ্রদ্ধা উৎপন্ন করার মন্দ চেষ্টা করবেন না, বরঞ্চ কিছু সময়ের জন্য নামজপ করে দেখুন যে এতে কি লাভ হয় । শুধু শুধু নিন্দা কিংবা উপেক্ষা করে পাপের ভাগী হওয়া উচিৎ নয় ।

নামজপে প্রমাদ এবং আলস্য করা উচিৎ নয়

অনেক ভাইগণ নামজপ কিংবা ভজনাকে ভাল মনে করেন, পরন্তু প্রমাদ অথবা আলস্যবশে ভজনা করেন না । ইহা তাদের খুবই বড় ভূল । এই ধরণের দূর্লভ অথচ ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্যদেহ পেয়েও যারা ভজনায় আলস্য করে থাকেন তাদের সম্বন্ধে কি বলা যায় ? জীবনের সদব্যয় হচ্ছে কেবলমাত্র ভজনাতেই, যদি এখনও প্রমাদবশে এই অমূল্য সুযোগ নষ্ট করা হয় তাহলে এরপরে অনুশোচনা ভিন্ন আর কিছুই হতে পাবে না । সন্ত কবীর বলেছেন –

मरोगे मरि जाओगे, कोई न लेगा नाम ।
ऊजड जाय बसाओगे, छाड़ि बसन्ता गाम ॥
आजकालकी पाँच दिन, जंगल होगा बास ।
ऊपर ऊपर हल फिरै, ढोर चरेंगे घास ॥
आज कहे मै काल भजुँ, काल कहे फिर काल ।
आजकालके करत ही, औसर जासी चाल ॥
काल भजन्ता आज भज, आज भजन्ता अब ।
पलमे परलय होयगी, फेर भजेगा कब ॥

অর্থাৎ "একদিন এমনি করেই মরে যাবে, কেও তোমার নাম-ই নেবে না । এই সমস্ত ঘর বাড়ী ছেড়ে কোথায় কোন জনবিহীন স্থানে গিয়ে পড়বে ঠিক নেই । এই স্বল্প জীবনের অবশান হলে হয়ত জঙ্গলের ঘাস হয়ে জন্মাতে হতে পারে । জমিতে লাঙ্গল পড়বে এবং বনের পশু সেই ঘাস ভক্ষণ করবে । আজকে ভাবছো যে ভজনা কালকে করবো,

কালকে বলবে আজ থাক, কালকে করবো। এভাবে আজ-কাল, আজ-কাল করেই তোমার সময় চলে যাবে। কালকের ভরসা না করে আজই ভজনা প্রারম্ভ কর, শুধু আজ নয়, এখনই লেগে পড়। এক পলকেই যদি প্রলয় হয়ে যায়, তাহলে আর পরে কখন ভজনা করবে ?"

অতএব আলস্য এবং প্রমাদ পরিত্যাগ করে যে কোন ভাবেই হোক না কেন, উঠতে-বসতে, ঘুমোবার সময় এবং সম্পূর্ণ কর্ত্তব্য কর্ম করার সময়েও সদা-সর্বদা ভজনা করার অভ্যাস অবশ্যই করা উচিৎ।

"মা" ছেলেদের ভুলিয়ে রাখার জন্য তাদের সামনে নানা ধরণের খেলনা রেখে দেয়, কিছু খাবার পদার্থ তাদের হাতে দিয়ে দেয়। যে বাচ্চা সেই পদার্থে ভুলে গিয়ে "মা"র জন্য কান্না বন্ধ করে দেয়, "মা"ও তাদের ছেড়ে দিয়ে নিজের অন্য কাজে লেগে পড়ে, কিন্তু যে ছেলে কোন কিছুর প্রলোভনেও না পড়ে শুধু "মা মা" বলে ডেকে যায়, তাকে "মা" অতি অবশ্যই নিজের কোলে নিতে বাধ্য হয়, এরূপ জেদী ছেলের কাছে ঘরের সমস্ত জরুরী কাজ ফেলেও মাকে অতি শীঘ্র ছুটে আসতে হয় এবং তাকে বুকে তুলে নিয়ে আদর করতে হয়, কেননা মা ইহা জানেন যে এই ছেলে আমাকে ছাড়া আর অন্য কোন বিষয়ের বিনিময়ে-ই আমাকে ভোলে না।

এই প্রকারে ভগবানও ভক্তের পরীক্ষার জন্য তাঁর ইচ্ছা অনুযায়ী অনেক প্রকারের বিষয়ের প্রলোভন দিয়ে ভুলিয়ে রাখতে চান। যে এতে ভুলে যায়, সে তো এই পরীক্ষায় অনুত্তীর্ণ হয়ে যায়, পরন্তু ভাগ্যবান যে ভক্ত সংসারের সমস্ত পদার্থকে তুচ্ছ, ক্ষণিক এবং বিনাশশীল মনে করে তাতে পদাঘাত করে দেয় এবং প্রেমে মগ্ন হয়ে সত্যি সত্যি ভিতর মন থেকে সেই সচ্চিদানন্দময়ী মার সাক্ষাৎ পাবার জন্য অবিরামভাবে কেঁদে যায়, এরূপ ভক্তের জন্য সম্পূর্ণ কাজ ছেড়েও স্বয়ং ভগবানকে শীঘ্রই আসতে হয়। মহাত্মা কবীর বলেছেন যে –

> केशव केशव कूकिये, न कूकिये असार।
> रात दिवसके कूकते, कभी ले सुने पुकार॥
> राम नाम रटते रहो, जबलग घटमें प्रान।
> कबहुँ तो दीनदयालके, भनक परेगी कान॥

"অর্থাৎ দিনরাত কেশব, কেশব বলে ডেকে যাও । এভাবে দিনরাত ডেকে গেলে, তিনি কখনও তো অবশ্যই শুনবেন ! যে পর্যন্ত ঘটে প্রাণ রয়েছে রাম-নামের জপ করে যাও । এভাবে কখনও না কখনও তাঁর কাছে তোমার কথা অবশ্যই পৌঁছাবে ।"

সেইজন্য সাংসারিক সমস্ত বিষয়কে বিষ মাখানো মিষ্টান্ন মনে করে তা থেকে মন সরিয়ে নিয়ে শ্রীপরমাত্মার পবিত্র নামের জপে লেগে যাওয়া পরম কর্তব্য । যে পরমাত্মার নামের জপ করে যায় দয়ালু পরমাত্মা তাকে শীঘ্রই ভবসাগরের বন্ধন থেকে মুক্ত করে দেন ।

যদি একথা বলা হয় যে, ঈশ্বর তো ন্যায়কারী, যারা ভজনা করেন শুধু তাঁদের-ই পাপের বিনাশ করে তাদের পরমগতি প্রদান করেন, তাহলে তাঁকে দয়ালু কেন বলা উচিৎ ?

এই কথন যুক্তিযুক্ত নয় । সংসারে বড়-বড় রাজা মহারাজাগণ নিজের স্তাবকদের বাহ্যিক অর্থ প্রভৃতি পদার্থ দিয়ে সন্তুষ্ট করে থাকেন, পরন্তু ভগবান এরূপ করেন না, তাঁর তো এরূপই নিয়ম যে, যে যে ভাব নিয়ে তাঁর ভজনা করে থাকে, তিনিও সেই ভাবেই তাঁর ভজনা করেন ।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

(গীতা ৪/১১)

পরমাত্মা ছোট বড়র কোন খেয়াল করেন না । এক অতি ছোটর চেয়েও ছোট ব্যক্তি পরমাত্মাকে যে ভাবে ভজনা করে, তাঁর সঙ্গে যেরূপ আচরণ করে, তিনিও তাঁর সে ভাবেই ভজনা করেন, সেরূপই ব্যবহার করেন । যদি কেউ তার জন্য কেঁদে ব্যাকুল হয়ে উঠে, তাহলে তিনিও তাঁর সঙ্গে দেখা করার জন্য সেইভাবেই আকুলিত হয়ে ওঠেন । এটা তাঁর কত বড় দয়া !

অতএব এই অনিত্য, ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল সংসারের সমস্ত মিথ্যা ভোগসমূহকে পরিত্যাগ করে সেই সর্বশক্তিমান ন্যায়কারী শুদ্ধ পরম দয়ালু প্রকৃত প্রেমী পরমাত্মার পবিত্র নামের নিস্কাম প্রেম রেখে ধ্যানসহিত সদা-সর্বদা জপ করে যাওয়া উচিৎ ।

সংসারের সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে ঈশ্বর-সাক্ষাৎকারের জন্য নামজপ-ই হচ্ছে সর্বোপরি যুক্তিযুক্ত সাধন ।

★★★

॥ শ্রী হরিঃ ॥

ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন হতে পারে

অনেকেই মনে সন্দেহ করে এরূপ প্রশ্ন করে থাকেন যে, যেভাবে দুই ঘনিষ্ঠ বন্ধু আপসে মিলিত হন, বর্তমানে কি সেই ভাবে ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন করা যায় ? যদি সম্ভব হয়, তাহলে সেই উপায় কোনটি, যার দ্বারা আমার সেই মধুর মনোহর মূর্ত্তির শীঘ্রই দর্শন করতে পারি ? এর সঙ্গে ইহাও জানতে চাই যে, বর্ত্তমান সময়ে এমন কোনও পুরুষ কি জগতে রয়েছেন, যিনি উপর্যুক্তভাবে ভগবান লাভ করেছেন ?

প্রকৃতপক্ষে এই তিন প্রশ্নের উত্তর সেই মহান্ পুরুষ-ই দিতে পারেন, যার ভগবানের সেই মনোমোহিণী মূর্ত্তির সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়েছে।

যদ্যপি আমি একজন সাধারণ ব্যক্তি, তবুও পরমাত্মা এবং মহান্ পুরুষদের দয়ায় কেবল মাত্র নিজের মনোবিনোদার্থে এই তিন প্রশ্ন সম্বন্ধে ক্রমশঃ কিছু লেখার সাহস করছি।

(১) সত্যযুগাদিতে যেমন ধ্রুব, প্রহ্লাদাদিকে সাক্ষাৎ দর্শন হবার প্রমাণ পাওয়া যায়, সেরূপ কলিযুগেও সূরদাস, তুলসীদাস আদি অনেক ভক্তদের প্রত্যক্ষ দর্শন হবার কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। বিষ্ণুপুরাণ আদি গ্রন্থে তো সত্যযুগাদির চেয়ে কলিযুগে ভগবদ্-দর্শন হওয়া যথেষ্ট সুগম বলা হয়েছে। শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হয়েছে যে –

"কৃতে যদ্ ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।৫২)

"সত্যযুগে নিরন্তর বিষ্ণুর ধ্যান করলে, ত্রেতায় যজ্ঞদ্বারা যজন-পুজন করলে এবং দ্বাপরে পূজা (উপাসনা) করলে যে পরম গতির প্রাপ্তি

হয়, সেই পরমগতি কলিযুগে কেবলমাত্র নাম সংকীর্ত্তন দ্বারা লাভ হয়।"

অরণী (এক ধরণের কাষ্ঠ বিশেষ) কাঠে রগড় দিলে যেরূপ অগ্নি প্রকট হয়, সেরূপ সত্যিকারের হৃদয় থেকে প্রেম-পরিপূরিত ডাকের রগড়ে অর্থাৎ সেই ভগবানের প্রেমময় নামোচ্চারনের গম্ভীর ধ্বনির প্রভাবে ভগবানও প্রকট হন। মহর্ষি পাতঞ্জলিও তার যোগ-দর্শনে বলেছেন যে –

"স্বাধ্যায়াদিষ্ট দেবতাসং প্রয়োগ"

"অর্থাৎ নামোচ্চারন দ্বারা ইষ্টদেব পরমেশ্বরের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়"।

যেরূপ সত্য-সংকল্প যোগী যে বস্তুর জন্য সংকল্প করে, সেই বস্তু প্রত্যক্ষভাবে প্রকট হয়ে যায়,সেরূপ শুদ্ধ অন্তঃকরণ যুক্ত ভগবানের সত্যিকারের অনন্য প্রেমী ভক্ত যে সময়ে ভগবানের প্রেমে মগ্ন হয়ে ভগবানের যে প্রেমময়ী মূর্ত্তির দর্শন করার ইচ্ছা করে, ভগবান তৎক্ষণাৎ সেই রূপে প্রকট হয়ে যান। গীতা ১১ অধ্যায়ের ৫৪ নং শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে –

"ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোহর্জ্জুন।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুং চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুং চ পরন্তপ॥

"হে শ্রেষ্ঠ তপোবিশিষ্ট অর্জুন, অনন্য ভক্তি দ্বারা তো এরূপ চতুর্ভূজ রূপবিশিষ্ট আমি প্রত্যক্ষ হয়ে তত্ত্বর সঙ্গে জ্ঞাত হতে এবং প্রবিষ্ট হতে অর্থাৎ একীভাবে প্রাপ্ত হয়ে থাকি।"

একজন প্রেমী মানুষের যদি আপন অন্য কোন প্রেমীর সঙ্গে দেখা করার প্রবল ইচ্ছা জাগে এবং এই ইচ্ছার কথা যদি সেই অন্য প্রেমী জানতে পারে, তাহলে সে স্বয়ং দেখা না করে থাকতে পারে না ; তাহলে ইহা কিভাবে সম্ভব যে যার সমান প্রেমের রহস্য কেউ জানে না, সেই প্রেমমূর্ত্তী পরমেশ্বর নিজের প্রেমী ভক্তের সঙ্গে দেখা না করে থাকতে পারেন ?

অতএব ইহা প্রমাণিত হলো যে, সেই প্রেমমূর্ত্তী পরমেশ্বর সব কাল তথা সব দেশে সকল মানুষকে ভক্তিবশে অবশ্য-ই প্রত্যক্ষ দর্শন দিয়ে থাকেন।

(২) ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন পাবার অনেক উপায়ের মধ্যে সর্বোত্তম উপায় হল "সত্যিকারের প্রেম"। শাস্ত্রকারগণ একেই অব্যভিচারিণী ভক্তি, ভগবানে অনুরক্তি, প্রেমা ভক্তি, বিশুদ্ধ ভক্তি আদি নামে অভিহিত করেছেন।

যখন সৎসঙ্গ, ভজন, চিন্তন, নির্মলতা, বৈরাগ্য, উপরতি, ইচ্ছা এবং পরমেশ্বর বিষয়ক ব্যকুলতা ক্রমে ক্রমে হতে থাকে, তখন ভগবানে সত্যিকারের বিশুদ্ধ প্রেম উৎপন্ন হয়।

দুঃখের কথা এই যে, অনেক ভাইদের তো ভগবানের অস্তিত্তেই বিশ্বাস নেই। কিছু ভাইদের যদি বিশ্বাসও থাকে, কিন্তু তাঁরা ক্ষণভঙ্গুর বিনাশশীল বিষয় সমূহের মিথ্যা সুখে লিপ্ত থাকার জন্য সেই পরমপ্রিয় ঠাকুরের সাক্ষাৎকারের প্রভাব এবং মহত্ত্বকে জানে না। যদি কেহ অল্প-স্বল্প শুনে তথা কিছু বিশ্বাস করে তাঁর প্রভাবের কিছু জেনেও নেয়, তাহলে অল্প চেষ্টায় সন্তুষ্ট হয়ে পড়ে। দ্রব্য (অর্থ আদি) উপার্জনের সমান পরিশ্রমও করে না।

অনেক ভাইগণ বলে থাকেন যে, আমরা অনেক চেষ্টা করছি কিন্তু সেই প্রাণপ্রিয় পরমেশ্বরের দর্শনলাভ তো হলো না! যদি তাদের জিজ্ঞাসা করা হয় যে, তোমরা কি কখনও ফাঁসীর মামলা থেকে রেহাই পাবার ন্যায়ও কি কখনও সংসারের জন্ম-মরণ রূপী ফাঁস থেকে বেরোবার জন্য, ঘৃণাস্পদ এবং নিন্দনীয় স্ত্রীলোকের প্রেমে বশীভূত হয়ে তাঁর সঙ্গ পাবার চেষ্টার মতও কি ভগবানের দেখা পাবার জন্য চেষ্টা করেছো? যদি না করে থাকো তাহলে "ভগবান কে পাওয়া যায় না", এরূপ বলা সর্বথা ব্যর্থ।

যে ব্যক্তি শরশয্যায় শায়িত পিতামহ ভীষ্মের সদৃশ ভগবানের ধ্যানে মত্ত থাকেন, ভগবানও তার ধ্যানে সেরূপ মগ্ন থাকেন। গীতার ৪র্থ অধ্যায়ের ১১ নং শ্লোকে শ্রী ভগবান বলেছেন যে ----

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ।

অর্থাৎ হে অর্জুন, যারা আমাকে যে ভাবে ভজনা করে আমিও তাদের সেভাবে ভজনা করে থাকি।

ভগবানের নিরন্তর নামোচ্চারনের প্রভাবে যখন ক্ষণে-ক্ষণে রোমাঞ্চ হতে থাকে, তখন তাঁর সম্পূর্ণ পাপ বিনষ্ট হয়ে এক ভগবান ভিন্ন অন্য কোন বস্তু ভাল লাগে না, বিরহ বেদনায় অত্যন্ত ব্যাকুল হওয়ার ফলে নেত্রযুগল থেকে অশ্রুধারা বহিতে থাকে এবং যখন সে ত্রৈলোক্যের ঐশ্বর্য্যকে পদাঘাত করে গোপীগণের ন্যায় পাগলের মতো বিচরন করতে থাকে এবং জল থেকে তুলে আনা মাছের মতন ভগবানের জন্য ছটপট করতে থাকে, সেই ক্ষণে আনন্দময় প্রেমী শ্যামসুন্দরের মোহিণী মূর্ত্তির দর্শনলাভ হয় । এটাই হচ্ছে সেই পরমপিতার সাক্ষাৎ লাভের প্রকৃত উপায়।

যদি কাহারও ভগবানের সাক্ষাৎলাভের সত্যিকারের ইচ্ছা থাকে তাহলে তার উচিৎ সে যেন রুক্মিণী, সীতা কিংবা ব্রজবালাদের ন্যায় সত্যিকারের প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ভগবানের কাছে সাক্ষাৎ দেবার জন্য বিলাপ করে।

(৩) যদিও প্রকটরূপে এরূপ পুরুষ কলিকালে নজরে পড়ছে না যাদের উপর্যক্ত ভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শনলাভে হয়েছে ; তথাপি সর্বথা হয় নি, এটাও সম্ভব নয় ; কেননা প্রহ্লাদ আদির ন্যায় হাজারের মধ্যে কোনও বিশেষ কারণে কোনও একজনের লোক প্রসিদ্ধি হয়ে থাকে ; বস্তুত এরূপ লোকেরা নিজের নাম প্রচারের কোন প্রয়োজন মনে করেন না অর্থাৎ তাঁরা প্রচারবিমুখ হন।

যদি বলা হয় যে, সংসার-হিতের জন্য সকলকে ইহা জানানো উচিৎ, কিন্তু বাস্তবে এরূপ শ্রদ্ধাবান শ্রোতা পাওয়াই কঠিন ; এবং পাত্র না হলে বিশ্বাস হওয়া-ও কঠিন । যদি পাত্র ছাড়াই বলে দেওয়া হয় তাহলে এর কোন মূল্যই থাকে না এবং কেউ বিশ্বাস-ও করে না।

অতএব আমাদের বিশ্বাস করা উচিৎ যে এরূপ পুরুষ সংসারে অবশ্যই রয়েছেন, যাদের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ হয়েছে। কিন্তু তাদের দেখা না পাবার মূল কারণ হচ্ছে আমাদের অশ্রদ্ধা এবং বিশ্বাস না করার চেয়ে বিশ্বাস করাই সকলের পক্ষে লাভদায়ক ; কেননা ভগবানে সত্যিকারের প্রেমের জন্য তথা দুই বন্ধুর মতো ভগবানের মনোমোহিণী মূর্ত্তির প্রত্যক্ষ দর্শণ লাভে বিশ্বাস-ই হচ্ছে মূল কারণ।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

প্রত্যক্ষ ভগবদ্-দর্শনের উপায়

আনন্দময় ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শনের সর্বোত্তম উপায় হচ্ছে "সত্যিকারের প্রেম" । সেই প্রেমের স্বরূপ কি এবং প্রেমে ভগবান কিভাবে প্রকট হয়ে প্রত্যক্ষ দর্শন দিতে পারেন, এই বিষয়ে কিছু নিবেদন করা হচ্ছে ।

অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হওয়া সত্ত্বেও ধ্রুবের ন্যায় ভগবানের ধ্যানে অচল থাকলে ভগবান প্রত্যক্ষভাবে দর্শন দিতে পারেন ।

ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় ঠাকুরের নামে আনন্দপূর্বক সমস্ত প্রকারের কষ্ট সইবার জন্য এবং তীক্ষ্ণ তরোয়ালের ধারে মস্তক কাটাইতে সর্বদা প্রস্তুত থাকিলে ভগবান প্রত্যক্ষ দর্শন দিতে পারেন ।

লক্ষণের ন্যায় কামিনী কাঞ্চনের ত্যাগ করে ভগবানের জন্য বনে গমন করলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ পাবেন ।

ঋষিকুমার সুতীক্ষ্ণের ন্যায় প্রেমোম্মত্ত হয়ে বিচরণ করলে ভগবান কে পেতে পারেন ।

ভগবান শ্রীরামের শুভাগমনের সংবাদে সুতীক্ষ্ণের কি বিহ্বল অবস্থা হয়েছিল, তাহার বর্ণনা শ্রীতুলসীদাসবাবাজী অতি প্রভাবশালী শব্দে বর্ণনা করেছেন । ভগবান শিব উমাকে (পার্বতীকে) বলছেন –

होइहैं सुफल आजु मम लोचन । देखि बदन पंकज भव मोचन ॥
निर्भर प्रेम मगन मुनी ग्यानी । कहि न जाइ सो दसा भवानि ॥
दिसि अरू बिदिसि पंथ नहिं सुझा । को मैं चलेउँ कहाँ नहिं बुझा ॥
कबहुँक फिरि पाछें पुनि जाई । कबहुँक नृत्य करई गुन गाई ॥
अबिरल प्रेम भगति मुनि पाई । प्रभु देखै तरु ओट लुकाई ॥

অতিসয় প্রীতি দেখি রঘুবীরা। প্রগটে হৃদয়ঁ হরন ভব ভীরা॥
মুনি মগ মাঝ অচল হোই বৈসা। পুলক সরীর পনস ফল জৈসা॥
তব রঘুনাথ নিকট চলি আএ। দেখি দসা নিজ জন মন ভাএ॥

রাম সুসাইব সংত প্রিয় সেবক দুখ দারিদ দবন।
মুনি সন প্রভু কহ আই উঠু উঠু দ্বিজ মম প্রান সম॥

অর্থাৎ সংসার-বন্ধন মোচনকারী প্রভুর শ্রীমুখের দর্শন লাভ করে আমার নেত্র সফল হবে। (শ্রীমহাদেব বলছেন যে) হে উমা, জ্ঞানবান মুনি প্রেমে নিমজ্জিত রয়েছেন, তাঁর সেই অবস্থার বর্ণনা হয় না। দিক্-বিদিক্ বা পথ ঘাঁট কোন কিছুর প্রতিই তাঁর ভ্রূক্ষেপ নেই। আমি কে এবং কোথায় যাচ্ছি তাও অজানা (অর্থাৎ এরও জ্ঞান নেই)। তিনি কখনও পিছনে ফিরে এগোতে থাকেন আবার কখনও (প্রভুর) গুণগান করতে করতে নাচতে থাকেন। মুনি প্রগাঢ় প্রেমাভক্তি লাভ করেছেন। প্রভু শ্রীরামচন্দ্র বৃক্ষের আড়াল থেকে লুকিয়ে (ভক্তের প্রমোন্মত্ত অবস্থার) অবলোকন করছেন। মুনির অতিশয় প্রেম অবলোকন করে আবাগমনের ভয় বিদুরকারী রঘুবীর মুনির হৃদয়ে প্রকটিত হন। (হৃদয়ে প্রভুর দর্শন পেয়ে) মুনি পথমধ্যে অচলভাবে স্থির হয়ে বসে পড়লেন। তাঁর শরীর রোমাঞ্চে কাঁঠাল ফলের ন্যায় কন্টকিত হয়ে উঠল। শ্রীরঘুবীর তখন তাঁর নিকটে এলেন এবং ভক্তের প্রেমদশা দেখে মনে মনে অতি প্রসন্ন হলেন। সন্তজনের অতিশয় প্রিয় শ্রীরঘুবীর সেবকের সকল দুঃখ মোচন করেন; তিনি মুনির নিকটে গিয়ে বললেন হে প্রাণপ্রিয় দ্বিজবর! এবারে ওঠ।

ভক্তপ্রবর শ্রীহনুমানের ন্যায় প্রেমে বিহ্বল হয়ে অতি শ্রদ্ধা সহকারে ভগবানের শরণ গ্রহণ করলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ পেতে পারেন।

ভরতকুমারের ন্যায় রাম-দর্শনের জন্য প্রেমে বিহ্বল হলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ পেতে পারেন। চতুর্দশ বছরের সময় অতিক্রান্ত হবার কালে প্রেমমূর্ত্তী শ্রীভরতের কিরূপ বিলক্ষণ অবস্থা হয়েছিল শ্রীতুলসীদাসবাবাজী এর অতি সুন্দর বর্ণনা করেছেন।

रहेउ एक दिन अवधि अधारा। समुझत मन दुख भयउ अपारा ॥
कारन कवन नाथ नहिं आयउ ।जानि कुटिल किधौं मोहि बिसरायउ ॥
अहह धन्य लछिमन बड़भागी। राम पदारबिंदु अनुरागी ॥
कपटी कुटिल मोहि प्रभु चीन्हा। ताते नाथ संग नहिं लीन्हा ॥
जौं करनी समुझै प्रभु मोरी। नहिं निस्तार कलप सत कोरी ॥
जन अवगुन प्रभु मान न काऊ। दीन बंधु अति मृदुल सुभाऊ ॥
मोरे जियँ भरोस दृढ़ सोई। मिलिहहिं राम सगुन सुभ होई ॥
बीतें अवधि रहहिं जौं प्राना। अधम कवन जग मोहि समाना ॥
राम बिरह सागर महँ भरत मगन मन होत।
बिप्र रूप धरि पवनसुत आइ गयउ जनु पोत ॥
बैठे देखि कुसासन जटा मुकुट कृस गात।
राम राम रघुपति जपत स्रवत नयन जलजात ॥

শ্রীহনুমানের সঙ্গে বার্তালাপ হবার পর ভগবান শ্রীরামের সঙ্গে ভরত-মিলনের এরূপ বর্ণনা করা হয়েছে। শিবঠাকুর দেবী পার্বতীকে বলছেন –

राजीव लोचन स्रवत जल तन ललित पुलकावलि बनी।
अति प्रेम हृदय लगाई अनुजहि मिले प्रभु त्रिभुअन धनि ॥
प्रभु मिलत अनुजहि सोह मो पहिं जाति नहिं उपमा कहि।
जनु प्रेम अरु सिंगार तनु धरि मिले बर सुषमा लही ॥
बूझत कृपानिधि कुसल भरतहि बचन बेगि न आवई।
सुनु सिवा सो सुख बचन मन ते भिन्न जान जो पावई ॥
अब कुसल कौसलनाथ आरत जानि जन दरसन दियो।
बूडत बिरह बारीस कृपानिधान मोहि कर गहि लियो ॥

অর্থাৎ কমল সদৃশ নয়ন থেকে জলধারা বইছে। রোমাঞ্চিত সুন্দর দেহ অতিশয় শোভায়মান হচ্ছে। ত্রিভূবন পতি শ্রীরঘুবীর অনুজ ভ্রাতা ভরতকে অতিশয় স্নেহে হৃদয়ে জড়িয়ে ধরলেন। অনুজ ভরতের

সঙ্গে আলিঙ্গন-কালে প্রভূর যা সৌহার্দ তাঁর বর্ণনা করতে আমি অক্ষম। যেন প্রেম শ্রীযুক্তশরীর ধারণ করে আলিঙ্গণ করছে এবং অপূর্ব লাবণ্য বিকিরণ করছে। কৃপাময় শ্রীরামচন্দ্র ভরতের কুশল জানতে চাইছেন, কিন্তু আনন্দবশে ভরতের মুখ থেকে কোন শব্দ উচ্চারণ হচ্ছে না। (শ্রীমহাদেব বলছেন) হে পার্বতী, ভরত সেই সময় যে সুখ অনুভব করছেন তা মন এবং বাণীর অতীত, যে তা লাভ করে সেই জানে। (ভরত বললেন) হে কোসলপতি-আর্ত মনে করে আপনি এই দাসকে দর্শন দেওয়ায় এখন সব কুশল মঙ্গল। বিরহসমুদ্রে নিমজ্জনশীল আমাকে কৃপাময় প্রভূ হাত ধরে রক্ষা করেছেন।

মান প্রতিষ্টা ত্যাগ করে শ্রীঅক্রূরের ন্যায় ভগবানের চরণকমল চিহ্নিত ধূলী কণায় গড়াগড়ী গেলে ভগবানকে প্রত্যক্ষ ভাবে পেতে পারেন।

পদানি তস্যাখিললোক পালাকিরীটযুষ্টামলপাদরেণোঃ।
দদর্শগোষ্ঠে ক্ষিতিকৌতুকানি বিলক্ষিতান্যব্জযবাঙ্কুশাদৈব্যঃ॥
তদ্দর্শনাহ্লাদবিবৃদ্ধ সম্ভ্রমঃ প্রেম্ন্যোর্ধ্যরোমাশ্রুকলাকুলেক্ষন।
রথাদবস্কন্দ্ধ স তেস্ঠচেষ্টত প্রভোরমূণ্যঙ্ঘ্রিরযাংস্যহো ইতি॥
দেহংভৃতামিযানর্থো হিত্ব দম্ভং ভিয়ং শুচম্।
মন্দেশাদ্যো হরের্লৈঙ্গদর্শনশ্রবণাদিভিঃ॥ (শ্রীমদ্ভাগবত ১০।৩৮।২৫-২৭)

যার চরণের পবিত্র পাবন রজ (ধুলীকণা) সম্পূর্ণ লোকপাল-গণ আদরপূর্বক নিজের মস্তকে ধারণ করে থাকেন, এরূপ, পৃথ্বিবীর আভূষণরূপ পদ্ম, যব, অঙ্কুশাদি অপূর্ব রেখায় অঙ্কিত শ্রীকৃষ্ণের গোকুল প্রবেশের চরণচিহ্ন অক্রূর দেখলেন।

দেখামাত্র আহ্লাদে উনার ব্যাকুলতার বৃদ্ধি হল, প্রেমে শরীর রোমাঞ্চিত হল, নেত্র থেকে অশ্রুপাত হতে থাকল। আহা! ইহাই প্রভূর শ্রীচরণের ধুলী ১১ এরূপ বলতে বলতে রথ থেকে নেমে শ্রীঅক্রূর সেখানে গড়াগড়ী খেতে লাগলেন।

দেহধারীদের ইহাই একটি প্রয়োজন যে, গুরুর উপদেশানুসারে নির্দম্ভ, নির্ভয় এবং বিগতশোক হয়ে ভগবানের মনোমোহিনী মূর্ত্তির দর্শন এবং তার গুণসমূহের শ্রবণ করে অক্রূরের ন্যায় ভগবানের ভক্তি করেন।

গোপীগণের প্রেম দেখে জ্ঞান এবং যোগের অভিমান পরিত্যাগ করে উদ্ধবের ন্যায় প্রেমে বিহ্বল হলে ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন পেতে পারেন।

শ্রীকৃষ্ণ-মিলনের জন্য পলক মাত্র বিলম্বকে প্রলয়ের মত মনে করে রুক্মিনীর সদৃশ অন্তর থেকে বিলাপ করা হলে ভগবান প্রত্যক্ষরূপে দর্শন দিতে পারেন।

মহাত্মাগণের আজ্ঞায় তৎপর রাজা ময়ুরধ্বজের ন্যায় প্রয়োজনে নিজের ছেলের মস্তক বিদীর্ন করতেও পশ্চাদ্‌পদ হন না এরূপ প্রেমী ভক্তকে ভগবান প্রত্যক্ষ দর্শন দিতে পারেন।

শ্রীনরসী মেহেতার মত লজ্জা, মান, বড়াই এবং ভয় ছেড়ে ভগবানের গুণ-গানে মগ্ন হয়ে বিচরণ করলে ভগবান প্রত্যক্ষ দেখা দিতে পারেন।

বি. এ ., এম. এ., আচার্য্য প্রভৃতি পরীক্ষার স্থলে ভক্ত প্রহ্লাদের ন্যায় নবধা ভক্তির* সত্যিকারের পরীক্ষা দিলে ভগবান প্রত্যক্ষ দেখা দিতে পারেন।

ভগবান শুধু যে কেবল দর্শন-ই দেন তা নয়, বরং দ্রোপদী, গজেন্দ্র, শবরী, বিদুর প্রভৃতির ন্যায় প্রেমপূর্বক অর্পণ করা বস্তু তিনি স্বয়ং প্রকট হয়ে খেতেও পারেন।

পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহংভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ ॥ (গীতা ৯।২৬)

---

* শ্রবণং কীর্তনং বিষ্ণো স্মরণং পাদসেবনম্।
অর্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্।। (শ্রী মদ্ভাগবত ৭।৫।২৩)

অর্থাৎ পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি যা কিছু যে কোন ভক্ত আমাকে প্রেমপূর্বক অর্পণ করে, সেই শুদ্ধবুদ্ধি নিস্কাম প্রেমী ভক্তের প্রেমপূর্বক অর্পিত সেই পত্র পুষ্পাদি আমি সগুণরূপে প্রকট হয়ে প্রীতির সঙ্গে ভক্ষণ করি। অতএব সকলের উচিত যে পরম প্রেম এবং উৎকণ্ঠার সঙ্গে ভগবদ্-দর্শনের জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠি।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

উপাসনার তত্ত্ব

শাস্ত্র এবং মহাত্মাগণের অনুভবে ইহা সিদ্ধ যে সাকার এবং নিরাকার এই দুই প্রকারের উপাসক পরমগতি লাভ করতে পারেন। সাকার উপাসকগণকে সগুণ ভগবানের দর্শন-ও হতে পারে, নিরাকার উপাসাকগণের তাদের ইচ্ছা না থাকার দরুন তা হয় না। ঈশ্বরের প্রভাব জেনে সাকার ঈশ্বরের উপাসনা করলে শীঘ্র সফলতা পাওয়া যায়। সাকার ঈশ্বরের প্রভাব বোঝার তাৎপর্য্য হচ্ছে যে, সাধক যেন সেই এক ঈশ্বরকে-ই সর্বব্যাপী সর্বশক্তিমান মনে করেন। শিব অথবা বিষ্ণু যে রূপের সে উপাসনা করে, তাঁর প্রতি সে যেন এরূপ মনে না করে যে আমার ইষ্টদেব ঈশ্বর শুধুমাত্র এই মূর্ত্তিতেই রয়েছেন, আর কোথাও নেই। ঈশ্বরে এই ধরণের পরিমিত বুদ্ধি করা এক ধরণের তামস-জ্ঞান। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ২২ নং শ্লোকে এর নিন্দা করা হয়েছে। এর মানে এই নয় যে মূর্ত্তি পূজা করা উচিত নয় অথবা কেহ যেন সরলতায় তত্ত্ব না জেনে শুধু মুর্ত্তিতে ঈশ্বরের ভাব করে তাঁর উপাসনা না করার চেয়ে যে কোনও ভাব নিয়ে উপাসনায় প্রবৃত্ত হওয়া অপেক্ষাকৃত উত্তম, কিন্তু এরূপ স্বল্প জ্ঞানের দরুণ এই ধরণের উপাসনার ফল অনেক দেরীতে হয়। স্বল্পজ্ঞানের উপাসনায় যদি কোন লোকসান হয় তবে তা এই যে এর দ্বারা সফলতায় বিলম্ব হয়ে যায়, কেননা এতে উপাসক উপাস্য বস্তুর মহত্ত্বকে ক্ষুন্ন করে।

অগ্নির কোন উপাসক যদি অগ্নি প্রজ্বলিত করে এরূপ মেনে নেয় যে, শুধুমাত্র এই পরিধিতেই অগ্নি রয়েছে, আর কোথাও নেই, তাহলে এতে সে অগ্নির মহত্ত্ব কমিয়ে দেয়, এক ব্যাপক বস্তুকে সে এক ক্ষুদ্র সীমায় আবদ্ধ করে দেয়। এর বিপরীত উপাসক যেন এরূপ মনে করে যে বাস্তবে অগ্নি ব্যাপ্ত রয়েছে কিন্তু অপ্রকট হওয়ায় দরুণ সর্বত্র দেখা

যায় না, প্রকট হলেই শুধু দেখা যায় এবং চেষ্টা করলেই তা প্রকট হয়ে যায় । যদি অভাব থাকত তাহলে তা যে কোন জায়গায় যে কোন বস্তুতে কিভাবে প্রকট হত ? যেমন অগ্নি প্রজ্বলিত হোমকুন্ড দেখা যায়, কিন্তু তা সর্বত্র রয়েছে । এইভাবে ঈশ্বরও নিরাকাররূপে সর্বত্র সমভাবে ব্যাপ্ত রয়েছেন, ভক্তের প্রেমে সাকাররুপে প্রত্যক্ষ হন । নিরাকার-ই হচ্ছে সাকার এবং সাকার-ই হচ্ছে নিরাকার । এরূপ বুঝে নেওয়া হচ্ছে সাকারের প্রভাব বোঝা । আসলে ঈশ্বরের সঙ্গে অগ্নির তুলনা করা যায় না । ইহা তো শুধু দৃষ্টান্তমাত্র, কেন না অগ্নি, পরমাত্মার ন্যায় সর্বব্যাপী নয় । একই জায়গায় পাঁচটি বস্তু সর্বব্যাপী হতে পারে না । পৃথিবী জল, অগ্নি, বায়ু প্রভৃতি নিজের নিজের রূপে অবস্থিত রয়েছে । পৃথিবীর প্রধান গুণ হচ্ছে গন্ধ, অগ্নির হচ্ছে রূপ, সর্বব্যাপী পরমাত্মা তো সর্বকারণেরও কারণ, সেইজন্য তিনি সবেতে স্হিত রয়েছেন । কার্য্য কখনও সর্বব্যাপী হতে পারে না, ব্যাপক কারণ হতে পারে । জগতের কারণ হচ্ছে প্রকৃতি । কিন্তু পরমাত্মা তো তারও কারণ হবার দরুণ হচ্ছেন মহাকারণ । প্রকৃতি জড় হবার দরুণ নিজের জড়কার্য্যের কারণ হতে পারে কিন্তু তা চৈতন্য পরমাত্মার কারণ হতে পারে না । অতএব পরমাত্মা-ই হচ্ছেন সকলের মহাকারণ, তিনি-ই জড় চেতন সবেতে পূর্ন রূপে স্থিত রয়েছেন । সকলের বিনাশ হলেও তাঁর বিনাশ হয় না, তিনি নিত্য, অনাদি ।

নিরাকার ব্রহ্মের স্বরূপ হচ্ছে সৎ, বিজ্ঞান, অনন্ত, আনন্দঘন । যার কখনও অভাব কিংবা পরিবর্ত্তন হয় না, তাকে সৎ বলা হয়, যাতে কখনও কোনও বিকার হয় না, যা সবসময় একরস, একরূপ থাকে । বিজ্ঞানের মানে বোধ, চেতন, শুদ্ধ, জ্ঞান, বোঝা উচিৎ । অনন্ত তাঁকে বলা হয়, যার কোন সীমা নেই, কোন মাপ বা ওজন নেই, যার কোথাও আদি অন্ত নেই, যা সুক্ষ্ম থেকে সুক্ষ্মতর এবং যা মহানের চেয়েও মহান, সমস্ত সংসার যার এক অংশ স্থিত । আনন্দঘনের দ্বারা শুধু আনন্দ-ই আনন্দ বোঝা উচিৎ, "ঘন" শব্দের অর্থ এই যে তাতে আনন্দের অতিরিক্তি অন্য কোনও বস্তুর কোন ভাবেই স্থান অবকাশ

নেই। যেমন বরফে জল হচ্ছে ঘন, এইরূপ পরমাত্মা হচ্ছেন আনন্দঘন। বরফ কিন্তু সাকার, জড়, কঠোর ; কিন্তু পরমাত্মা হচ্ছেন চেতন, জ্ঞানস্বরূপ, নিরাকার। এইরূপ নিরাকার পরমাতত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ রয়েছেন।

পরমাত্মার আনন্দরূপ স্বরূপের বর্ণনা দেওয়া যায় না, তা অনির্বচনীয়। যদি আপনার কোনও সময়ে কোনও কারনে মহান আনন্দের প্রাপ্তি হয়ে থাকে, তাহলে তা স্মরণ করুন। তাঁর চেয়েও বেশী আনন্দ হচ্ছে সেইটি, যাহা সৎসঙ্গ, ভজনা বা ধ্যান দ্বারা উৎপন্ন হয়, যার বর্ণনা গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৩৬ এবং ৩৭ নম্বর শ্লোকে করা হয়েছে। এই সুখের সামনে ভোগসুখ সূর্য্যের সামনে জোনাকির তুল্যও নয়। পরন্তু এই সুখও সেই পরম আনন্দরূপ ব্রহ্মের কেবল এক অনুমাত্র ; কেননা ব্রহ্মানন্দের অতিরিক্ত অন্য কোন আনন্দ ঘন নয়, উহা এক সীমায় আবদ্ধ এবং এতে অন্যের অবকাশ রয়েছে।

এই আনন্দরূপ পরমাত্মা দ্বারাই সব কিছুর বিস্তার হয়েছে। এই পরমাত্মায় সংসার তেমনই ভাবে ধরা রয়েছে যেমন দর্পণে প্রতিবিম্ব। বাস্তবে নেই কিন্তু ধরে থাকার মত প্রতীত হচ্ছে। দর্পণ তো জড়পদার্থ এবং কঠোর, কিন্তু সেই পরমাত্মা পরম সুখরূপ হওয়া সত্ত্বেও চেতন এবং উহা এরূপ ঘনতায় ব্যাপ্ত রয়েছে যে তার সঙ্গে কোন কিছুরই তুলনা হতে পারে না। তাঁর ঘনতা কোনও পাথর, পাষাণ, বরফ প্রভৃতির মত নয় ; এদের মধ্যে তো অন্য কিছুর প্রবেশ হতে পারে, কিন্তু তাঁর মধ্যে কোন কিছু প্রবেশের কিছুমাত্র সম্ভাবনা নেই। যেমন এই শরীরে "আমি" (আত্মা) এত সুক্ষ্ম, ঘন যে, তাঁর ভিতরে অন্যকিছুর কখনও স্থান হতে পারে না। শরীর, মন, বুদ্ধি প্রভৃতিতে অন্য কিছুর প্রবেশ হতে পারে, কিন্তু সেই আত্মায় কাহারও কোন ভাবেই প্রবেশ সম্ভব নয়। সেই সর্বব্যাপী নিরাকার পরমাত্মা ও এইরূপ ঘন রয়েছেন।

তাঁর চৈতন্যও অলৌকিক।এই শরীরে যত কিছু বস্তু রয়েছে তা সবই জড়, ইহাকে যে জানে সে চেতন। যে পদার্থ কাহারও দ্বারা জানা যায় তা হচ্ছে জড়, দৃশ্য, তা আত্মাকে জানতে পারে না। হাত, পা

আত্মাকে জানতে পারে না, কিন্তু আত্মা এদের জানে। সেই সবাইকে জানে, জ্ঞান-ই হচ্ছে তার স্বরূপ, সেই জ্ঞানই হচ্ছে পরমেশ্বর, যা সব জায়গায় রয়েছে। এমন কোন স্থান নেই যা এর রহিত, সেইজন্য এ সমন্ধে শ্রুতি বলেছে **"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"**।

সেই ব্রহ্ম ভক্তগণের প্রেমবশে তাদের উদ্ধারার্থে সাকাররূপে প্রকট হয়ে তাদের দর্শন দিয়ে থাকেন। তাঁর সাকার রূপের বর্ণনা করা মানুষের বুদ্ধির অগোচর, কেননা তিনি অনন্ত। ভক্ত যে রূপে তাঁকে দেখতে চান, তিনি সেই রূপে প্রকট হয়ে দর্শন দিয়ে থাকেন। ভগবানের সাকার রূপ ধারণ করা ভগবানের অধীন নয়, কিন্তু প্রেমী ভক্তের অধীন। অর্জুন বিশ্বরূপ দর্শনের ইচ্ছা ব্যক্ত করেছিলেন, তারপর চতুর্ভূজরূপের এবং তদনন্তর দ্বিভূজরূপের, ভক্তভাবন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জুনের ইচ্ছানুসারে অল্পসময়ের মধ্যে তিন-রূপে দর্শন দিয়েছিলেন এবং তাকে নিরাকারের তত্ত্বও ভালভাবে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন। এইরূপে যে ভক্ত পরমাত্মার যে স্বরূপের উপাসনা করে থাকেন, তাকে সেই রূপের দর্শন হতে পারে।

অতএব উপাসনার স্বরূপ পরিবর্তনের কোন আবশ্যকতা নেই। ভগবান বিষ্ণু, রাম, কৃষ্ণ, শিব, নৃসিংহ, দেবী, গণেশ প্রভৃতি যে কোনও রূপের উপাসনা করা হোক না কেন, সব তাঁরই উপাসনা করা হয়। ভজনায় কিছুই পরিবর্তনের প্রয়োজন নেই। পরিবর্তনের প্রয়োজন রয়েছে যদি পরমাত্মায় অল্পবুদ্ধি থেকে থাকে তবে তাঁর। ভক্তের উচিৎ সে যেন নিজের ইষ্টদেবের উপাসনার সময় সর্বদা এরূপ মনে করে যে, আমি যে পরমাত্মার উপাসনা করছি, সেই পরমেশ্বর নিরাকাররূপে চরাচরে ব্যাপ্ত রয়েছেন, তিনি সর্বজ্ঞ, সব কিছুই তাঁর দৃষ্টির সামনে হচ্ছে। সেই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বগুণসম্পন্ন, সর্বসমর্থ, সর্বসাক্ষী, সৎ, চিৎ, আনন্দঘন আমার ইষ্টদেব এই পরমাত্মা-ই নিজের লীলাদ্বারা ভক্তগণের উদ্ধারের জন্য তাদের ইচ্ছানুসারে ভিন্নরূপ ধারণ করে নানা লীলা করে থাকেন। এই প্রকার তত্ত্বের সঙ্গে যে জানে তাঁর কাছে পরমাত্মা কখনও অদৃশ্য হন

না, এবং সেও কখনও পরমাত্মার কাছে অদৃশ্য হয় না। শ্রীভগবান স্বয়ং বলেছেন –

যো মাং পশ্যতি সর্বত্র সর্বং চ ময়ি পশ্যতি।
তস্যাহং ন প্রণশ্যামি স চ মে ন প্রণশ্যতি ।।

(গীতা ৬ / ৩০)

অর্থাৎ "যে পুরুষ সর্বভূতে সকলের আত্মারূপ বাসুদেব যে আমাকেই ব্যাপক দেখে এবং সকল ভূত সমুদায়কে বাসুদেবরূপ আমারই অন্তর্গত দেখে, তার নিকট আমি অদৃশ্য হই না এবং সে আমার নিকট অদৃশ্য হয় না, কেননা সে অমার মধ্যে একত্বভাবে স্থিত রয়েছে।" নিরাকার আকারে কোন ভেদ নেই। যিনি নিরাকার ভগবান, তিনিই সাকাররূপ ধারণ করেন।

ভগবান বলেছেন –

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ।।

(গীতা ৪ / ৬)

অর্থাৎ "আমি অবিনাশী স্বরূপ অজন্মা এবং সমস্ত প্রাণীগণের ঈশ্বর হয়েও নিজ প্রকৃতিকে বশীভূত করে যোগমায়া দ্বারা প্রকট হই।" কেন প্রকট হই ? এই প্রশ্নের উত্তরও ভগবান নিজেই দিয়েছেন –

যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ।।
পরিত্রাণায় সাধূনাং বিনাশায় চ দুষ্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ।।

(গীতা ৪ / ৭-৮)

অর্থাৎ "হে ভারত যখন যখন ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয়, তখনই আমি নিজ রূপের রচনা করি। সাধুপুরুষদের উদ্ধার এবং দুষিত কর্মকারীদের বিনাশ এবং ধর্ম স্থাপন করবার জন্য আমি যুগে যুগে প্রকট হই।

এইভাবে অবিনাশী নির্বিকার পরমাত্মা জগতের উদ্ধারের জন্য, ভক্তগণের প্রেমবশে নিজের ইচ্ছায় নিজে অবতীর্ন হন। তিনি প্রেমময়, তাঁর প্রতিটি ক্রিয়া প্রেম এবং দয়ার প্রকাশ। তিনি যার সংহার করেন, তাঁরও উদ্ধার করে থাকেন। তার সংহারও পরম প্রেমের উপহার, কিন্তু অজ্ঞ জগত তাঁর দিব্য জন্ম-কর্মের লীলার যথার্থ রহস্য না বুঝে নানা ধরনের ভ্রান্ত ধারণা করে।

জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোঽর্জুন॥

(গীতা ৪/ ৯)

অর্থাৎ "হে অর্জুন, আমার জন্ম এবং কর্ম দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক; এরূপে তত্ত্বের সঙ্গে যে পুরুষ জানে, সে শরীর ত্যাগ করে পুনরায় জন্মগ্রহণ করে না, সে তো আমাকেই প্রাপ্ত হয়"।

সর্বশক্তিমান সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা অজ (অজন্মা), অবিনাশী এবং সমস্ত ভূতসমূহের পরমগতি এবং পরম আশ্রয় ; তিনি কেবলমাত্র ধর্মের স্থাপনা এবং সংসারের উদ্ধারের জন্য নিজের যোগমায়ায় সগুণরূপ হয়ে প্রকট হন। অতএব সেই পরমেশ্বরের ন্যায় সুহৃদ, প্রেমী এবং পতিতপাবন দ্বিতীয় আর কেউ নেই, এরূপ বুঝে যে পুরুষ অনন্য প্রেমে তার নিরন্তর চিন্তন করে আসক্তি রহিত হয়ে সংসারে থাকে, সেই বাস্তবে তাঁকে তত্ত্বের সঙ্গে জানতে পারে। এরূপ তত্ত্বজ্ঞ পুরুষকে এই দুঃখরূপ সংসারে আর কখনও ফিরে আসতে হয় না।

ভগবানের জন্ম কর্ম দিব্য কিভাবে ? এই তত্ত্ব যে বুঝে নেয় সেই সত্যিকারের ভাগ্যবান পুরুষ। উজ্জ্বল, প্রকাশময়, বিশুদ্ধ, অলৌকিক প্রভৃতি শব্দ হচ্ছে দিব্যের সমার্থবোধক শব্দ। ভগবানের জন্মে-কর্মে এই সমস্তই ঘটিত হয়। তাঁর কর্ম সংসারে বিস্তৃত হয়ে সকলের হৃদয়ে প্রভাব বিস্তার করে, কর্মের কীর্ত্তি সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে ছেয়ে যায়, যে তাঁর স্মরণ কীর্ত্তন করে, তাদের হৃদয়ও উজ্জ্বল হয়ে যায়। সেইজন্য তিনি উজ্জ্বল। তাঁর লীলার যত অধিক বিস্তার লাভ করে ততই অন্ধকারের বিনাশ হয়। যেখানে সদা হরি-লীলা হয় সেখানে জ্ঞান সুর্য্যের প্রকাশ

উদ্ভাসিত হয়, সেই জন্য তিনি প্রকাশময় । তাঁর কর্মে কোনও প্রকারের স্বার্থ বা নিজের প্রয়োজন থাকে না, কোন কামনা থাকে না, কোনও পাপের লেশমাত্র নেই, মালিন্যশূন্য ; কাজেই তা শুদ্ধ । তাঁর মতো কর্ম কেউ করতে পারে না, ব্রহ্মা, ইন্দ্র আদিও তাঁর কর্ম দেখে মোহিত হয়ে যান । জগতের মানুষের কল্পনাতেও যা আসতে পারে না, যা একেবারে অসম্ভব, তাও তিনি সম্ভব করে দেন, অঘটন ঘটিয়ে দেন, জীবন্মুক্ত অথবা কারক পুরুষ সকলের চাইতেও অদ্ভুত, সেইজন্য তিনি অলৌকিক । শ্রীহরির অবতার সর্বথা শুদ্ধ । নিজ লীলা দ্বারাই নিজে প্রকট হন । তিনি প্রেমরূপ হয়েই সগুণ রূপে প্রকট হন । প্রেমই হচ্ছে ভগবানের মহিমাময়ী মূর্ত্তি সেইজন্য শুধু প্রেমী পুরুষগণই তাঁকে চিনতে পারেন । এই তত্ত্ব বুঝে যারা প্রেমপূর্বক ঈশ্বরের উপাসনা করেন, সেই ভাগ্যবানগণ অতি শীঘ্র সেই প্রেমময়ের প্রেমপূর্ণ শ্রীবিগ্রহের দর্শন করে কৃতার্থ হয়ে যান । অতএব শরীর, মন, বুদ্ধি, আত্মা সমস্তই তার চরণকমলে নিবেদিত করে রাতদিন তারই চিন্তনে লেগে থাকা উচিৎ । ভগবানের প্রেমপূর্ণ আদেশ এবং অনুশাসন স্মরণ করুন ।

ময্যেব মন আধৎস্ব ময়ি বুদ্ধিং নিবেশয় ।
নিবসিষ্যসি ময্যেব অত উর্দ্ধং ন সংশয় ।।

(গীতা ১২ / ৮)

অর্থাৎ "আমাতে মন নিয়োজিত কর, আমাতেই বুদ্ধি নিয়োজিত কর; এরূপ করলে আমাতেই নিবাস করবে অর্থাৎ আমাকেই প্রাপ্ত হবে এতে কোনও সন্দেহ নেই ।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

সত্যিকারের সুখ এবং তা প্রাপ্তির উপায়

ভৌতিক সুখে ক্ষতি

এই সময়ে কি শিক্ষিত, কি অশিক্ষিত প্রায় অধিকাংশ জন সমুদায় সাংসারিক ভোগ বিলাসকেই সত্যিকারের সুখ মনে করে কেবলমাত্র জাগতিক উন্নতির চেষ্টায় প্রবৃত্ত হচ্ছে ; এই পরম সত্যকে লোকে ভুলে বসেছে যে, বিষয় ইন্দ্রিয়ের সংযোগ জনিত ভৌতিক সুখ হচ্ছে বিনাশশীল, ক্ষণিক এবং পরিনামে সর্বথা দুঃখরূপ ।

আজকাল আমাদের অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষাপ্রাপ্ত বিদ্বান বন্ধুগণ, যারা নিজেকে বড় বিচারশীল, তর্কনিপুণ এবং বুদ্ধিমান বলে মনে করেন, ইংরাজদের সঙ্গে থাকার ফলে এবং তাদের বিলাসপ্রিয়তা এবং জড়-ইন্দ্রিয়ের চরিতার্থতা দেখে পাশ্চাত্য সভ্যতার মায়া-মরীচিকায় মুগ্ধ হয়ে রয়েছেন এবং বেদ শাস্ত্রকথিত ধর্মের সুক্ষ্ম-তত্ত্বকে না জেনে প্রাচীন আদর্শ সভ্যতার অবহেলা করছেন । তাদের হৃদয় থেকে এই বিশ্বাস প্রায় লোপ পেতে চলেছে যে আমাদের ত্রিকালজ্ঞ ঋষি মুনিদের বিচারশীলতা, তর্কপটুতা এবং বুদ্ধিমত্তা আমাদের চেয়ে অনের উন্নত ছিল এবং তাঁরা আমাদের উৎকর্ষের জন্য যে পথ দেখিয়ে গিয়েছেন সেই পথই হচ্ছে আমাদের সত্যিকারের সুখ লাভের যথার্থ পথ । যারা এরূপ মত পোষন করেন তাদের ঠিক ভাবে বুঝিয়ে আমাদের প্রাচীন আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট করার বিশেষ প্রয়োজন এবং এতেই সকলের মঙ্গল ।

প্রিয় বন্ধুগণ ! ভেবে দেখলে বুঝতে পারবেন যে বাস্তবিক পক্ষে পাশ্চাত্য সভ্যতা আমাদের দেশ, ধর্ম, অর্থ, সুখ, এবং আমাদের জাতি

তথা আয়ুর বিনাশকারী, এই সভ্যতার সংসর্গের ফলেই আজ আমাদের দেশ চিরকালীন নিজ ধর্ম পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে অধোগতির দিকে যাচ্ছে। এর ফলেই আজ আমাদের ধর্মপ্রাণ জাতি অনার্যোচিত ভীরুতা এবং ভোগপরায়ণতার দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এই প্রকারে যে সভ্যতা আমাদের সাংসারিক সুখেরও বিনাশ করছে তা থেকে সত্যিকারের সুখের আশা করা বিড়ম্বনা মাত্র।

কোনও জাতির বিনাশ সাধন হয় তাঁর পরিধান, ভাষা, পান-ভোজন এবং আচার-ব্যবহার পরিত্যাগ করলে। যে জাতি এই চারিটির রক্ষা করে নিজের আদর্শ থেকে স্খলিত হয় না, তাঁর অস্তিত্বের বিনাশ হওয়া খুবই কঠিন। অতএব আমাদের উচিৎ আমাদের প্রাচীন ঋষিমুনিগণ দ্বারা আচরিত জীবন ধারনের মান, বেশ ভূষা এবং স্বভাব-সভ্যতার অনুকরণ করা। কোনও অবস্থাতেই স্বধর্মের ত্যাগ করা উচিত নয়। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন ঃ—

শ্রেয়ান্ স্বধর্মো বিগুণঃ পরধর্মাৎ স্বনুষ্ঠিতাৎ ।
স্বধর্মে নিধনং শ্রেয়ঃ পরধর্মো ভয়াবহঃ ।।

(গীতা ৩।৩৫)

অর্থাৎ উত্তমরূপে আচরিত পরধর্ম থেকে গুণরহিতও নিজ ধর্ম অতি উত্তম। নিজ ধর্মে থেকে মৃত্যুও কল্যাণকারক আর পরের ধর্ম ভয়প্রদ।

মুসলমান শাসনকালে যখন হিন্দুগণ তাঁদের চাল চলন এবং স্বভাব-সভ্যতার অনুকরণ করা আরম্ভ করল, তখন থেকেই হিন্দুজাতি এবং হিন্দুধর্মের বিনাশ আরম্ভ হল। দেখতে দেখতে আট কোটি হিন্দু ভাই মুসলমানে পরিবর্ত্তিত হল। যারা গাভী, এবং দেব-মন্দির প্রভৃতির রক্ষক ছিলেন, তারাই এদের শত্রুতে পরিণত হল। এই সমস্তই হচ্ছে মুসলমান সভ্যতার এবং তাঁর আচার-বিচারের অনুকরণের-ই ভয়াবহ পরিণাম।

এই সময়ে ইংরাজদের শাসন রয়েছে। চারিদিকেই ইংরাজী শিক্ষার প্রচার হচ্ছে। ইংরাজদের সংসর্গ প্রতিদিন বেড়েই চলেছে।

সেইজন্য বর্তমানে আমাদের জাতির মধ্যে ইংরাজী পরিধান ভাষা, পান-ভোজন এবং আচার-বিচারের অতি দ্রুত প্রভাব বিস্তার করছে । এর সঙ্গে হিন্দুধর্ম এবং হিন্দুজাতির হ্রাস্ এবং খৃষ্টান ধর্মের বৃদ্ধিও হয়ে চলেছে । এই দুর্দশা আমাদের সামনে প্রত্যক্ষ । এরজন্য কোন প্রমাণের প্রয়োজন নেই । অন্যের অনুকরণ করতে গিয়ে নিজের জাতীয় ভাব-ধারার পরিত্যাগ করলে এরূপ পরিণামই হয়ে থাকে ।

অতএব সকলেরই ইহা নিশ্চিতভাবে জেনে নেওয়া উচিত যে পাশ্চাত্য সভ্যতা এবং তার অনুকরণ আমাদের পক্ষে কোনও প্রকারেই হিতকারী নয় । এর ফলেই আমাদের ধর্ম-ভাবের বিনাশ হয় এবং শুধু লৌকিক বহির্জাগতিক (ভৌতিক) উন্নতির পিছনে বৃথা ছোটাছুটি করে সত্যিকারের প্রকৃত লাভ থেকে বঞ্চিত হতে হয় ।

সত্যিকারের সুখ

ভেবে দেখলে প্রত্যেক বুদ্ধিমান মানুষ এই কথাটি বুঝতে পারবেন যে মনুষ্য জন্মের প্রাপ্তিতে সেই জন্মকে সার্থক করা উচিৎ । আহার, পান, নিদ্রা, মৈথুন প্রভৃতি সাংসারিক ভোগ জনিত সুখ তো পশু, কীট আদি নিম্ন-যোনীতেও পাওয়া যেতে পারে । যদি মনুষ্য জীবনের আয়ুও এই সুখের প্রাপ্তির জন্য চলে যায়, তাহলে মনুষ্য জন্ম পেয়ে আমরা কি করলাম ? মনুষ্য জন্মের পরম ধ্যেয় হচ্ছে সেই অনুপমেয় এবং সত্যিকারের সুখ লাভ করা যার সমান অন্য কোনও সুখ নেই । সেই সুখ হচ্ছে পরমাত্মাকে জানা (পাওয়া) ।

সাধনায় কেন লেগে পড় না ?

এরূপ হওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ মানুষ কেবলমাত্র অর্থ, স্ত্রী এবং পুত্রাদিবিষয় জন্য সুখকেই পরমসুখ মেনে নিয়ে তাতেই মুগ্ধ থাকেন । আসল সুখের জন্য প্রযত্নশীল কর্তব্যপরায়ণ পুরুষ অতি অল্পই হয়ে থাকেন ।

শ্রী ভগবান বলেছেন :–

মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে ।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বত : ॥

(গীতা ৭ / ৩)

"হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কেউ কেউ আমার প্রাপ্তির জন্য যত্ন করে থাকে এবং যত্নকারী যোগীদের মধ্যে কোনও পুরুষ মৎপরায়ণ হয়ে আমাকে তত্ত্বতঃ জানে অর্থাৎ যথার্থ মর্মে জানে ।"

ভগবানের কথনানুসারে আজকাল যে সামান্য কিছু সজ্জন ব্যক্তি এই সত্যিকারের সুখ কে প্রাপ্ত হতে চান, তাঁদের মধ্যে থেকেও যৎকিঞ্চিত কেউ শেষ লক্ষ্য পর্য্যন্ত পৌঁছুতে পারেন । অধিকাংশ সাধক তো সামান্য সাধনা করেই থেমে পড়েন । তাঁরা নিজেদের অধিক উন্নত স্থিতিতে নিয়ে যেতে পারেন না । আমার মনে হয় এরজন্য নিম্নলিখিত কারণ হতে পারে –

(১) সংসারে এই সিদ্ধান্তের সুযোগ্য প্রচারক কম ; কেননা ত্যাগী, বিদ্বান, সদাচারী, পরিশ্রমী এবং সত্যিকারের মহাপুরুষেরাই এর প্রচারক হতে পারেন ।

(২) সাধকগণ সামান্য উন্নতিতেই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করে অধিক সাধনার আবশ্যকতা মনে করেন না ।

(৩) কিছু সাধক সামান্য সাধনা করে ব্যস্ত হয়ে পড়েন । সেই সাধনায় নিজের বিশেষ উন্নতি মনে না করে তারা কিংকর্ত্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন ।

(৪) সত্যিকারের সুখে লোকের শ্রদ্ধাও খুবই কম হয়ে থাকে, কেননা বিষয়সুখের মত এর সাধনায় প্রথমেই সুখ দেখা যায় না । সেজন্য তৎপরতার অভাব থাকে ।

(৫) লোকে এই সুখ সম্পাদন করা নিজের শক্তির বাহির বলে মনে করে । কাজেই হতাস হয়ে পড়ে ।

এছাড়াও আরও কিছু কারণ বলা যেতে পারে, কিন্তু এর মধ্যে আসল কারণ হচ্ছে শুধুমাত্র অজ্ঞানতা এবং অকর্মণ্যতা। অতএব মনুষ্যকে সাবধান হয়ে উৎসাহের সঙ্গে কর্ত্তব্যপরায়ণ থাকা উচিৎ।

সত্যিকারের সুখ প্রাপ্তির উপায়

উত্তিষ্ঠৎ জাগ্রৎ প্রাপ্য বরান্ নিবোধত।
ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎকবযে বদন্তি॥

(কঠ ১/৩/১৪)

ওঠো (সাধনার জন্য প্রযত্নশীল হও), অজ্ঞান নিদ্রা থেকে জাগো এবং শ্রেষ্ঠ বিদ্বানগণ যে পথ কে তীব্র ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্লংঘ্য, দুর্গম বলে থাকেন, মহাপুরুষগণের কাছে গিয়ে তাহা বুঝ।

অতএব এই ভগবদ্ সাক্ষাৎকাররূপ পরম কল্যাণ এবং পরম সুখের প্রাপ্তির সাধনায় কিঞ্চিৎ মাত্রও বিলম্ব করা উচিৎ নয়। এটাই মনুষ্য জন্মের পরম কর্ত্তব্য, এটাই সবচেয়ে বড় এবং সত্যিকারের সুখ। এই সুখের মহিমার বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন যে –

সুখমাত্যন্তিকং যত্তদ্বুদ্ধিগ্রাহ্যমতীন্দ্রিয়ম্।
বেত্তি যত্র ন চৈবায়ং স্থিতশ্চলতি তত্ত্বতঃ॥

(গীতা ৬/২১)

"ইন্দ্রিয়সমূহের অতীত কেবল শুদ্ধ সুক্ষ্ম বুদ্ধি দ্বারা গ্রহণ করার যে অনন্ত আনন্দ আছে, তাহা যে অবস্থায় অনুভব করে এবং যে অবস্থায় স্থিত হয়ে এই যোগী ভগবৎস্বরূপ থেকে বিচলিত হয় না"।

যং লব্ধা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥

(গীতা ৬/২২)

"পরমেশ্বরের যে লাভকে প্রাপ্ত হয়ে তাঁ থেকে অধিক অন্য কোন লাভ আছে বলে মানে না এবং ভগবদ্-প্রাপ্তিরূপ যে অবস্থায় স্থিত যোগী ভয়ানক দুঃখেও বিচলিত হয় না।"

তংবিদ্যাদ্দুঃখসংযোগবিয়োগং যোগসংজ্ঞিতম্।
স নিশ্চয়েন যোক্তব্যো যোগোঽনির্ব্বিন্নচেতসা॥

(গীতা ৬/২৩)

"এবং যে দুঃখরূপ সংসারের সংযোগ থেকে রহিত আর যার নাম যোগ তা জানা চাই। সেই যোগ নিরুদ্যমচিত্ত না হয়ে অর্থাৎ তৎপর চিত্ত দ্বারা নিশ্চয়পূর্বক করা কর্ত্তব্য।

যদ্যপি এই সত্যিকারের সুখের প্রাপ্তির উপায় কিছুটা কঠিন কিন্তু অসাধ্য নয়। শ্রীপরমাত্মার শরণ গ্রহণ করলে তো কঠিন হলেও তা সর্বথা সরল, সুখসাধ্য এবং অত্যন্ত সহজ হয়ে যায়। শ্রীমদ্ভগবদগীতায় ভগবান স্বয়ং প্রতিজ্ঞাপূর্বক বলেছেন যে –

মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপিস্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বেশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্ ।।
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্য ভক্ত্যা রাজর্ষয়স্তথা।
অনিত্যমমুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্ ।।

(গীতা ৯/ ৩২ - ৩৩)

হে অর্জুন, স্ত্রীগণ, বৈশ্যগণ সবং শূদ্রাদিক তথা পাপযোগি বিশিষ্টও যে কেউ হোক, তাঁরাও আমার আশ্রয় নিয়ে পরমগতি লাভ করে। পুণরায় কি বলার আছে যে, পূণ্যশীল ব্রাহ্মণগণ এবং রাজর্ষি ভক্তগণ পরমগতিকে প্রাপ্ত হন। সেজন্য তুমি সুখরহিত এবং ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হতে নিরন্তর আমাকেই ভজনা কর।

অতএব সাধকের উচিৎ সে যেন পরমাত্মায় দৃঢ় বিশ্বাস রেখে তাঁর আশ্রয় নিয়ে নিজের উন্নতির প্রতিবন্ধক কারণসমূহকে নিম্নলিখিত উপায়ে দূর করার চেষ্টা করে ।–

(১) সাধকের ধারণায় তাঁর কাছে সংসারে যে সর্ব্বোত্তম সদাচারী, ত্যাগী, জ্ঞানী মহাত্মা মনে হয়, তাঁর কাছে গিয়ে তাঁর আজ্ঞানুসারে সাধনায় তৎপরতার সঙ্গে লেগে যাওয়া চাই। তাঁর বাক্যে দৃঢ় বিশ্বাস রাখা চাই, তাঁর কাছে গিয়ে আবার কিংকর্ত্তব্য-বিমূঢ় হতে নেই, নিজের বুদ্ধিকে প্রাধান্য দিবেন না, তার কথিত সাধন যদি ঠিকমত বুঝতে না পারা যায় তাহলে বিনম্রভাবে জেনে সমাধান করে নেওয়া উচিৎ এবং সাধনায় লাগার পরেও যদি কিছুকাল পর্য্যন্ত প্রত্যক্ষ সুখের প্রতীতি না

হয় তাহলেও পরিণামে পরম হিতের উপর বিশ্বাস রেখে তাঁর আজ্ঞার পালনে কদাপি বিমুখ হতে নেই। শ্রীভগবান বলেছেন –

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥

(গীতা ৪/৩৪)

"দন্ডবৎ প্রণাম তথা সেবা এবং নিস্কপটভাবে প্রশ্নদ্বারা সেই জ্ঞানকে জান। সেই তত্ত্বদর্শী তোমাকে সেই জ্ঞানের উপদেশ দেবেন।"

(২) সাধকের এরূপ কখনও ভাবা উচিৎ নয় যে আমি কোনও দিন এই সাধনার পরিত্যাগ করব। তার এমনই মনে করা উচিৎ যে এই সাধনাই আমার পরম ধন, পরম কর্ত্তব্য, পরম অমৃত, পরম সুখ এবং আমায় প্রাণের পরম আধার। যারা এরূপ মনে করে যে পরমাত্মার জ্ঞান হবার পর আমার সাধনার আর কি প্রয়োজন, তাঁরা ভুল করছে। যে সাধনা দ্বারা অন্তঃকরণ পরম শান্তি লাভ করেছে, সে তা কি করে ছেড়ে দিতে পারে ? পরমাত্মার প্রাপ্তি হবার পরে সেই মহাপুরুষের স্থিতি দেখে তো দুরাচারী মানুষেরও সাধনায় প্রবৃত্তি হয়ে থাকে, যাকে দেখে সাধনাহীন জনগণও সাধনায় লেগে পড়েন, তাঁর নিজের কথা আর কি বলার আছে ? এসব সত্ত্বেও যারা স্বল্প উন্নতিতে-ই নিজেকে কৃতকৃত্য মনে করেন, তাঁরা খুব ভূল করেছেন। এই ভূলের ফলে সাধনায় বিঘ্ন পড়ে। এই ভূল সাধকের অধঃপতন করে দেয়। অতএব এ থেকে সর্বদা সতর্ক থাকা উচিৎ।

(৩) সাধকের এই কথায় দৃঢ় বিশ্বাস থাকা উচিৎ যে কর্ত্তব্য-পরায়ণ, ভগবদ্-শরণাগত পুরুষের কাছে কোন কাজই দুঃসাধ্য নয়। সে বড়োর চেয়েও বড় কাজ সহজেই করে ফেলতে পারে। এই শক্তি প্রকৃতপক্ষে প্রতিটি মানুষেই রয়েছে। নিজের শক্তির অভাব মেনে নেওয়া আসলে নিজে নিজেকে অধঃপতিত করা। উৎসাহী পুরুষের কাছে কষ্ঠসাধ্য কাজও সুখসাধ্য হয়ে ওঠে।

(৪) প্রত্যক সাধকের নিজে নিজের পরীক্ষা অনবরত করে যাওয়া উচিৎ। সুক্ষ্ম দৃষ্টি দিয়ে বিচার করলে নিজের লুকানো দোষও প্রত্যক্ষ

দেখা দিতে থাকে। সাধকের খেয়াল করা উচিৎ যে আমার মন নিজের অধীন, শুদ্ধ, একাগ্র এবং বিষয়সমূহ থেকে বৈরাগ্য হয়েছে কি না। কেননা যে পর্য্যন্ত মন এবং ইন্দ্রিয়সমূহের উপর পুরোপুরি আধিপত্য না হয়, সে পর্য্যন্ত পরমাত্মা-প্রাপ্তি অনেক দূর। শ্রী ভগবান বলেছেন –

অসংযতাত্মনা যোগো দুষ্প্রাপ ইতি মে মতিঃ।
বশ্যাত্মনা তু যততা শক্যোঽবাপ্তুমুপায়তঃ ॥
(গীতা ৬/৩৬)

"যে মনকে বশ করতে পারে না এরূপ পুরুষের পক্ষে যোগ দুষ্প্রাপ্য অর্থাৎ প্রাপ্ত হওয়া কঠিন এবং স্বাধীনচেতা ও প্রযত্নশীল পুরুষ দ্বারা সাধনার বলে প্রাপ্ত হওয়া সহজ, ইহা আমার মত।"

অতএব সাধকের সবার আগে মনকে নিজের অধীন, শুদ্ধ এবং একাগ্র করা উচিৎ।* এর জন্য শাস্ত্রে প্রধানতঃ দুইটি উপায় বলা হয়েছে।

(১) অভ্যাস এবং (২) বৈরাগ্য।

শ্রীভগবান বলেছেন যে –

অসংশয়ং মহাবাহো মনো দুর্নিগ্রহং চলম্।
অভ্যাসেন তু কৌন্তেয় বৈরাগ্যেণ চ গৃহ্যতে ॥
(গীতা ৬/ ৩৫)

"হে মহাবাহো! নিসন্দেহে মন চঞ্চল এবং কঠিণতার বশে হয়, পরন্তু হে কুন্তিপুত্র অর্জুণ, অভ্যাস অর্থাৎ স্থিতির জন্য বারেবারে যত্ন করলে এবং বৈরাগ্য দ্বারা একে বশে করা যায়।"

পাতঞ্জলী যোগদর্শনেও এরূপ বলা হয়েছে –।

অভ্যাসবৈরাগ্যাভ্যাং তন্নিরোধঃ। (যোগ ১ / ১২)

"অভ্যাস এবং বৈরাগ দ্বারা চিত্তবৃত্তি সমূহের নিরোধ হয়ে থাকে।"

---

* "মনকে বশীভূত করার উপায়" নামক পুস্তকে মনকে নিরোধ করার অনেক উপায় বলা হয়েছে।

অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের বিস্তৃত ব্যাখ্যা ক্রমান্বয়ে উক্ত গ্রন্থে দেখা উচিত কিন্তু শ্রীভগবান মুখ্যরূপে অভ্যাসের স্বরূপ নিম্নরূপে বর্ণনা করেছেন —।

যতো যতো নিশ্চরতি মনশ্চঞ্চলমস্থিরম্ ।
ততস্ততো নিয়ম্যৈতদাত্মন্যেব বশং নয়েৎ ।।

(গীতা ৬ / ২৬)

"এই অস্থির চঞ্চল মন যে যে কারণে সাংসারিক পদার্থে বিচরণ করে সেই সেই কারণ থেকে সরিয়ে নিয়ে বারেবারে পরমাত্মাতে নিযুক্ত কর ।"

বৈরাগ্য সম্বন্ধে শ্রীভগবান বলেছেন —

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে ।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ।।

(গীতা ৫ / ২২)

"যা ইন্দ্রিয় এবং বিষয়সমূহের সংযোগে উৎপন্নশীল সমস্তই ভোগ, উহা যদিও বিষয়ী পুরুষগণের নিকট সুখরূপে ভাসিত হয় তথাপি তা নিঃসন্দেহে দুঃখেরই হেতু এবং আদি-অন্ত বিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য কাজেই হে অর্জুন, বুদ্ধিমান বিবেকী পুরুষ তাতে রত হন না ।"

এই প্রকারে অভ্যাস বৈরাগ্য দ্বারা মনকে শুদ্ধ, নিজের অধীন, একাগ্র এবং বৈরাগ্য সম্পন্ন করে ভগবানের স্বরূপে নিরন্তর অচল স্থির করার জন্য ধ্যানের সাধনা করা উচিত ।

শ্রীভগবান যেমন বলেছেন —

সংকল্পপ্রভবান্ কামাংস্ত্যক্ত্বা সর্বানশেষতঃ ।
মনসৈবেন্দ্রিয়গ্রামং বিনিয়ম্য সমন্ততঃ ।।
শনৈঃ শনৈরুপরমেদ্বুদ্ধ্যা ধৃতি গৃহীতয়া ।
আত্মসংস্থং মনঃ কৃত্বা ন কিঞ্চিদপি চিন্তয়েৎ ।।

(গীতা ৬ / ২৪--২৫)

"সংকল্প থেকে উৎপন্ন সম্পূর্ণ কামনা সমূহকে নিঃশেষরূপে অর্থাৎ বাসনা এবং আসক্তিসহিত ত্যাগ করে এবং মনের দ্বারা ইন্দ্রিয়সমূহকে

সবদিক থেকে ভালভাবে বশীভূত করে ক্রমে (অভ্যাস করতে করতে) উপরাম হবে তথা ধৈর্যযুক্ত বুদ্ধিদ্বারা মনকে পরমাত্মায় স্থিত করে এক পরমাত্মা ছাড়া আর অন্য কিছুরই চিন্তা করবে না।" অভ্যাস এবং বৈরাগ্যের প্রভাবে মন শুদ্ধ, স্বাধীন, একাগ্র এবং উদাসীন হয়ে গেলে তখন তা পরমাত্মার চিন্তনে লাগানো অতি সহজ তো হয়েই যায় পরন্তু উপরিউক্ত দুই উপায়কে পূর্ণরূপে কাজে না নিয়েও মানুষ যদি কেবলমাত্র পরমাত্মার আশ্রয় নিয়ে তাঁর নাম-জপ এবং স্বরূপ-চিন্তনে তৎপর হয়ে যায় তাহলে এই ধরণের ধ্যানের দ্বারাও সব কিছু হতে পারে। সাধকের মন শীঘ্রই শুদ্ধ, একাগ্র এবং তাঁর অধীন হয়ে যায় এতে কোনও সন্দেহ নেই।

মহর্ষি পাতঞ্জলিও শীঘ্রাতিশীঘ্র সমাধি লাগানোর উপায়ের জন্য বলেছেন –

"ঈশ্বরপ্রণিধানাদ্বা" (যোগ ১ / ২৩)

অর্থাৎ অভ্যাস এবং বৈরাগ্য তো মনের নিরাধ করার উপায় রয়েছেই, এই সাধনসমূহকে যে যত কাজে লাগায়, তত শ্রীঘ্রই তাঁর মন নিরুদ্ধ হয়। পরন্তু ঈশ্বরপ্রণিধান দ্বারাও মন অতি শ্রীঘ্রই সমাধিস্ত হতে পারে।

কাজেই এটা মেনে নেওয়া যেতে পারে যে জপ, তপ, ব্রত, দান, লোকসেবা, সৎসঙ্গ এবং শাস্ত্রের মনন (চিন্তন) প্রভৃতি সমস্ত সাধনা এই ধ্যানের জন্যই বলা এবং করা হয়ে থাকে।

অতএব সত্যিকারের সুখ প্রাপ্তির সাক্ষাৎ সরল এবং সবচেয়ে সুলভ উপায় হচ্ছে পরমাত্মার স্বরূপের নিরন্তর চিন্তন করে যাওয়া। একেই শাস্ত্রকারগণ ধ্যান, স্মরণ এবং নিদিধ্যাসন প্রভৃতি নামে অভিহিত করেছেন। কর্মযোগ এবং সাংখ্যযোগ প্রভৃতি সকল সাধনায় পরমাত্মার ধ্যান প্রধান।

সাধনা-কালে অধিকারী-ভেদে ধ্যানের সাধনার মধ্যেও অনেক পার্থক্য থাকে। একই ধরণের সাধনায় সকল মানুষের রুচি হয় না। একই গন্তব্য স্থানে যাবার অনেক পথ হয়ে থাকে। তদনুরূপ ফলপ্রাপ্তি

একই পরম বস্তু হলেও সাধনার প্রকারে ভেদ থেকে থাকে । কেউ একত্বভাবে সচ্চিদানন্দ পরমাত্মার নিরাকার রূপের ধ্যান করে আবার কেউ স্বামী সেবক ভাব নিয়ে সর্বব্যাপী পরমেশ্বরের চিন্তন করে । কেউ ভগবান বিশ্বরূপের, কেউ চতুর্ভূজ শ্রীবিষ্ণুর, কেউ মুরলীমনোহর শ্রীকৃষ্ণের আর কেউ বা মর্য্যাদাপুরোষোত্তম ভগবানের রামরূপের, কেউ বা কল্যাণময় শ্রীশিবরূপের-ই ধ্যান করে থাকে ।

জ্ঞানযজ্ঞেন চাপ্যন্যে যজন্তো মামুপাসতে ।
একত্বেন পৃথক্ত্বেন বহুধা বিশ্বতোমুখম্ ॥ ।।

(গীতা ৯ / ১৫)

অতএব যে সাধকের পরমাত্মার যে রূপে অধিক প্রীতি এবং শ্রদ্ধা থাকে সে যেন নিরন্তর তাঁরই ধ্যান করে । পরিণাম সকলেরই এক, পরিণাম সম্বন্ধে কিঞ্চিৎমাত্রও সংশয় রাখার কোনও কারণ নেই ।

সাধকের প্রায় দুইটি শ্রেণী হয়ে থাকে । এক অভেদরূপে অর্থাৎ যারা একত্বভাব রেখে পরমাত্মার উপাসনা করে এবং অন্য যারা স্বামী-সেবক ভাব রেখে ভক্তি করে থাকে । এর মধ্যে যারা অভেদরূপে উপাসনা করে থাকে তাদের পক্ষে তো এক শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপে-ই নিরন্তর একত্ব-ভাবে স্থিত থাকা ধ্যানের সর্বোত্তম সাধন । কিন্তু দ্বিতীয় যে স্বামী-সেবক ভাব রেখে উপাসনা করা হয়ে থাকে সেই ভক্তগণের জন্য শাস্ত্রে ধ্যানের অনেক প্রকার বলা হয়েছে ।

ধ্যান করার পদ্ধতি না জানার জন্য ধ্যান ঠিক ভাবে হয় না, সাধক তো চায় পরমাত্মার ধ্যান কিন্তু হয়ে থাকে জগতের ধ্যান । এই অভিযোগ প্রায়ই দেখা এবং শোনা হয়ে থাকে । কাজেই পরমাত্মায় মন লাগাবার যে সকল বিধি রয়েছে তা জানা অতি আবশ্যক । শাস্ত্রকারগণ বিভিন্ন প্রকারে ধ্যানের বিধি বোঝাবার চেষ্টা করেছেন । তার মধ্যে থেকে কিছু ব্যাখ্যা এখানে সংক্ষেপে করা হচ্ছে ।

যদিও পরমাত্মার চিন্তন নিরন্তর চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে, খেতে, পান করতে, শুতে, বলতে এবং সব ধরণের কাজ করার সময়ও সব সময়ে-ই করা উচিত পরন্তু সাধক যখন বিশেষ করে ধ্যান করার

উদ্দেশ্য নিয়ে বসে, সেই সময়ে তো গৌণরূপেও তাকে তাঁর অন্তঃকরণে সাংসারিক সংকল্পসমূহকে উঠতে দেওয়া উচিত নয় তথা একান্ত এবং শুদ্ধ জায়গায় বসে ধ্যানের সাধনা আরম্ভ করে দেওয়া উচিত।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে –

শুচৌ দেশে প্রতিষ্ঠাপ্য স্থিরমাসনমাত্মনঃ।
নাত্যুচ্ছ্রিতং নাতিনীচং চৈলাজিনকুশোত্তরম্ ।।
তত্রৈকাগ্রং মনঃ কৃত্বা যতচিত্তেন্দ্রিয়ক্রিয়ঃ।
উপবিশ্যাসনে যুঞ্জ্যাদ্ যোগমাত্মবিশুদ্ধয়ে ।।

(গীতা ৬ / ১১-১২)

"শুদ্ধ ভূমিতে পরপর কুশ, মৃগচর্ম এবং বস্ত্র বিছিয়ে এবং নিজের আসনকে না অতি উঁচু না অতি নিচুতে স্থির ভাবে স্থাপন করে সেই আসানে বসে তথা মনকে একাগ্র করে চিত্ত এবং ইন্দ্রিয়ের ক্রিয়াসমূহকে বশীভূত করে অন্তঃকরণের শুদ্ধির জন্য যোগ অভ্যাস করা উচিত।"

সমং কায়শিরোগ্রীবং ধারয়ন্নচলং স্থির।
সংপ্রেক্ষ নাসিকাগ্রং স্বং দিশশ্চানবলোকয়ন্ ।।

(গীতা ৬ / ১৩)

"শরীর, মস্তক এবং গ্রীবাকে সমান এবং অচলভাবে ধারণ করে দৃঢ় হয়ে নিজের নাসিকার অগ্রভাগ দেখে* অন্য কোন দিকে না তাকিয়ে পরমশ্বেরের ধ্যান করা উচিত।

ধ্যান করতে চায় এমন সাধকের এই কথাটি বিশেষভাবে জেনে রাখা উচিত যে, যে পর্য্যন্ত নিজের শরীর এবং সংসারের জ্ঞান রয়েছে সে পর্য্যন্ত ধ্যানের সঙ্গে নাম-জপের অভ্যাস অবশ্যই করে যাওয়া উচিৎ। নাম-জপের আশ্রয় না থাকলে দীর্ঘক্ষণ পর্য্যন্ত নামীর স্বরূপে মন টিকে থাকে না।

---

* এখানে দৃষ্টি নাসিকার অগ্রভাগে রাখতে বলা হয়েছে। কিন্তু যাদের চোখ বন্ধ করে ধ্যান করার অভ্যাস রয়েছে তাঁরা চোখ বন্ধ রেখেও তা করতে পারেন, এতে কোন ক্ষতি নেই।

নিদ্রা, আলস্য এবং অন্যান্য সাংসারিক স্ফুরণা বিঘ্নরূপে এসে মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। নামীকে স্মরণে আনার প্রধান আধার হচ্ছে তাঁর নাম। নাম নামীর রূপ কখনও ভুলতে দেয় না। নামের দ্বারা ধ্যানে পূর্ণ সাহায্য পাওয়া যায়। অতএব ধ্যান করার সময় যে পর্য্যন্ত ধ্যেয়ে (অর্থাৎ নামীতে) পূর্ণরূপে মগ্ন না হওয়া যায়, সে পর্য্যন্ত নামজপ কখনও ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়। এ পর্য্যন্ত ধ্যান সম্বন্ধে সাধারণ ভাবে কিছু বলা হল। এবার ধ্যানের কিছু বিধি সম্বন্ধে লেখা হচ্ছে।

অভেদোপাসনা অনুসারে ধ্যানের বিধি

যারা একত্ত্বভাব রেখে পরমাত্মার উপাসনা করে সেরূপ সাধকদের উচিত তারা যেন উপরিযুক্তভাবে আসনে বসে মন থেকে সম্পূর্ণ সংকল্পের ত্যাগ করে যেন এরূপ ভাবনা করে।

(১) এক আনন্দঘন জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম-ই পরিপূর্ণ রয়েছেন। উনি ভিন্ন আর কিছুই নেই, সেই ব্রহ্মের জ্ঞানও ব্রহ্মেই রয়েছে, তিনি স্বয়ং জ্ঞানস্বরূপ , তার কখনও অভাব হয় না। সেইজন্য তাকে সত্য, সনাতন এবং নিত্য বলা হয়, তা সীমারহিত, অপার এবং অনন্ত। মন, বুদ্ধি, অহংকার, দ্রষ্টা।

দৃশ্য, দর্শন প্রভৃতি যা কিছু রয়েছে, সমস্তই সেই ব্রহ্মে আরোপিত এবং ব্রহ্মস্বরূপ-ই রয়েছে। বাস্তবে এক পূর্ণ ব্রহ্ম পরমাত্মা ছাড়া অন্য কোন বস্তুই নেই। এই সম্পূর্ণ সংসার স্বপ্নের ন্যায় সেই পরমাত্মায় কল্পিত রয়েছে।

"সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম" (তৈত্তি ২/২১)

"ব্রহ্ম হচ্ছে সত্য, চেতন এবং অনন্ত", এই শ্রুতি অনুসারে সেই পরমাত্মা হচ্ছেন আনন্দঘন, সত্যস্বরূপ, বোধস্বরূপ, "বোধ" তা থেকে ভিন্ন, তাঁর কোন গুণ বা কোন উপাধি বা শক্তিবিশেষ নয়। এরূপে "সৎ"-ও তা থেকে ভিন্ন কোন গুণ নয়। উহা চিরকাল থেকে রয়েছে এবং চিরকাল-ই থাকে, সেজন্য লোক এবং বেদে উহাকে "সৎ" বলা হয়। বাস্তবে সেই পরমাত্মা সৎ এবং অসৎ এই দুই থেকেই ভিন্ন।

ন সত্তন্নাসদুচ্যতে । (গীতা ১৩/১২)

এভাবে অন্তঃকরণে ব্রহ্মের চিন্তাতীত স্বরূপের দৃঢ় ভাবনা রেখে জপের স্থানে বারেবারে পরমাত্মার বৈশিষ্ঠের কথা মনে মনে ভাবনা রেখে এবং তার উচ্চারণ করতে থাকে । বাস্তবে ব্রহ্ম হচ্ছে নাম-রূপের অতীত কিন্তু তাঁর আনন্দস্বরূপের স্ফুর্তির জন্য এই বৈশিষ্ঠসমূহের কল্পনা রয়েছে । অতএব সাধক চিত্তের সমস্ত বৃত্তিসমূহকে আনন্দরূপ ব্রহ্মে নিমজ্জিত করে, পূর্ণ আনন্দ, অপার আনন্দ, শান্ত আনন্দ, ঘন আনন্দ, বোধ স্বরূপ আনন্দ, জ্ঞান স্বরূপ আনন্দ, পরম আনন্দ, নিত্য আনন্দ, সৎ আনন্দ, চেতন আনন্দ আনন্দ-ই আনন্দ, এক আনন্দ-ই আনন্দঃ এইভাবে ব্রহ্মের বৈশিষ্ঠের চিন্তন করতে থেকে এই ভাবকে উত্তরোত্তর দৃঢ় করে যাওয়া উচিত যে এক "আনন্দ" ভিন্ন আর কিছুই নেই । এর সঙ্গে সঙ্গে সে তাঁর মনকে তীব্রভাবে সেই আনন্দময় ব্রহ্মে তন্ময় করে সেই বেশিষ্ঠ সমূহকে সেই পরমাত্মা থেকে যেন অভিন্ন মনে করে । এই ভাবে মনন করতে করতে যখন মনের সমস্ত সংকল্প সেই পরমাত্মায় বিলীন হয়ে যায়, যখন এক বোধস্বরূপ, আনন্দঘন পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুরই সংকল্প মনে থাকে না তখন তাঁর স্থিতি সেই আনন্দময় অচিন্ত্য পরমাত্মায় নিশ্চল ভাবে হয়ে থাকে । এই ধরণের ধ্যানের নিত্য নিয়মপূর্বক অভ্যাস করার ফলে সাধন পরিপক্ক হলে যখন সাধকের জ্ঞানে তাঁর নিজের এবং এই সংসারের সত্তা ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন না থাকে, যখন জ্ঞাতা, জ্ঞান এবং জ্ঞেয় সব কিছুই এক বিজ্ঞানানন্দঘন ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়, তখন সে কৃতার্থ হয়ে যায় । তখন সাধক, সাধনা এবং সাধ্য সমস্তই অভিন্ন, সবই এক আনন্দস্বরূপ হয়ে যায়, এবং তখন তাঁর স্থিতি চিরকালের জন্য সেই রকমই রয়ে যায় । চলতে ফিরতে, উঠতে-বসতে তথা অন্য সমস্ত কাজ যথাবৎ এবং যথাসময়ে হয়েও তাঁর স্থিতিতে যৎকিঞ্চিত-ও পার্থক্য হয় না । শ্রী ভগবান বলেছেন –

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্বথা বর্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ॥ (গীতা ৬/৩১)

"যে পুরুষ একীভাবে স্থিত হয়ে সকল ভূতে আত্মারূপে স্থিত সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবরূপে আমাকে ভজনা করে, সেই যোগী সর্বপ্রকারে নিযুক্ত থেকেও আমাতেই স্থিত রয়েছে কেননা তাঁর অনুভবে আমি ব্যতীত আর কিছুই নেই ।"

আসলে সে কোন সময়েই সংসারকে বা নিজেকে ব্রহ্ম থেকে ভিন্ন দেখে না । সেইজন্য তাঁর আর কখনও পুনঃর্জন্ম হয় না । সে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে যায় । গীতায় বলা হয়েছে –

তদ্বুদ্ধয়স্তদাত্মনিস্তন্নিষ্ঠাস্তৎপরায়ণাঃ ।
গচ্ছন্ত্যপুনরাবৃত্তিং জ্ঞাননির্ধূতকল্মষাঃ ॥ (গীতা ৫/ ১৭)

যাদের বুদ্ধি তদ্রূপ আর যাদের মন তদ্রূপ ও যাদের সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাতেই নিরন্তর একীভাবে স্থিতি এরূপ তৎপরায়ণ পুরুষ জ্ঞানদ্বারা পাপরহিত হয়ে অনুনরাবৃত্তি অর্থাৎ পরমগতিকে প্রাপ্ত হন । উপরিউক্ত ধ্যানের এটিই ফল ।

অভেদোপাসনায় ধ্যানের অন্য যুক্তি ঃ–

যচ্ছেদ্বাঙ্মনসী প্রাজ্ঞস্তদ্যচ্ছেজ্জ্ঞান আত্মনি ।
জ্ঞানমাত্মনি মহতি নিয়চ্ছেৎ তদ্যচ্ছেচ্ছান্ত আত্মনি ॥
(কঠ ১/৩/১৩)

'বুদ্ধিমান পুরুষের উচিৎ যে সে যেন বাণী প্রভৃতি সমস্থ ইন্দ্রিয়সমূহকে মনে অবরোধ করে, মনকে বুদ্ধিতে অবরোধ করে, বুদ্ধিকে মহত্তত্ত্বে অর্থাৎ সমষ্ঠি-বুদ্ধিতে অবরোধ করে এবং সেই সমষ্টি-বুদ্ধি কে শান্তাত্মা পরমাত্মায় অবরোধ করে ।'

একাস্থানে বসে দশ ইন্দ্রিয়ের বিষয়সমূহকে ইন্দ্রিয়দ্বারা গ্রহণ না করা অর্থাৎ সমস্ত ইন্দ্রিয়ের তৎসমূহের বিষয় থেকে সংযত করে মনের দ্বারা কেবলমাত্র পরমাত্মার স্বরূপের বারংবার মনন করতে যাওয়াই হচ্ছে "বাণী প্রভৃতি ইন্দ্রিয়সমূহের মনে নিরোধ করা ।" এর পরে পরমাত্মার মনন করা স্বরূপ সম্বন্ধে যত বিকল্প রয়েছে, সে সমস্ত ত্যাগ করে এক নিশ্চয়ে স্থিত হয়ে চিত্তের শান্ত হয়ে যাওয়া অর্থাৎ অন্তঃকরণে কোনও চঞ্চলাত্মক বৃত্তির কিঞ্চিৎমাত্রও অস্তিত্ব না থেকে একমাত্র বিজ্ঞানকে

প্রকাশিত করা হচ্ছে "মনের বুদ্ধিতে নিরোধ করা" । ধ্যানের এই স্থিতিতে ধ্যানীকে তাঁর নিজের এবং ধ্যেয় বস্তু পরমাত্মার বোধ রয়ে থাকে কিন্তু এর পরে যখন সেই সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্মের স্বরূপের নিশ্চয়কারী বুদ্ধি বৃত্তির স্বতন্ত্র সত্ত্বাও সমষ্টিজ্ঞানে তন্ময় হয়ে যায়, তখন ধ্যানী, ধ্যান এবং ধ্যেয়র সমস্ত ভেদ মিটে গিয়ে কেবলমাত্র এক জ্ঞানস্বরূপ পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার স্বরূপের বোধ রয়ে যায়, এই অবস্থাকে বুদ্ধির সমষ্টি বুদ্ধিতে নিরোধ করা বলা হয়ে থাকে । এর পরে আরও একটি অনির্বচনীয় স্থিতি হয়, যাতে ধ্যানী, ধ্যান এবং ধ্যেয়র ভিন্ন সংস্কার মাত্রেরও অবশেষে থাকে না । কেবলমাত্র এক শুদ্ধ, বোধস্বরূপ সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই থেকে যান, এ ছাড়া অন্য কোন কিছুরই ভিন্ন সত্ত্বা কোন ভাবেই থাকে না । এরই নাম হচ্ছে সমষ্টি-বুদ্ধির শান্তাত্মায় নিরোধ করা ।

একেই নির্বীজ সমাধি, শুদ্ধব্রহ্মের প্রাপ্তি বা কৈবল্য-পদের প্রাপ্তি বলা হয়ে থাকে । ইহাই অন্তিম স্থিতি । বাণী এই অবস্থার বর্ণনা করতে পারে না, মন এর মনন করতে পারে না, কেননা ইহা মন, বানী এবং বুদ্ধির আগম্য, ইহাই মোক্ষ ।

এই স্থিতি কে প্রাপ্ত হয়ে, মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে যায় । তার ক্ষেত্রে আর কোন কর্ত্তব্যের অবশেষ থাকে না ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলা হয়েছে –

যস্ত্বাত্মরতিরেব স্যাদাত্মতৃপ্তশ্চ মানবঃ ।
আত্মন্যেব চ সন্তুষ্টস্তস্য কার্য্যং ন বিদ্যতে।।

(গীতা ৩/ ১৭)

"যে মানুষ আত্মাতেই প্রীতিযুক্ত এবং আত্মাতেই তৃপ্ত এবং আত্মাতেই সন্তুষ্ট তার ক্ষেত্রে কোনও কর্ত্তব্য প্রযোজ্য হয় না ।"

অভেদোপাসনা অনুসারে পরমাত্মার ধ্যান করার আরও বহু প্রণালী রয়েছে কিন্তু প্রসঙ্গ বেড়ে যাওয়ায় তা লেখা হচ্ছে না । সবেরই দৃষ্টিকোন একই । যারা একাত্ত্বভাবে উপাসনা করতে চায় তাদের জন্য গীতার নিম্নলিখিত শ্লোকটি নিরন্তর স্মরণে রাখা অত্যন্ত লাভদায়ক –

বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ॥ (গীতা ১৩/১৫)

(সেই পরমাত্মা) চরাচর সকল ভূতের বাহিরে ও অন্তরে পরিপূর্ণ রয়েছেন, চর-অচর রূপে তিনি রয়েছেন, এবং সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয়★ তথা অতি সমীপে★ এবং অতি দূরেও● তিনিই (আছেন)।

অতএব যাদের অভেদোপাসনায় রুচি রয়েছে, সেই সাধকদের উপর্যুক্ত প্রকারে সাধনায় শীঘ্রই তৎপর হওয়া উচিৎ।

বিশ্বরূপ পরমাত্মার ধ্যানের বিধি

একান্তস্থানে চোখ বন্ধ করে বসলেও যদি সাধকের হৃদয় থেকে এই মায়াময় সংসারের কল্পনা দূর না হয় তাহলে তাঁর এই ভাবে ভাবা উচিৎ—

পৃথিবী, অন্তরীক্ষ এবং স্বর্গলোক এই তিন লোকে যা কিছু দেখতে, শুনতে এবং মননে আসে তা সবই সাক্ষাৎ পরমাত্মারই স্বরূপ। সেই সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মাই নিজের মায়াশক্তিদ্বারা বিশ্বরূপে প্রকট হয়েছেন। যেরূপ শ্রীগীতায় বলা হয়েছে—

সর্বতঃ পানিপাদং তৎ সর্বতোহক্ষিশিরোমুখম্ ।
সর্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি ॥

(গীতা ১৩/১৩)

"তিনি সকল দিকে হস্তপদ বিশিষ্ঠ, সকল দিকে চক্ষু, মস্তক ও মুখ বিশিষ্ঠ এবং সকল দিকে শ্রোত্র (কান) বিশিষ্ঠ রয়েছেন, যেহেতু তিনি সংসারে সকলকে ব্যাপ্ত করে স্থিত আছেন।" *

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন ।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ ॥

(গীতা ১০/৪২)

★ যেমন সূর্য্যরশ্মিতে স্থিত জল সুক্ষ্ম হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে জানতে পারা যায় না, তদনুরূপ সর্বব্যাপী পরমাত্মাও সূক্ষ্ম হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে জানা যায় না।

★ সেই পরমাত্মা সর্বত্র পরিপূর্ণ এবং সকলের আত্মা হওয়ায় অত্যন্ত সমীপে রয়েছেন।

● শ্রদ্ধারহিত অজ্ঞানী মানুষের কাছে জানতে না পারার জন্য তিনি অতি দূর।

* আকাশ যেমন বায়ু, অগ্নি, জল ও পৃথিবীর কারণ রূপ হওয়ায় এতে ব্যাপ্ত হয়ে স্থিত রয়েছে, তেমনি পরমাত্মাও সকলরে কারণরূপ হওয়ায় সম্পূর্ণ চরাচর জগতকে ব্যাপ্ত করে স্থিত রয়েছেন।

যচ্চাপি সর্বভূতানাং বীজং তদহমর্জ্জুন ।
ন তদস্তি বিনা যৎ স্যান্ময়া ভূতং চরাচরম্ ॥

(গীতা ১০/৩৯)

"হে অর্জুন, সকল ভূতের উৎপত্তির কারণও আমি, কেননা চর-অচর এমন কোনও ভূত নেই যা আমি ব্যতীত রয়েছে, কাজেই সমস্তই আমার স্বরূপ ।

এরূপে বারংবার মনন করে সম্পূর্ণ সংসারকে তত্ত্বতঃ শ্রীপরমাত্মার স্বরূপ মনে করে পরমাত্মার নিশ্চয় করা রূপে মনকে নিশ্চল করা উচিৎ । এরূপ করলে মনের চঞ্চলতার সহজেই বিনাশ হয় । এবং এরপর মন যেখানে যায়, সেখানেই তাকে সেই পরমাত্মার দর্শন হয় । এক পরমাত্মা ভিন্ন অন্য কিছুরই ভাস হয় না । যেমন জল দ্বারা বরফের তৈরী বিভিন্ন ধরণের খেলনাকে ঃ-

যে তত্ত্বতঃ জলরূপে জেনে যায়, তার পূণরায় তাদের জল সম্বন্ধে কোন রকমের ভ্রম থাকে না, তাঁর কাছে সকল খেলনা প্রত্যক্ষ ভাবে জলস্বরূপ দেখাতে থাকে । এরূপে উপযুক্ত ভাবে পরমাত্মার ধ্যানকারী সাধকেরও সম্পূর্ণ বিশ্ব পরমাত্মস্বরূপ দেখতে থাকে । তাঁর ভাবনায় জগৎরূপ কোন বস্তুর অস্তিত্বও থাকে না, মন শান্ত এবং সংশয়-রহিত হয়ে যায় । চঞ্চল চিত্ত কে পরমাত্মায় নিয়োগ করার এও এক সহজ উপায় ।

শ্রীবিষ্ণুর চতুর্ভূজ রূপের ধ্যান করার বিধি

একান্ত স্থানে পূর্বোক্ত আসনে বসে চোখ বন্ধ করে নিন এবং আনন্দে মগ্ন হয়ে আপন সেই পরম প্রেমীর সাক্ষাৎকারের তীব্র লালসা নিয়ে ধ্যানের সাধন প্রারম্ভ করুন ।

মন্দিরে ভগবানের মূর্ত্তির দর্শন করে, ফটোতে ভগবানের চিত্র অবলোকন করে, সন্ত-মাহাত্মাদের দ্বারা শুনে কিংবা সৌভাগ্যবশতঃ স্বপ্নে প্রভূর দর্শন পেয়ে থাকলে, ভগবানের যে সাকার রূপকে বুদ্ধি গ্রহণ করে, অর্থাৎ যে ধরণের সাকার রূপ সাধকের কাছে গ্রহনীয় হয়, তারই ভাবনা করে ধ্যান করা উচিৎ । সাধারণ ভাবে ভগবানের মুর্ত্তিতে ধ্যানের ভাবনা নিম্নভাবে করা যেতে পারে –

(১) ভূমি থেকে প্রায় সওয়া হাত উঁচুতে আকাশে নিজের সামনেই ভগবান উপস্থিত রয়েছেন। অতিশয় সুন্দর ভগবানের চরণযুগল সুপক্ব নীলমণির মত উজ্জ্বলতা বিকিরণ করে অনন্ত সূর্য্যের ন্যায় প্রকাশিত হচ্ছে। চকচকে নখ-যুক্ত কোমল আঙ্গুল রয়েছে এবং তাতে স্বর্ণের রত্নজড়িত নুপূর শোভায়মান হচ্ছে। ভগবানের চরণযুগল ন্যায় ভগবানের জানু এবং উরু প্রভৃতি অঙ্গও নীলমণির ন্যায় পীতাম্বরের ভিতর থেকে দেদীপ্যমান হচ্ছে। আহা! অতি সুন্দর দীর্ঘ চারটি বাহু শোভিত হচ্ছে। উপরের দুই বাহুতে শঙ্খ, চক্র এবং নীচের দুই বাহুতে গদা এবং পদ্ম শোভিত হচ্ছে। চারটি বাহুতে কেয়ুর, (হাতের গয়না বিশেষ) কড়া প্রভৃতি অতি সুন্দর সুন্দর আভূষণ সুশোভিত হচ্ছে। আহা! অত্যন্ত বিশাল এবং পরম সুন্দর ভগবানের বক্ষস্থল, যার মধ্যভাগে শ্রীলক্ষ্মী এবং ভৃগুলতার চিহ্ন অঙ্কিত রয়েছে। নীলকমলের ন্যায় বর্ণযুক্ত ভগবানের গ্রীবা অতি সুন্দর এবং রত্নজড়িত মালা, কৌস্তভমনি এবং নানা ধরণের মুক্তা ও বিভিন্ন ধরণের সুন্দর সুন্দর স্বর্ণ সদৃশ দিব্য-গন্ধযুক্ত পুষ্প বৈজয়ন্তিমালায় সুশোভিত রয়েছে। অতি সুন্দর চিবুক, লাল ওষ্ঠ এবং মনোহর তীক্ষ্ণ নাসিকা রয়েছে, যার অগ্রভাগে মুক্তো ঝুলছে। ভগবানের দুই নেত্র কমলপত্রের ন্যায় বিশাল এবং নীলকমলের ন্যায় প্রস্ফুটিত রয়েছে। কানে রত্নজড়িত মকরাকৃত কুন্ডল এবং ললাটে শ্রীযুক্ত তিলক এবং মস্তকে মনোহর মণিমুক্তাযুক্ত কিরীট-মুকুট শোভায়মান হচ্ছে। আহা! ভগবানের অতুলনীয় মনোহর শ্রীমুখ পূর্ণিমার চন্দ্রকেও লজ্জিত করে মনকে হরণ করে নেয়। মুখমন্ডলের চারিদিক সূর্য্যের ন্যায় রশ্মি দেদীপ্যমান রয়েছে, যার প্রকাশে ভগবানের মুকুট প্রভৃতি সমস্ত আভূষণের রত্ন সহস্রাদিকগুণে চাচিক্যমান হচ্ছে। আহা! আজ আমি ধন্য, আমি ধন্য, যে এরূপ মৃদু হাস্যময়ী পরমানন্দময়মূর্ত্তি শ্রীহরির ধ্যানে করছি।

এরূপ ভাবনা করতে করতে যখন ভগবানের স্বরূপ ভালভাবে স্থিত হয়ে যায়, তখন প্রেমে বিহ্বল হয়ে সাধককে ভগবানের সেই মনোমোহন স্বরূপে চিত্ত স্থির করা উচিৎ। এরূপে ধ্যানের অভ্যাস করতে করতে যখন সাধকের নিজের এবং সংসারের তথা ধ্যানেরও জ্ঞান থাকবে না,

কেবলমাত্র এক মনোমোহন ভগবানের জ্ঞান অবশেষে থাকে, তখন সাধকের ভগবানে সমাধিলাভ হয়। এরূপ হলে সাধক তৎক্ষণাৎ ভগবানের বাস্তবিক তত্ত্ব জেনে যায় এবং ভগবান তখন তাঁর প্রেমের বশে প্রত্যক্ষ ভাবে সাকাররূপে প্রকট হয়ে তাকে নিজের দর্শন দিয়ে কৃতার্থ করতে বাধ্য হন।

ভগবান বলেছেন যে –

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবং বিধোঽর্জ্জুন।
জ্ঞাতুংদ্রষ্টুঞ্চ চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চপরন্তপ।।

(গীতা ১১/৫৪)

"হে শ্রেষ্ঠ তপোবিশিষ্ট অর্জুন, অনন্য ভক্তিদ্বারা তো এরূপ চতুর্ভূজরূপ বিশিষ্ট আমি প্রত্যক্ষ দেখা দিতে, তত্ত্বতঃ জ্ঞাত হতে এবং প্রবিষ্ট হতে অর্থাৎ একীভাবে প্রাপ্ত হতে শক্য হয়ে থাকি।"

এরূপে ভগবানের প্রত্যক্ষভাবে দর্শন লাভ করার পর সেই ভক্ত কৃতকৃত্য হয়ে যায়। তাঁর সকল দোষ নষ্ট হয়ে যায় এবং সে একজন পূর্ণ মহাত্মা হয়। এরপর তাঁর আর পূর্ণজন্ম হয় না।

গীতায় বলা আছে যে –

মামুপেত্য পুণর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধং পরমাং গতাঃ॥ (গীতা ৮/১৫)

"পরম সিদ্ধিপ্রাপ্ত মহাত্মাগণ আমাকে প্রাপ্ত হয়ে দুঃখের স্থানরূপ ক্ষণভঙ্গুর পূর্ণজন্ম প্রাপ্ত হন না।"

দ্বিতীয় বিধি

(২) নিজের হৃদয়াকাশে শেষনাগের শয্যায় শায়িত ভগবান বিষ্ণুর চিন্তন করতে করতে নিম্নলিখিত ভাবে মনে মনে তার স্বরূপ গুণের ভাবনা রেখে তাকে বারেবারে নমস্কার করা উচিৎ।

যার আকৃতি অতি শান্ত, যিনি নাগ শয্যায় শায়িত রয়েছেন, যার নাভিতে কমল, যিনি দেবতাদেরও ঈশ্বর এবং যিনি সমস্ত জগতের আধার, আকাশের ন্যায় যিনি সর্বব্যাপী, নীল মেঘের ন্যায় যার মনোহর

নীলবর্ণ, যার সকল অঙ্গ অতিশয় সুন্দর, যোগীদের দ্বারা যিনি ধ্যানদ্বারা প্রাপ্ত হন, যিনি সম্পূর্ণ লোকের অধিপতি, যিনি জন্মমরণরূপ ভয়ের বিনাশ করে থাকেন এমন সেই লক্ষ্মীপতি কমলনেত্র ভগবান বিষ্ণুকে আমি নত মস্তক হয়ে প্রণাম করছি।*

অসংখ্য সূর্য্যের ন্যায় যার প্রকাশ, অনন্ত চন্দ্র সদৃশ যার শীতলতা, কোটি অগ্নির ন্যায় যার তেজ, অসংখ্য মরুদ্‌গণের ন্যায় যার পরাক্রম, অনন্ত ইন্দ্রের ন্যায় যার ঐশ্বর্য্য, কোটি কামদেবের ন্যায় যার সুন্দরতা, অসংখ্য পৃথিবীর ন্যায় ক্ষমা, কোটি সমুদ্রের ন্যায় যার গম্ভীরতা, কোনও ভাবে যার কেউ কোন উপমা দিতে পারে না, বেদ এবং শাস্ত্র-ও যার স্বরূপের কেবলমাত্র কল্পনা করতে পেরেছেন, পুরোপুরি তো কেউ জানতেই পারেন নি, অনুপমেয় সেই ভগবান শ্রীহরিকে আমার বারংবার নমস্কার।

সচ্চিদানন্দময় শ্রীবিষ্ণু যিনি স্মিত হাস্য করছেন, যার সমস্ত অঙ্গের লোমকুপ থেকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বেদ বিন্দু বেরিয়ে পরম শোভায়মান হচ্ছে, এরূপ পতিতপাবন শ্রীহরি কে আমার বারেবারে নমস্কার,

এভাবে বারে বারে অভ্যাস করার ফলে চিত্ত শান্ত, নির্মল এবং প্রসন্ন হলে, তখন নিজের মনকে সেই শয্যাশায়ী ভগবান নারায়ণের ধ্যানে অচল করে দেওয়া উচিৎ।

---

* বন্দৌ বিষ্ণু বিশ্বধারা।
লোকপতি, সুরপতি, রমাপতি, সুভগ শান্ত্যাকার।
কমল-লোচন, কলুষ-হর, কল্যাণ-পদ-দাতার॥
নীল-নীরদ-বর্ণ, নীরও-নাভ, নত-অনুহার।
ভৃগুলতা-কৌস্তুভ-সুশোভিত হৃদয় মুক্তা হার॥
শঙ্খ-চক্র-গদা-কমলযুত ভুজ বিভূষিত চার।
পীত-পট-পরিধান পাবন অঙ্গ অঙ্গ উদার॥
শেষ-শয্যা-শায়িত যোগী-ধ্যান-গম্য, অপার।
দুঃখময় ভব-ভয়-হরণ, অশরণ-শরণ অধিকার॥ (পত্রপুষ্প)

পরমাত্মার সাকার এবং নিরাকার স্বরূপের ধ্যান করার আরও অনেক সাধন রয়েছে। এখানে তো কিছু দিগ্‌দর্শন করা হয়েছে মাত্র। পরমাত্মা এবং মহাপুরুষদের আশ্রয় নিয়ে সাধনায় তৎপর থাকলে এই বিষয়ে বিশেষ জ্ঞান হয়ে থাকে। সাকার ধ্যানের মধ্যে এখানে শুধু ভগবান বিষ্ণুর দু-প্রকারের ধ্যান সম্বন্ধে বলা হয়েছে। সাধকগণ নিজ-নিজ শ্রদ্ধা এবং প্রীতি অনুযায়ী এভাবে শ্রীরাম, কৃষ্ণ, শিব প্রভৃতি ভগবানের অন্যান্য স্বরূপেরও ধ্যান করতে পারেন। সকল সাধনায় ফল একই হবে।

একান্ত জায়গায় থেকে জনগণের মধ্যে কিংবা কাজকর্মের সম্পর্কে এলেও চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে সব সময় নিজের ইষ্টদেবের নামের জপ এবং স্বরূপের চিন্তন আগের মতোই করে যাওয়ার চেষ্টা করা উচিৎ। জীবনের এই মূল্যবান সময়ের এক ক্ষণও ভগবানের স্মরণ ব্যতীত ব্যয় হাওয়া উচিৎ নয়। জীবনে সদা-সর্বদা যেরূপ অভ্যাস হয়ে থাকে, অন্তিম সময়েও তারই স্মৃতি হয়ে থাকে, এবং অন্তিম সময়ের স্মৃতি অনুযায়ী তাঁর গতি হয়। সেইজন্য ভগবান গীতায় বলেছেন –

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্‌ ॥ (গীতা ৮/৭)

"কাজেই হে অর্জুন, তুমি সব সময়ে নিরন্তর আমাকে স্মরণ করো এবং যুদ্ধও করো। এভাবে আমাতে মন-বুদ্ধি অর্পিত তুমি নিঃসন্দেহে আমাকে প্রাপ্ত হবে।"

সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মার ধ্যান করার ফলে সাধকের হৃদয় ক্রমেই নির্মল হতে থাকে। সমস্ত রকমের চিন্তার বিনাশ হয়ে অন্তঃকরণে এ অলৌকিক শান্তির স্থাপনা হয়। চিত্ত একাগ্র এবং নিজের বশে হয়ে যায়। সাধনার বৃদ্ধির ফলে যেমন অন্তঃকরণের নির্মলতা এবং একাগ্রতা বাড়তে থাকে তেমন তেমন প্রকৃত আনন্দের উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হতে থাকে। প্রকৃত সুখের সাধক যখন সামান্যতমও অনুভব পায় তখন সেই সুখের সামনে তাঁর কাছে তিন ভুবনের রাজ্যের সুখও অত্যন্ত তুচ্ছ এবং

নগণ্য প্রতীত হতে থাকে। এই অবস্থায় সাধারণ ভোগজনিত মিথ্যা সুখ তাঁর কাছে কোন কিছুই নয়। বরঞ্চ ভোগ বিলাস প্রভৃতি সেই সাধকের সামনে প্রত্যক্ষভাবে বিনাশশীল, ক্ষণিক এবং দুঃখরূপ প্রতীত হতে থাকে। এই প্রকারের সাধনার ফলে সাধকের বৃত্তিসমূহ অতি শীঘ্রই সংসার থেকে বিরত হয়ে ভগবানের স্বরূপ অটল এবং স্থির হয়ে যায়। সাধক সেই প্রকৃত এবং অপার আনন্দ লাভ করে সদা-সর্বদার জন্য তৃপ্ত হয়ে যায়। তার দুঃখের আত্যন্তিক নিবৃত্তি হয়। এটাই মনুষ্য-জন্মের চরম লক্ষ্য।

প্রিয় পাঠকগণ ! আমাদের এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস রাখা উচিৎ যে সচ্চিদানন্দঘন পূর্ণব্রহ্ম সর্বশক্তিমান আনন্দকন্দ ভগবানের সাক্ষাৎ করাই মনুষ্য-জীবনের পরম কর্ত্তব্য। ইহাই ইহলোক এবং পরলোকের সবচেয়ে মহান, নিত্য এবং সত্য সুখ। ইহা ছাড়া অন্যান্য যে সব সাংসারিক সুখ প্রতীত হয়ে থাকে তা বাস্তবে কোন সুখই নয়। কেবল মোহবশে তাহাতে সুখের মিথ্যা প্রতীতি হয়, আসলে তা সমস্তই দুঃখরূপ। যোগদর্শনে বলা হয়েছে –

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুণবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ । (যোগদর্শন ২/১৫)

সংসারের সকল বিষয় সম্পর্কিত সুখ পরিণাম, তাপ, সংস্কার এবং সাংসারিক দুঃখের সঙ্গে জড়িত থাকার জন্য এবং সাত্ত্বিক, রাজস তথা তামস গুণের বৃত্তিসমূহের পরস্পর বিরোধী হওয়ার জন্য বিবেকী পুরুষগণের কাছে তা কেবলই দুঃখময়।

অতএব এই ক্ষণিক, বিনাশশীল এবং কৃত্রিম সুখের সর্বথা পরিত্যাগ করে আমাদের অতি শীঘ্রই তৎপর হয়ে সেই সত্যিকারের সুখ-স্বরূপ পরমাত্মার প্রাপ্তির সাধনায় উৎসাহ এবং দৃঢ়ভাব রেখে লেগে পড়া উচিৎ।

***

॥ শ্রী হরিঃ ॥

ঘরে ঘরে ভগবানের পূজো

ভগবান সাকাররূপে প্রত্যক্ষ ভাবে প্রকট হয়ে কখনও আমাকে দর্শন দিয়েছেন– এরূপ বলতে অসমর্থ হলেও আমি খুব জোর দিয়ে বিশ্বাস করাতে পারি যে যদি কেউ ভগবদ্-পরায়ণ হয়ে নিস্কাম ভাবে ভগবানের ভক্তি করে, তবে ভগবান তাকে প্রত্যক্ষ দর্শন দিতে বাধ্য। ভগবান স্বয়ং বলেছেন –

ভক্ত্যা ত্বনন্যয়া শক্য অহমেবংবিধোঽর্জুন ।
জ্ঞাতুং দ্রষ্টুঞ্চ তত্ত্বেন প্রবেষ্টুঞ্চ পরংতপ ।।

(গীতা ১১/ ৫৪)

"হে অর্জুন ! অনন্য ভক্তি দ্বারা তো এই প্রকার চতুর্ভূজরূপবিশিষ্ট আমি প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা দিতে, তত্ত্বতঃ জানতে এবং প্রবিষ্ট হতে অর্থাৎ একীভাবে প্রাপ্ত হতে সমর্থ হয়ে থাকি।

কাজেই ইহা প্রমাণীত হল যে, অনন্য ভক্তিদ্বারা ভগবানের প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ হতে পারে। অনন্য ভক্তি লাভের জন্য অভ্যাসের প্রয়োজন। যদি সকল সময় ভগবানের নামের জপ এবং হৃদয়ে তাকে স্মরণ রেখে সংসারের সমস্ত কাজকর্ম (ব্যবহার) তাঁরই জন্য করা হয়, তাহলে পরমাত্মায় অনন্য ভক্তি জন্মে। অনন্য ভক্তিযুক্ত স্বয়ং যে পবিত্র, এতে বলার কি আছে, কিন্তু সে তাঁর ভক্তির ভাবের দ্বারা সমগ্র জগৎকে পবিত্র করতে পারে। যদি ঘরের একজনেরও ভক্তিদ্বারা পরমাত্মার সাক্ষাৎকার হয় তাহলে তাঁর সমস্ত কুল পবিত্র বলে মানা হয়।

বলা হয়েছে যে –

কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন ।
অপারসংবিৎসুখসাগরেঽস্মিন্ লীনং পরে ব্রহ্মনি যস্য চেতাঃ ॥

(স্কন্দপুরাণ মাহে খ. কৌ. খ. ৫৫/১৪০)

"যার চিত্ত সেই অপার বিজ্ঞানানন্দঘন সমুদ্ররূপ পরব্রহ্ম পরমাত্মায় বিলীন হয়েছে, তাঁর দ্বারা কুল পবিত্র, মাতা কৃতার্থ এবং পৃথিবী পূর্ণবতী হয়ে থাকে।"

ভগবান নারদ বলেছেন –

কণ্ঠাবরোধরোমাঞ্চাশ্রুভিঃ পরস্পরং লপমানা পাবযন্তি কুলানি পৃথিবীং চ।
তীর্থীকুর্বন্তি তীর্থানি সুকর্মীকুর্বন্তি কর্মাণি সচ্ছাস্ত্রীকুর্বন্তি শাস্ত্রাণি ।
(নারদ ভক্তিসূত্র ৬৮–৬৯)

"এরূপ ভক্তি কণ্ঠাবরোধ, রোমাঞ্চিত এবং অশ্রুযুক্ত নেত্র দ্বারা পরস্পর সম্ভাষণ দ্বারা নিজের কুল এবং পৃথিবীকে পবিত্র করে থাকেন। তাঁরা তীর্থসমূহকে সুকর্ম এবং শাস্ত্রকে সৎ-শাস্ত্রে পরিণত করে থাকেন। তাদের ভক্তির আবেশে বায়ুমন্ডল শুদ্ধ হয় এবং তাঁর সম্বন্ধের সমস্ত কিছুই পবিত্র হয় তথা এরূপ পুরুষের অবস্থানের ফলে পৃথিবী পবিত্র হয়। তাঁরা যে তীর্থে বসবাস করেন তাহাই সুতীর্থ, তাঁরা যে কর্ম করেন তাহাই সুকর্ম এবং যে শাস্ত্রের উপদেশ করেন তহাই সদ্‌শাস্ত্রে পরিণত হয়।

মোদন্তে পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি ।
(নারদভক্তিসূত্র ৭১)

"এরূপ ভক্তগণের আবির্ভাব দেখে তাদের পিতৃপুরুষগণ নিজেদের উদ্ধারের আশায় আহ্লাদিত হন, দেবতাগণ তাদের দর্শন করে নৃত্য করতে থাকেন, মাতৃভূমি নিজেকে সনাথা অনুভব করতে থাকেন।"

পদ্মপুরাণেও এরূপ বাক্য উধৃত রয়েছে –

আস্ফোটয়ন্তি পিতরো নৃত্যন্তি চ পিতামহাঃ ।
মদ্বংশে বৈষ্ণবো যাতঃ স নস্ত্রাতা ভবিস্যতি ॥

পিতৃ-পিতামহগণ নিজের বংশে ভগবদ্ভক্তের আবির্ভাব জেনে সে আমাদের উদ্ধার করবে, এরূপ ভেবে প্রসন্ন হয়ে নৃত্য করতে থাকেন, এ ছাড়াও আরও অনেক প্রমাণ রয়েছে। প্রকৃতপক্ষে এরূপ পুরুষের হৃদয় প্রত্যক্ষভাবে তীর্থ এবং তাঁর গৃহ তীর্থস্বরূপ হয়ে যায়। অতএব সকলের উচিৎ তারা যেন পরমাত্মার অনন্য ভক্তির জন্য সাধনা করেন। এই সাধনায় ভগবানে মন নিয়োজিত করতে হয় এবং নিজের সময়কে

সাধনায় ভগবানে মন নিয়োজিত করতে হয় এবং নিজের সময়কে ভগবদ্-সেবায় নিয়েজিত করার অভ্যাস করতে হয় । এর জন্য যদি প্রতিটি গৃহে একটি করে ভগবানের মূর্ত্তি কিংবা চিত্র থাকে-মূর্ত্তি বা চিত্র এরূপ হওয়া উচিত যাতে তাতে মন আকৃষ্ট হয় এবং নিত্যপ্রতি নিয়মপূর্বক তাঁর পূজো করা হয় । এরূপ করলে সময় এবং মন দুটোকেই পরমাত্মায় নিয়োজিত করার অভ্যাস অনায়াসে হতে পারে ।

ভগবানের অনেক মন্দির রয়েছে, মন্দিরে যাওয়া অতি উত্তম । কিন্তু প্রথমতঃ সকল স্থানে মন্দিরে নাও থাকতে পারে এবং দ্বিতীয়তঃ সকলের দ্বারা সেখানে গিয়ে নিজের হাতে ঠাকুরের সেবা-পুজো করা সম্ভব নয় । অধিকন্তু আজকাল সব মন্দিরের ব্যবস্থাও প্রায় ঠিক থাকে না । চতুর্থতঃ ঘরের সকল স্ত্রী, পুরুষ, বালক-বৃদ্ধ মন্দিরে নিয়মিতভাবে যেতেও পারেন না । কিন্তু ঘরে ধাতুর বা পাষাণের ভগবানের মূর্ত্তি বা চিত্র সকলেই রাখতে পারেন এবং নিজের নিজের মত অনুযায়ী কিংবা 'প্রেম-ভক্তি প্রকাশ' পুস্তকে বর্ণিত বিধি অনুযায়ী তাঁর পুজো সকলেই করতে পারেন । ঘরে ঠাকুরের পুজো করা হলে পুজোর সামগ্রী জোগাড় করতে, পুষ্পের মালা গাঁথা প্রভৃতি কাজে অনেকটা সময় এক প্রকারে ভগবদ্-চিন্তনে লেগে থাকে । ছোট ছোট ছেলে মেয়েরাও একাজে খুব আনন্দ পান এবং এ সমস্ত শিখে যান । অল্প বয়স থেকেই তাদের হৃদয়ে ভগবদ্ সম্বন্ধীয় আগ্রহ জন্মাতে থাকে । বৃথা খেলা বা তামাশা ভূলে গিয়ে তাদের চিত্ত এইরূপ সৎকার্য্যে প্রফুল্লিত হতে থাকে । শিশু বয়সে সংসারের যেরূপ ছাপ পড়ে তা পরে গিয়ে খুবই কাজে লাগে । ভক্তিমতী মীরা প্রভৃতির জীবনে এরূপ অল্প-বয়সের মূর্ত্তিপূজার সংস্কারের ফলেই পরবর্ত্তী জীবনে ভক্তির বিকাশ হয়েছিল । যারা নিজের নিজের গৃহে এরূপ কার্য্য প্রারম্ভ করেছেন ভগবানে তাদের শ্রদ্ধা, ভক্তি এবং প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে ।

অতএব আমি সকলকে, এমন কি যারা বেদ, শাস্ত্র এবং পুরাণ প্রভৃতিকে মানেন না তাদের নিকটেও বিনীত ভাবে এই প্রার্থনা করছি যে যদি তাঁরা মনে করেন তাহলে তাদের এই কার্য্য শীঘ্রই আরম্ভ করে দেওয়া উচিত । ভগবানের পূজার সাথে সাথে ঘরের সকল মহিলা,

ভগবানের পূজন একজনও করতে পারেন, কিন্তু পূজা করার অধিকার যেন সকলের থাকে। স্বামী উপস্থিত না থাকলে স্ত্রী পূজা করতে পারেন কিংবা স্ত্রীর অনুপস্থিতিতে স্বামী তা করতে পারেন। তাৎপর্য এই যে ভগবদ্-পূজনে নিত্য প্রতি কিছু সময় যেন অবশ্যই লাগানো হয়। এর ফলে ঘরে শ্রদ্ধা-ভক্তির বিকাশ হতে পারে। যাদের পক্ষে সম্ভব তাঁরা যদি বাহ্যিক পূজার সঙ্গে সঙ্গে * নিজের নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে কিংবা "প্রেমভক্তি-প্রকাশ" পুস্তকে বর্ণনা অনুযায়ী ভগবানের মানসিক পূজাও যেন করেন, কেননা আন্তরিক পূজার -

গুরুত্ব আরও অধিক। অনুগ্রহ করে একটিবার আপনারা আমার এই প্রার্থনা অনুযায়ী এরূপ পূজন-ভক্তির প্রারম্ভ করে এর ফল প্রত্যক্ষ করুন। আপনাদের বিশ্বাস করাবার জন্য এর অধিক আমার কাছে আর কোন উপায় নেই।

○○○○

* "প্রেমভক্তি প্রকাশ" নামক নিবন্ধ এই পুস্তকেই অন্যত্র রয়েছে। গীতা প্রেস, গোরক্ষপুর থেকে এই নিবন্ধ আলাদাভাবে পুস্তকাকারে প্রকাশীত হয়েছে।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

বৈরাগ্য

বৈরাগ্যের মহত্ত্ব

কল্যাণ প্রাপ্তির অভিলাষী প্রতিটি পুরুষেরই বৈরাগ্য -সাধনার পরম আবশ্যকতা রয়েছে। বৈরাগ্য ছাড়া আত্মার উদ্ধার কখনও হতে পারে না। সত্যিকারের বৈরাগ্যের ফলে সাংসারিক ভোগ-পদার্থের প্রতি উপরতি জন্মে। উপরতির ফলে পরমেশ্বরের স্বরূপের যথার্থ ধ্যান হয়। ধ্যানের ফলে পরমাত্মার স্বরুপের বাস্তবিক জ্ঞান হয় এবং জ্ঞানের ফলে উদ্ধার হয়। যারা শুধুমাত্র জ্ঞান-সম্পাদন করে মুক্তিতে বৈরাগ্য এবং উপরতির কোন আবশ্যকতা মনে করেন না, তাদের মুক্তি বাস্তবিক মুক্তি না হয়ে তা কেবলই ভ্রম হয়ে থাকে। বৈরাগ্য-উপরতি হীন জ্ঞান বাস্তবিক জ্ঞান নয়, তা শুধুই বাচিক এবং শাস্ত্রীয় জ্ঞান। শুধু এরূপ জ্ঞানে মুক্তি হয় না, উপরন্তু আরও কঠিন বন্ধন হয়ে থাকে। এজন্য শ্রুতি তে রয়েছে –

অন্ধন্তমঃ প্রবিশন্তি যেহবিদ্যামুপাসতে।
ততো ভূয় ইব তে তমো য উ বিদ্যাযাংরতাঃ ॥

(ঈশ. ম. ৯)

"যারা অবিদ্যার উপাসনা করে তাঁরা অন্ধকারে প্রবেশ করে এবং যারা বিদ্যার রত তাঁরা এর চেয়েও অধিক অন্ধকারে প্রবেশ করে থাকে।" এরূপ বাচিক জ্ঞানী পুরুষ নির্ভয়ে বিষয়-ভোগে প্রবৃত্ত হয়, সে পাপকে পাপ বলেও মনে করে না, কাজেই সে বিষয়রূপী পাঁকে ফেঁসে গিয়ে পতিত হয়। এরূপ লোকের দিকে লক্ষ্য করেই বলা হয়েছে যে -

'ব্রহ্মজ্ঞান জান্যো নহীঁ, কর্ম দিয়ে ছিটকায়।
তুলসী ঐসী আত্মা সহজ নরকমঁহ জায় ॥'

"অর্থাৎ ঠিক ভাবে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ না করেই যারা কর্ত্তব্য কর্মের ত্যাগ করেন তারা সহজেই নরকগামী হন।"

আসলে জ্ঞানের আড়ালে ভয়ংকর অজ্ঞান গ্রহণ করা হয়। অতএব যদি যথার্থ কল্যানের ইচ্ছা থাকে তাহলে সাধকের সত্যিকারের দৃঢ় বৈরাগ্য অর্জন করা উচিত। কোনও বিশেষ ধরনের পোশাক বা কাপড় গ্রহন করলেই বৈরাগ্য বলে ধরা যায় না। কোনও কারণে বা মূঢ়তাবশে স্ত্রী, পুত্র, পরিবার, অর্থ প্রভৃতি ত্যাগ করা, গেরুয়া কাপড় ধারন করা, মাথা ন্যাড়া করে নেওয়া, জটধারী হওয়া বা অন্য কোন বাহ্যিক চিহ্ন ধারন করলেই বৈরাগ্য বলে ধরা যাবে না। মন যদি বিষয় সমূহে রমন করতে থাকে এবং উপর থেকে এরূপ বৈরাগ্যের চিহ্ন ধারণ করে সাধু সাজা হয় তাহলে তো উহা দম্ভ। ভগবান বলেছেন -

কর্মেন্দ্রিয়ানি সংযম্য য আস্তে মনসা স্মরণ্।
ইন্দ্রিয়ার্থান্ বিমূঢ়াত্মা মিথ্যাচারঃ স উচ্যতে ॥

(গীতা ৩/৬)

"যে মূঢ়বুদ্ধি পুরুষ কর্মেন্দ্রিয় সমূহকে হঠকারিতা দ্বারা অবরোধ করে ইন্দ্রিয়-ভোগসমূহকে মন দ্বারা স্মরন করতে থাকে, সে মিথ্যাচারী অর্থাৎ দাম্ভিক বলে কথিত হয়।"

সাম্প্রতিক কালে দম্ভের বহু বিস্তার হচ্ছে। লোককে প্রতারনা করার জন্য কেউ মৌনব্রত অবলম্বন করছে, কেউ আসন গেড়ে বসে থাকছে, কেউ ভস্ম মেখে রয়েছে, কেউ চুল রাখছে, কেউ অগ্নির সন্নিকটে বসে থাকছে, "উদরনিমিত্তং বহুকৃতবেশঃ।"

এদের মধ্যে আসল বৈরাগ্য কোনটাই নয়। আমার বলার তাৎপর্য এই নয় যে, আমি স্ত্রী, পুত্র, কুটুম্ব, অর্থ, শিখা, পৈতে প্রভৃতির স্বরূপ থেকে ত্যাগ করাকে মন্দ বলে মনে করি। আমার বলার তাৎপর্য এও নয় যে মৌনব্রত গ্রহণ করা, আসনে বসা, ভস্ম মাখা, চুল রাখা বা মুন্ডন করানো প্রভৃতি কাজ অশাস্ত্রীয় বা নিন্দনীয়। আমার বলার উদ্দেশ্য এও নয় যে যারা গৃহ ত্যাগ করে এরূপ বেশভূষা ধারন করেছেন তারা সবাই ভণ্ড। আমার উপর্যুক্ত কথন কারও নিন্দা বা

কাউকে ঘৃণা করার জন্য লেখা হয়েছে এরূপ মনে করা ঠিক হবে না। এখানে আমার অভিপ্রায় তাদের ক্ষেত্রে প্রয়োজ্য যারা বেরাগ্যের নামে নিজে পুজিত হবার জন্য কিংবা জনগণের উপর নিজের দাপট (প্রভাব) খাটিয়ে তাদের প্রতারনার জন্য নানাধরনের বেশ-ভূষা ধারন করে। যে সাধক সংযম, অন্তঃকরণের শুদ্ধি কিংবা সাধনায় বৃদ্ধির জন্য এরূপ করেন তাদের নিন্দা করা হয়নি। ভগবানও মিথ্যাচারী তাদেরই বলেছেন যারা উপর থেকে সংযমের পোষাক-ধারন করে মনে মনে বিষয়সমূহের ভজনা (কামনা) করে। যে পুরুষ চিত্তের বৃত্তিসমুহকে ভগবদ্ চিন্তনে নিযুক্ত করে সত্যিকারের বৈরাগ্য বৃত্তিদ্বারা বাহির-ভিতরের ত্যাগ করে তাদের তো সকল শাস্ত্রেই প্রশংসা করা হয়েছে।

বৈরাগ্য খুবই রহস্যের বিষয়, এর বাস্তবিত তত্ত্বঃ বৈরাগ্যযুক্ত মহাপুরুষ-ই জানেন। বৈরাগ্যের সঠিক ভাব তাদের মধ্যেই দেখা যায়, যার জীবনমুক্ত মহাত্মা বা যারা পরমাত্মা-রসে ডুবে বিষয় রস থেকে নিজেকে সর্বথা মুক্ত করে নিয়েছেন।

ভগবান বলেছেন –

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দিহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোহপ্যস্য পরং দৃষ্টা নিবর্ত্ততে ॥

(গীতা ২/ ৫৯)

"ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয়ের অ-গ্রহনকারী (অর্থাৎ যে ইন্দ্রিয় দ্বারা বিষয় গ্রহণ করছে না এরূপ) পুরুষের শুধু বিষয়গুলি নিবৃত্ত হয় বটে তথাপি রাগ নিবৃত্ত হয় না। কিন্তু এই জীবন্মুক্ত পুরুষের রাগও পরমাত্মার সাক্ষাৎ করে নিবৃত্ত হয়ে যায়।"

এখন আমরা বৈরাগ্যের স্বরূপ, বৈরাগ্য প্রাপ্তির উপায়, বৈরাগ্য প্রাপ্ত পুরুষের লক্ষণ (চিহ্ন) এবং এর ফল সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করছি। সাধনকালে বৈরাগ্যের দুইটি শ্রেণী হয়ে থাকে, যাকে গীতায় বৈরাগ্য এবং দৃঢ়বৈরাগ্য, যোগদর্শনে বৈরাগ্য এবং পরবৈরাগ্য এবং বেদান্তে বৈরাগ্য এবং উপরতি নামে বলা হয়েছে। যদিও উপর্যুক্ত তিনটির মধ্যে শব্দ এবং ধ্যেয় বস্তুতে পরস্পরে কিছু ভেদ রয়েছে কিন্তু

অধিকাংশ ক্ষেত্রে এগুলির একই অর্থ বোঝায়। লক্ষ্য বস্তুর দৃষ্টিকোন থেকে এখানে এই তিনটির উল্লেখ করা হয়েছে।

বৈরাগ্যের স্বরূপ

ভাষ্যকারগণ যোগদর্শনে যতমান, ব্যতিরেক, একেন্দ্রিয় এবং বশীকার- বৈরাগ্যের এই চারটি সংজ্ঞা করেছেন এবং এর বিস্তৃত ব্যাখ্যাও করেছেন। সেই ব্যাখ্যা সর্বথা যুক্তিযুক্ত এবং গ্রহণীয়। তবুও এখানে সংক্ষেপে নিজের সাধারন বুদ্ধি অনুসারে বৈরাগ্য সম্বন্ধে কিছু বলার চেষ্টা করা হচ্ছে। যাতে সহজভাবে সকলেই বিষয়টি বুঝতে পারেন।

ভয় থেকে উৎপন্ন বৈরাগ্য :- সংসারের ভোগ উপভোগ করলে পরিণামে নরকে যেতে হবে। কেননা ভোগ করতে গেলে সংগ্রহের আবশ্যকতা রয়েছে, সংগ্রহের জন্য প্রারম্ভ করা আবশ্যক, প্রারম্ভ করলে পাপ হয় এবং পাপের ফল হল নরক বা দুঃখ। এভাবে ভোগ লাভ করার উপায়ে পাপ এবং পাপের পরিণাম দুঃখ, এরূপ জেনে, ভয় পেয়ে বিষয় সমূহের যে ত্যাগ করা হয় তাকে ভয় থেকে উৎপন্ন বৈরাগ্য বলা হয়।

বিচার বিবেচনা দ্বারা উৎপন্ন বৈরাগ্য :- যে পদার্থসমূহকে ভোগ্য মনে করে তাদের সঙ্গ দ্বারা আনন্দের (সুখের) ভাবনা করা হয়ে থাকে, যা প্রাপ্ত হলে সুখের প্রতীতি (ধারনা) হয়ে থাকে, আসলে তা ভোগ নয়, সুখের সামগ্রীও নয় এবং তাতে সুখও নেই। দুঃখপূর্ণ পদার্থে দুঃখের মধ্যেই বিচার বিবেচনা না করেই সুখের কল্পনা করা হয়েছে। কাজেই তা সুখরূপে ভাসমান হচ্ছে, আসলে উহা দুঃখ এবং দুঃখেরই কারণ। ভগবান বলেছেন যে -

যে হি সংস্পর্শজা ভোগা দুঃখযোনয় এব তে।
আদ্যন্তবন্তঃ কৌন্তেয় ন তেষু রমতে বুধঃ ॥
(গীতা ৫ / ২২)

"এই ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন যে সকল ভোগ আছে, সে সব যদিও বিষয়ী পুরুষগণের নিকট সুখরূপে প্রতিভাসিত হয় তথাপি নিঃসন্দেহরূপে তাহা দুঃখেরই হেতু হয়ে থাকে এবং উহা আদি-অন্ত

বিশিষ্ট অর্থাৎ অনিত্য । কাজেই হে অর্জুন ! বুদ্ধিমান্ বিবেকী পুরুষ তাতে রত হন না ।"

অনিত্য বলে যদি প্রতীত না হয়, তাহলেও ক্ষণভঙ্গুর মনে করে তা সহ্য করা উচিত । ভগবান বলেছেন -

মাত্রাস্পর্শাস্তু কৌন্তেয় শীতোষ্ণসুখদুঃখদাঃ ।
আগমাপায়িনোহনিত্যাস্তাংস্তিতিক্ষস্ব ভারত ॥
(গীতা ২ / ১৪)

হে কুন্তীপুত্র ! শীত, উষ্ণ এবং সুখ-দুঃখদায়ী ইন্দ্রিয় এবং বিষয়ের সংযোগ সকল তো ক্ষণভঙ্গুর এবং অনিত্য । সেইজন্য হে ভরতবংশীয় অর্জুন তুমি ইহা সহ্য কর । এর পরের শ্লোকে এই সহনশীলতার ফল বলেছেন যে -

যং হি ন ব্যথয়ন্ত্যেতে পুরুষং পুরুষর্ষভ ।
সমদুঃখসুখং ধীরং সোহমৃতত্বায় কল্পতে ॥
(গীতা ২ / ১৫)

সুখদুঃখকে সমান মনে করে এরূপ যে ধীর পুরুষকে ইন্দ্রিয়ের বিষয় সমূহ ব্যাকুল করে না সে মোক্ষ প্রাপ্তির যোগ্য হয় । এরপরে ভগবান স্পষ্ট করে বলেছেন যে, বিচার বিবেচনা দ্বারা যা অসৎ বলে জানা যায়, বাস্তবিক পক্ষে তার অস্তিত্ব-ই নেই । ইহাই তত্ত্বদর্শীদের দ্বারা নির্নীত সিদ্ধান্ত ।

নাসতো বিদ্যতে ভাবো নাভাবো বিদ্যতে সতঃ ।
উভয়োরপি দৃষ্টোহন্তস্ত্বনযোস্তত্ত্বদর্শিভিঃ ॥
(গীতা ২ / ১৬)

"হে অর্জুন অসৎ বস্তুর তো অস্তিত্ব-ই নেই এবং সৎ বস্তুর অভাব নেই, এরূপ এই উভয়েরই তত্ত্ব জ্ঞানী পুরুষ দ্বারা দৃষ্ট হইয়াছে ।"

এভাবে বিবেকদ্বারা উৎপন্ন, বৈরাগ্যকে বিচার-বিবেচনা দ্বারা উৎপন্ন বৈরাগ্য বলা হয় ।

সাধনার দ্বারা হওয়া বৈরাগ্যঃ- যখন মানুষ সাধনা করতে করতে প্রেমে বিহ্বল হয়ে ভগবানের তত্ত্ব অনুভব করতে থাকে, তখন তাঁর মনে ভোগের প্রতি স্বতঃ বৈরাগ্য উৎপন্ন হয় । সেই সময়

সংসারের সমস্ত ভোগ্য পদার্থ তাঁর কাছে প্রত্যক্ষভাবে বিঘ্নরূপে প্রতীত হতে থাকে, সমস্ত বিষয়সমূহ স্পষ্টরূপে ভগবদ্-প্রাপ্তির অন্তরায় বলে মনে হয়।

যে স্ত্রী পুত্র প্রভৃতি অজ্ঞানীর দৃষ্টিতে রমনীয়, সুখপ্রদ বলে প্রতীত হয়, উহা-ই তাঁর দৃষ্টিতে ঘৃনাস্পদ এবং দুঃখদায়ক বলে মনে হতে থাকে।* অর্থ, রূপ যৌবন, গাড়ী, বাড়ি, পদ-গৌরব, রূপ-লাবন্য, বিলাসিতা প্রভৃতিতে তাঁর বিষের ন্যায় বুদ্ধি হয়ে যায় এবং এদের সঙ্গ তাঁর নিকটে প্রতক্ষ্য কারাগরের চেয়েও অধিক বন্ধনকারক, দুঃখদায়ী এবং ঘৃনাস্পদ বলে মনে হতে থাকে। মান-বড়াই, পুজা প্রতিষ্ঠা, সৎকার, সম্মান প্রভৃতিকে সে এরূপ ভয় পেয়ে থাকে যেরূপ সাধারন মানুষ সিংহ-ব্যাঘ্র, ভূত-প্রেত কিংবা যমদূতকে ভয় পায়। যেখানে কিঞ্চিৎ মাত্রও সৎকার, পূজো বা সম্মান পাবার সম্ভাবনা থাকে, সেখানে যেতে তার যথেষ্ট ভয় হয়ে থাকে। কাজেই এরূপ স্থানে যাওয়া সে একবারেই এড়াতে চায়। যে প্রশংসা, প্রতিষ্ঠা, মান সম্মাণ পেলে সাধারন মানুষ আহ্লাদিত হয়ে পড়ে, ওসবে তার লজ্জা, কুণ্ঠা এবং দুঃখ হয়, এতে সে নিজের অধঃপতন মনে করে। আমরা অপবিত্র এবং ঘৃণিত বস্তুর ক্ষেত্রে য়েরূপ কুণ্ঠিত হই, সেরূপে সে মান-বড়াইকে ঘৃনা করে। কাউকে খুসী করতে বা কারও চাপে সে মান-বড়াই স্বীকার করে না। তাঁর নিকটে উহা প্রতক্ষ্য নরকতুল্য মনে হয়। যারা তাকে মান সম্মান দিয়ে সম্মানীত করতে চায় তাদের সম্বন্ধে সে এরূপ মনে করে যে আমার এই সিদে সাদা বন্ধুরা আমার হিত কামনায় বিপরীত আচরন করছে। **'मीठे साजन शत्रु बराबर'** এই উক্তি চরিতার্থ করছে। কাজেই তাদের ক্ষনিক প্রসন্নতার জন্যও সে তাদের এই আগ্রহ মেনে নেয় না। সে এটা জানে যে, এতে এদের কোনও লাভ নেই কিন্তু আমার অধঃপতন হবে। পক্ষান্তরে ইহা স্বীকার না করলে কোন দোষ বা হিংসা নেই এবং এর জন্য এদের এই চাপের কাছে নতি স্বীকার করা ধর্মসম্মত-ও নয়।

---

* আমার এরূপ কথনের ফলে কেউ যেন এরূপ মনে না করেন যে স্ত্রী পুত্রের সঙ্গে ব্যবহারে ঘৃণা করা উচিত। গৃহস্থের উচিত সকলের সঙ্গে যথোচিত প্রেমপূর্ণ ব্যবহার করেও মনে যেন বৈরাগ্যের ভাবনা বজায় রাখা হয়।

ধর্ম তাকেই বলা হয় যা ইহ-লোক এবং পরলোকে কল্যাণকারী। যা লোক-পরলোকে অহিত করে তা কল্যাণযুক্ত কর্ম নয় বরং তা অকল্যাণকারী। পুরস্কার নয়, ভয়ানক বিপদ। মাতা-পিতা মোহবশে ছেলের ক্ষণিক সুখের জন্য তাকে কুপথ্য দিয়ে পরে ছেলের সঙ্গে নিজেও দুঃখী হন, এরূপে আমার এই সিদে-সাদা বন্ধুরা তত্ত্ব-না জেনে আমাকে পাপের পথে ফেলতে চাইছে। বুদ্ধিমান বালক যদি মাতা-পিতার এরূপ দুরাগ্রহ না মানে তাহলে সে দোষী নয়। পরিণাম দেখে কিংবা চিন্তা ভাবনা করলে মাতা পিতাও অসন্তুষ্ট হন না। কাজেই এরূপে চিন্তা ভাবনা করলে এই বন্ধুগণও অসন্তুষ্ট হবেন না। এরূপে সে কাহারও প্রদত্ত কোন মান সম্মান স্বীকার করে না। সে ভাবে যে ইহা স্বীকার করলে আমি অনাথের ন্যায় মারা পড়ব। অতখানি ত্যাগ আমার মধ্যে নেই যে, অন্যের সামান্য খুসীর বিনিময়ে আমি আমার সর্বনাশ করে ফেলি। যদি ত্যাগ বুদ্ধি থাকে তবুও বিবেক এরূপ ত্যাগকে বুদ্ধিমত্তা বা উত্তম বলা হয় না। যে সকল সরল হৃদয় বন্ধুরা অজ্ঞানবশতঃ সাধককে এরূপ মান বড়াই স্বীকার করিয়ে তাঁদের ভয়ংকর অন্ধকার এবং দুঃখ গহ্বরে নিক্ষেপ করে, ঈশ্বর তাদের সদ্‌বুদ্ধি প্রদান করুণ, যাতে তাঁরা সাধককে এভাবে বিপত্তির জলাবর্তে না ফেলেন।

সাধনার দ্বারা এরূপ বিবেকযুক্ত ভাব দ্বারা ভোগসমূহ থেকে যে বৈরাগ্য জম্মে তাহাকে সাধনা দ্বারা হওয়া বৈরাগ্য বলা হয়। এই ধরনের বৈরাগী পুরুষের নিকট স্ত্রী, পুত্র, মান, বড়াই, ধন, ঐশ্বর্য্য প্রভৃতি সেইরূপ কান্তিহীন এবং নীরস প্রতীত হয়, যেরূপ প্রকাশময় সূর্য্যের সম্মুখে চন্দ্রমা প্রতীত হয়।

পরমাত্ম-তত্ত্বের জ্ঞানের ফলে হওয়া বৈরাগ্য :- যখন সাধকের পরমাত্মা-তত্ত্বের উপলব্ধি হয়ে যায়, তখন তো সংসারের সম্পূর্ণ পদার্থ তাঁর নিকটে স্বতঃ রসহীন এবং মায়ামাত্র বলে প্রতীত হতে থাকে। তখন তাঁর কাছে ভগবদ্ তত্ত্বের অতিরিক্ত কারও মধ্যে অন্য কিছুই সারযুক্ত বলে মনে হয় না। যেমন মরীচিকার জলকে মরীচিকা বলে জেনে গেলে উহা আর জল বলে দেখায় না, যেমন ঘুম থেকে

জেগে গিয়ে স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে জেনে গেলে স্বপ্নের সেই সংসারের চিন্তন করলেও তাঁর কোন সত্তা থাকে না, ঠিক সেরূপেই তত্ত্বজ্ঞানী পুরুষের কাছে জাগতিক পদার্থে সারযুক্ত বা সত্তার কোন প্রতীতি হয় না। চতুর যাদুকর দ্বারা নির্মিত সুন্দর বাগানে অন্য সকলেই মোহগ্রস্থ হন, কিন্তু তাঁর মর্ম জানে এমন বুঝরা তাকে মায়াময় এবং অসার জেনে ওতে মোহিত হয় না (হ্যাঁ, নিজ মায়াপতি মালিকের লীলাখেলা দেখে অবশ্যই আহ্লাদিত হয়)। ঠিক এইভাবে এই শ্রেণীর বৈরাগী পুরুষ বিষয় ভোগে মোহগ্রস্থ হন না।

এরূপ বৈরাগ্যযুক্ত পুরুষের যখন সাংসারিক কোনও ভোগ্য পদার্থে আস্থা-ই থাকে না, তাহলে তাতে রমণীয়তা বা সুখের ভ্রান্তি তো হতেই পারে না। এরূপ পুরুষ-ই পরমাত্মার পরমপদের অধিকারী হন। একেই পরবৈরাগ্য বা দৃঢ় বৈরাগ্য বলা হয়।

বৈরাগ্য লাভের উপায়

উপর্যুক্ত কথনে ভাবনা-চিন্তা করে সাধকের উচিত সে যেন প্রারম্ভেই বিষয়সমূহকে পরিণামে ক্ষতিকর মেনে নিয়ে ভয়প্রদ বা দুঃখজনক ভেবে ঘৃনায় উহা ত্যাগ করে। বারেবারে বৈরাগ্যের ভাবনা করলে, ত্যাগের গুরুত্ব সমন্ধে ভাবলে, জগতের বাস্তবিক স্থিতি সম্বন্ধে বিচার করলে, মৃতদেহ, জনবিহীন বাংলোবাড়ী, ভগ্ন অট্টালিকা, ধংসাবশেষ প্রভৃতি দেখলে সে সম্বন্ধে শুনলে, প্রাচীন রাজাদের অন্তিম পরিনাম লক্ষ্য করলে এবং বৈরাগ্যযুক্ত মনন-শীল পুরুষের সঙ্গ করলে এরূপ যুক্তি হৃদয়ে স্বতঃ জাগতে থাকে, যার ফলে বিষয়সমূহ থেকে বৈরাগ্য উৎপন্ন হয়। পুত্র-পরিবার, অর্থ সম্পত্তি, মান বড়াই, কীর্ত্তি, কান্তি প্রভৃতি পদার্থে অনবরত দুঃখ এবং দোষযুক্ত মনে করে তা থেকে মন সরানো উচিত। ভগবান বলেছেন যে -

ইন্দ্রিয়ার্থেষু বৈরাগ্যমহংকার এব চ।
জন্মমৃত্যুজরাব্যাধিদুঃখদোষানুদর্শনম্ ॥
অসক্তিরনভিষ্বঙ্গঃ পুত্রদারগৃহাদিষু। (গীতা ১৩ / ৮-৯)

ইহলোক এবং পরলোকের সমস্ত ভোগে আসক্তির অভাব এবং অহংকারেরও অভাব তথা জন্ম, মৃত্যু, জরা এবং ব্যাধি প্রভৃতিতে দুঃখ দোষ সম্বন্ধে বারেবারে বিবেচনা করা এবং স্ত্রী, পুত্র, গৃহ, অর্থ প্রভৃতিতে আসক্তি-মমতার অভাব করা।

ভেবে দেখলে এরূপ আরও অনেক যুক্তি পাওয়া যাবে যার দ্বারা সংসারের সকল পদার্থ দুঃখরূপে প্রতীত হতে থাকবে।

যোগদর্শনের সুত্রে বলা হয়েছে -

পরিণামতাপসংস্কারদুঃখৈর্গুনবৃত্তিবিরোধাচ্চ দুঃখমেব সর্বং বিবেকিনঃ । (সাধনপাদ ১৫)

পরিণামদুঃখ, তাপদুঃখ, সংস্কারদুঃখ এবং দুঃখমিশ্রিত বলে এবং গুণ-বৃত্তি-বিরোধ হওয়ার ফলে বিবেকী পুরুষদের দৃষ্টিতে সমস্ত বিষয়সুখ দুঃখরূপ-ই। এবারে এ সম্বন্ধে কিছু বিশ্লেষণ করা হচ্ছে -

পরিণামদুঃখতা :- যে সুখ প্রারম্ভে সুখরূপে প্রতীত হলেও পরিণামে ভয়ংকর দুঃখজনক, উহাকে পরিণামদুঃখ বলা হয়, যেমন রোগীর নিকট প্রারম্ভে জিভের স্বাদকারী কুপথ্য, কবিরাজের বারণ থাকা সত্ত্বেও ইন্দ্রিয়াসক্ত রোগী আপাতত সুখপ্রদ পদার্থ স্বাদের বশে সেবন করে পরিণামে দুঃখ পায়, কাঁদে এবং চেঁচায়। এরূপে বিষয়সুখ প্রারম্ভে রমনীয় এবং সুখপ্রদ প্রতীত হলেও পরিণামে ভয়ংকর দুঃখদায়ক। ভগবান বলেছেন যে -

বিষয়েন্দ্রিয়সংযোগাদ্ যত্তদগ্রেহমৃতোপমম্ ।
পরিণামে বিষমিব তৎ সুখং রাজসং স্মৃতম্ ।। (গীতা ১৮ / ৩৮)

যে সুখ বিষয় এবং ইন্দ্রিয় সমূহের সংযোগে হয় উহা যদিও ভোগকালে অমৃতের ন্যায় মনে হয় কিন্তু পরিণামে তাহা (বল, বীর্য, বুদ্ধি, অর্থ, উৎসাহ এবং পরলোক বিনাশকারী হওয়ায়) বিষের সদৃশ, সেইজন্য সেই সুখ রাজস নামে অভিহিত হয়েছে।

দাদের রোগে চুলকাবার সময় খুবই সুখপ্রদ মনে হয়, কিন্তু পরিনামে জ্বালা হওয়ায় উহাই ভয়ানক দুঃখদায়ক হয়ে থাকে। বিষয়

সুখের পরিণাম এইরূপ হয়ে থাকে । লোক এবং পরলোকের সমস্ত বিষয়সুখ পরিণামে দুঃখজনক । বহু পূণ্য সঞ্চয়ের ফলে লোকের স্বর্গের প্রাপ্তি হয়ে থাকে কিন্তু **"তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং, ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্যলোকং বিশন্তি ।"** তারা সেই বিশাল স্বর্গলোক ভোগ করে পূন্য ক্ষীন হলে পুনরায় মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হয় । সেইজন্য তুলসীদাস বাবাজী বলেছেন –

এহি তন কর ফল বিষয় ন ভাই ।
স্বর্গউ স্বল্প অংত দুখদাই ॥

অর্থাৎ এই মনুষ্য শরীর সুখ ভোগ করার জন্য নয় । স্বর্গের সুখও স্বল্প অবধিযুক্ত এবং পরিণামে দুঃখদায়ক হয়ে থাকে ।

তাপদুঃখতা :- স্ত্রী, পুত্র, স্বামী, অর্থ, সম্পত্তি প্রভৃতি সমস্তই অনবরত তাপ (জ্বালাতন) দিয়ে থাকে । এমন কোন বিষয় নেই, যা বিচার বিবেচনা করলে তাপদায়ক বলে প্রতীত না হয় । এ ছাড়াও যখন মানুষ কাউকে নিজের চাইতে অধিক সম্পন্ন দেখে তখন নিজের স্বল্প সুখের জন্য তাঁর হৃদয়ে খুবই জ্বালা হয় । বিষয় সমূহের প্রাপ্তি, তার সংরক্ষণ এবং বিনাশের ভয়ের ফলেও সব সময় সন্তাপ (জ্বালা) হয়ে থাকে । বলা হয়েছে যে -

অর্থানামর্জনে দুঃখং তথৈব পরিপালনে ।
নাশে দুঃখং ব্যয়ে দুঃখং ধিগর্থান্ ক্লেশকারিণঃ ।।

অর্থ উপার্জনে সন্তাপ, উপার্জন হলে তার রক্ষণাবেক্ষণে সন্তাপ, কারও কাছে গচ্ছিত রাখলে যদি ডুবে যায় এই ভয়ে সব সময় সন্তাপ হতে থাকে, রেখে যদি মরতে হয় তবুও জ্বালা । তাৎপর্য হচ্ছে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কেবলই সন্তাপ । কাজেই ইহাকে তিরস্কার করা হয়েছে । পুত্র, মান-বড়াই প্রভৃতির ক্ষেত্রেও একই কথা । সবার ক্ষেত্রেই প্রাপ্তির ইচ্ছা থেকে আরম্ভ করে বিয়োগ পর্যন্ত সন্তাপ টিকে থাকে । এমন কোন বিষয়সুখ নেই যা সন্তাপকারী নয় ।

সংস্কারদুঃখতা :- বর্তমানে স্ত্রী-স্বামী, পুত্র পরিবার, অর্থ-সম্মান প্রভৃতি যা প্রাপ্ত রয়েছে তাঁর ছাপ হৃদয়ে অঙ্কিত হয়, কাজেই

তাদের অবর্তমানে সেই সকল বস্তুর অভাব ভয়ানক দুঃখজনক হয়ে থাকে । আমি পূর্বে কি ছিলাম, আমার ছেলে কত সুন্দর এবং অনুগত ছিল, আমার স্ত্রী কেমন সুশীলা ছিল, স্বামী থেকে আমার কত সুখ ছিল, আমার কত নাম ডাক ছিল, আমার কত সম্পত্তি ছিল । কিন্তু আজ আমি কি থেকে কি হয়ে গেলাম ! আমি সব দিক দিয়েই দীন-হীন কাঙ্গাল হয়ে গেলাম ! যদিও তাঁর মত লক্ষ লক্ষ লোক প্রারম্ভ থেকেই এই সকল বিষয় সমূহ থেকে বঞ্চিত রয়েছে কিন্তু তাঁরা এরূপ দুঃখী নন । যাদের হৃদয়ে বিষয় ভোগের প্রাচুর্যের সময় সুখের সংস্কার (ছাপ) থাকে তাদের ক্ষেত্রেই এরূপ অভাবের প্রতীতি হয়ে থাকে । অভাবের প্রতীতির মধ্যে দুঃখ ভরে রয়েছে । ইহাই সংস্কার দুঃখতা ।

এছাড়া একথাও সর্বথা মনে রাখা উচিত যে সংসারের সকল বিষয়-সুখ সব অবস্থায় দুঃখমিশ্রিত রয়েছে ।

গুন-বৃত্তি বিরোধজনিত দুঃখ :- যদি কেউ স্বল্প মিথ্যে বললে, ছলনা-চাতুরী বা বিশ্বাসঘাত করলে দশ হাজার টাকা পাবার সম্ভাবনা রয়েছে বলে মনে করে, সে সময় সাত্ত্বিক বৃত্তি বলে যে পাপ করে টাকা চাই না, ভিক্ষে করা, যাচনা করা অথবা মরে যাওয়াও ভাল তবুও পাপ করা উচিত নয়। অন্যদিকে লোভ-জনিত রাজসী বৃত্তি বলে যে ক্ষতি কি ? একবার যদি সামান্য মিথ্যে কথা বলা হয় তাহলে আপত্তির কি আছে ? সামান্য ছলনা বা বিশ্বাসঘাত করলে কি আর হবে ? একবার এভাবে টাকা তো রোজগার করি, ভবিষ্যতে আর এরূপ করব না ।

এভাবে সাত্ত্বিক এবং রাজসী বৃত্তির মধ্যে দ্বন্দ্বহতে থাকে, ফলে চিত্ত অত্যন্ত ব্যাকুল এবং কিংকর্তব্য বিমূঢ় হয়ে ওঠে । অশেষ বিষাদ এবং উদ্বিগ্নতার সৃষ্টি হয় ।

এভাবে রাজসী এবং তামসী বৃত্তির মধ্যেও ঝগড়া লেগে যায় । যেমন একজন দাবা কিংবা তাস খেলছে । এদিকে যদি সে সময়মত বাড়ী না পৌছায় তাহলে কোনও জরুরী কাজের ক্ষতি হবে । কর্মে প্রবৃত্তকারী রাজসী বৃত্তি বলে, উঠে পড়, কাজের ক্ষতি হচ্ছে, বাড়ী

চলো। ওদিকে প্রমাদরুপী তামসী বৃত্তি পুনঃ পুনঃ তাকে খেলার দিকে আকর্ষিত করতে থাকে। সে বেচারী এই উভয়ের মাঝে পড়ে ভয়ানক দুঃখী হতে থাকে।

উদাহরণের দৃষ্টিকোন থেকে দুটি দৃষ্টান্তই পর্যাপ্ত।

এভাবে ভেবে দেখলে এটা স্পষ্ট যে, সংসারের সকল সুখই দুঃখজনক। কাজেই এ থেকে মন সরাবার জন্য যথা সম্ভব চেষ্টা করা উচিত।

উপর্যুক্ত ভয় তথা বিচার-বিবেচনা দ্বারা উভয় প্রকারের বৈরাগ্য লাভের এটাই উপায়, এই উপায় পুর্বাপেক্ষা উত্তম শ্রেণীর বৈরাগ্য সম্পাদনেও অবশ্যই সাহায্য করে। কিন্তু পরের দুই ধরনের বৈরাগ্য প্রাপ্তির জন্য নিম্নলিখিত সাধন বিশেষভাবে সাহায্য করে থাকে।

পরমাত্মার নামজপ এবং তাঁর স্বরুপের নিরন্তর ধ্যান করতে থাকলে হৃদয়ের মালিণ্য যেমন যেমন দূর হতে থাকে তেমন তেমন উহাতে উজ্জ্বলতা প্রকট হতে থাকে। এরুপ উজ্জ্বল এবং শুদ্ধ অন্তঃকরণে বৈরাগ্যের তরঙ্গ উঠতে থাকে, যার ফলে মন থেকে বিষয়ের প্রতি অনুরাগ নিজে থেকে সরে যায়। এই অবস্থায় এর প্রতি বিশেষ ভাববারও প্রয়োজন হয় না। আয়নায় ময়লা জমে থাকলে তুলো দ্বারা উহা যেমন যেমন দূর হয়, তেমনি উহা চকমক করতে থাকে এবং উহাতে মুখের প্রতিবিম্ব স্পষ্ট দেখা যায়, তেমনি পরমাত্মার ভজনা-ধ্যানরুপী তুলোর ক্রমাগত ঘর্ষণে অন্তঃকরণরূপী দর্পণের মালিণ্য দূর হলে উহা চকমক করতে থাকে এবং তাতে সুখস্বরুপ আত্মার প্রতিবিম্ব দেখতে পাওয়া যায়। এই অবস্থায় অতি সামান্য অবশিষ্ট বিষয় মলিনতার চিহ্নও সাধকের হৃদয়ে শূলের ন্যায় অস্বস্তিকর হয়ে থাকে। অতএব সে উত্তরোত্তর অধিক উৎসাহে সেই কলঙ্কচিহ্ন মিটিয়ে ফেলার জন্য ভজন ধ্যানে তৎপর হয়ে অবশেষে উহা সমূলে বিনাশ করে তবে ক্ষান্ত হয়। ভজণ ধ্যানের ফলে যেমন যেমন অন্তঃকরণ রূপী দর্পন পরিস্কৃত হতে থাকে, তেমন তেমন সাধকের আশা এবং উৎসাহের বৃদ্ধি হতে থাকে। যারা ভজণ ধ্যানরূপী সাধনার তত্ত্বঃ জানে না, তাদের

কাছেই ইহা ভাররূপে প্রতীত হয়। কিন্তু যার কাছে এই তত্ত্বের বোধ হতে থাকে, সে উত্তরোত্তর আনন্দের উপলব্দি করতে থাকে এবং পূর্ণানন্দের প্রাপ্তির জন্য ভজন-ধ্যান বাড়িয়ে-ই যায়। তার দৃষ্টিতে বিষয়-সমূহে প্রতীত হওয়া বিষয় সুখের কোন অস্তিত্ব-ই থাকে না। ফলে সে অতি শীঘ্র দৃঢ় বৈরাগ্য লাভ করে। ভগবান এই দৃঢ় বৈরাগ্য যুক্ত অস্ত্র দ্বারাই অহংতা, মমতা এবং বাসনারূপী অতিদৃঢ় শিকড় যুক্ত সংসাররূপী অশ্বত্থ-বৃক্ষকে ছেদন করার জন্য বলেছেন ঃ-

অশ্বত্থমেনং সুবিরূঢ়মূলমসঙ্গশস্ত্রেন দৃঢ়েন ছিত্ত্বা ।
(গীতা ১৫ / ৩)

সংসাররূপী চিত্র সর্বথা ভুলাইয়া দেওয়া-ই হল এই অশ্বত্থ-বৃক্ষের ছেদন করা। দৃঢ় বৈরাগ্যের দ্বারা এই কাজ সহজেই হতে পারে। ভগবান বলেছেন -

ততঃ পদং তৎপরিমার্গিতব্যম্ যস্মিন্ গতা ন নিবর্তন্তি ভূয়ঃ ।
তমেব চাদ্যং পুরুষং প্রপদ্যে যতঃ প্রবৃত্তিঃ প্রসৃতা পুরাণী ।।
(গীতা ১৫ / ৪)

তদনন্তর সেই পরমপদরূপ পরমেশ্বরের উত্তমরূপে খোজ (অন্বেষন) করা উচিত, (সেই পরমাত্মার বিজ্ঞান আনন্দঘন সত্যং **"জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম"**-র বারংবার চিন্তন করাই হল তাঁর খোজ করা), যাতে গত পুরুষগণ পুনরায় সংসারে ফিরে না এবং যে পরমেশ্বর হইতে এই সংসার বৃক্ষের প্রবৃত্তি বিস্তৃত হইয়াছে, সেই পুরুষ নারায়ণের আমি শরণ গ্রহণ করেছি (সেই পরম স্বরূপকে আঁকড়ে থাকা উহাতে স্থিত হওয়া-ই হচ্ছে তার শরণ হওয়া এভাবে শরণ হবার পর ঃ-

নির্মানমোহাঃ জিতসঙ্গদোষাঃ অধ্যাত্মনিত্যাঃ বিনিবৃত্তকামাঃ ।
দ্বন্দ্বৈর্বিমুক্তাঃ সুখদুঃখসংজ্ঞৈর্গচ্ছন্ত্যমূঢ়া পদমব্যয়ং তৎ ।।

'যাদের মান এবং মোহ বিনষ্ট হয়েছে এবং যারা আসক্তিরূপী দোষ জয় করেছেন, পরমাত্মার স্বরূপে যাদের নিরন্তর স্থিতি রয়েছে, যাদের কামনা সমূলে বিনষ্ট হয়েছে এরূপ সুখদুঃখরূপী দ্বন্দ্ব থেকে বিমুক্ত জ্ঞানীগণ সেই অবিনাশি পরমপদ লাভ করেন।'

বৈরাগ্যের ফল

এভাবে শুধুমাত্র এক পরমাত্মার জ্ঞান অবশেষ রয়ে যাওয়াই হল অটল সমাধি বা জীবন্মুক্ত অবস্থা, এটাই তাঁর লক্ষণ। তদনন্তর এরূপ জীবন্মুক্ত ভগবানের ভক্ত পুরুষগণ সংসারে কিভাবে বিচরন করে থাকেন, তাদের স্থিতি কিরূপ হয়ে থাকে, তার বিবেচন ভগবান গীতার ১২ অধ্যায়ের ১৩ থেকে ১৯ শ্লোক পর্যন্ত করেছেন। তাদের চিহ্ন সমন্ধে ভগবান বলেছেন –

অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্র করুনঃ এব চ।
নির্মমো নিরহংকারঃ সমদুঃখসুঃখ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে চ য়ঃ।
হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী যো মদ্ভক্ত সে মে প্রিয়ঃ ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্খতি।
শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।
শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জিতঃ ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ।
অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ ॥

এভাবে শান্তিপ্রাপ্ত যে পুরুষ সকলভূতে দ্বেষভাব রহিত এবং স্বার্থভাব রহিত সকলের প্রেমী এবং হেতুরহিত দয়ালু তথা মমতা রহিত এবং অহংকার রহিত, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিতে সমান, ক্ষমাশীল অর্থাৎ অপরাধকারীদিগেরও অভয়দাতা হন। যে ধ্যানযোগেযুক্ত যোগী লাভহানিতে সতত সন্তুষ্ট, মন এবং ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে শরীর-বশকারী, আমাতে দৃঢ় নিশ্চয় বিশিষ্ট, সেই আমাতে অর্পিত মন এবং বুদ্ধি যুক্ত

ভক্ত আমার প্রিয় । যার দ্বারা কোন জীব উদ্বেগ প্রাপ্ত হয় না এবং যিনি নিজেও কোনও জীব দ্বারা উদ্বিগ্ন হন না এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ (পরের উন্নতি দেখে সন্তাপ হওয়ার নাম অমর্ষ), ভয় এবং উদ্বেগ থেকে মুক্ত, সেই ভক্ত আমার প্রিয় । যিনি আকাঙ্খা রহিত, অন্তর বাহিরে শুদ্ধ, চতুর (দক্ষ) অর্থাৎ যে কাজের জন্য সংসারে আশা হয়েছে তা করে নিয়েছেন, পক্ষপাতশূন্য, ভয়হীন এবং সকল আরম্ভের-ত্যাগী অর্থাৎ মন, বাণী, ও শরীরদ্বারা প্রারদ্ধ জনিত ভবিতব্য সমুদয় স্বভাবিক কর্মে কর্ত্তৃত্বাভিমানত্যাগী এমন ভক্ত আমার প্রিয় । যে কখনও হর্ষিত হয় না, দ্বেষ করে না, শোক করে না, কামনা করে না, এবং যে শুভ এবং অশুভ সকল কর্মের ফলত্যাগী এরূপ ভক্তিযুক্ত পুরুষ আমার প্রিয় । আর যে পুরুষ শত্রু মিত্র, মান-অপমান, শীত-উষ্ণ এবং সুখ-দুঃখাদির দ্বন্ধসমূহে সমভাবযুক্ত আর সমস্ত (সংসারে) আসক্তিশূন্য এবং নিন্দা ও স্তুতিতে সমবোধবিশিষ্ট, মননশীল অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরুপকে নিরন্তর মননকারী এবং যে কোন ভাবেই শরীরের নির্বাহ অর্থাৎ ভোজন বস্ত্রাদিতে সর্বদা সন্তুষ্ট এবং বাসস্থানে মমতারহিত, সেই স্থির বুদ্ধিবিশিষ্ট ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয় ।

অতএব এই অসার সংসার থেকে মন সরিয়ে নিয়ে এই লোক এবং পর-লোকের সমস্ত প্রকারের ভোগ থেকে বৈরাগ্যবান হয়ে সকলেরই পরমাত্মাকে লাভের জন্য প্রযত্ন করা উচিত ।

"মননশীল অর্থাৎ ঈশ্বরের স্বরূপকে নিরন্তর মননকারী এবং যে কোন ভাবেই শরীরের নির্বাহ অর্থাৎ ভোজন-বস্ত্রাদিতে সর্বদা সন্তুষ্ট এবং বাসস্থানে মমতা রহিত, সেই স্থির বুদ্ধিবিশিষ্ট ভক্তিমান পুরুষ আমার প্রিয় ।"

অতএব এই অসার সংসার থেকে মন সরিয়ে নিয়ে এই লোক এবং পর-লোকের সমস্ত প্রকারের ভোগ থেকে বৈরাগ্যবান হয়ে সকলেরই পরমাত্মাকে লাভের জন্য প্রযত্ন করা উচিত ।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

গীতাসম্বন্ধীয় প্রশ্নোত্তর

জনৈক ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন যে –

প্রশ্ন– গীতা বেদকে স্বীকার করে কি না ? যদি স্বীকার করে থাকে তবে তার দৃষ্টিকোন কি ? দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪২, ৪৫, ৪৬ এবং ৫৩ শ্লোকসংখ্যায় বেদ সম্বন্ধে নীচু মনোভাবের তাৎপর্য কি ?

উত্তর – গীতা বেদ স্বীকার করে এবং বেদ সম্বন্ধে অত্যন্ত উঁচু মনোভাব পোষণ করে। দ্বিতীয় অধ্যায়ের উপর্যুক্ত শ্লোকে বেদের নিন্দা করা হয়নি, কেবলমাত্র ভোগ-ঐশ্বর্য্য কিংবা স্বর্গাদি প্রভৃতি ক্ষণভঙ্গুর এবং বিনাশশীল ফলযুক্ত সকাম কর্মসমূহ থেকে দূরে থেকে আত্মপরায়ণ হবার জন্য বলা হয়েছে। ভোগসমূহে মানুষের স্বাভাবিকভাবে প্রবৃত্তি হয়ে থাকে। "এই কর্ম করলে প্রচুর অর্থলাভ হবে","এই কর্মদ্বারা ইচ্ছামত স্ত্রী-পুত্র লাভ হবে" কিংবা "এই কর্ম করা হলে স্বর্গ প্রভৃতির প্রাপ্তি হবে"– যদি এরূপ মনোমুগ্ধকারী বাক্য শ্রুতিগোচর হয়, তবে মনের আকৃষ্ট হওয়া অনিবার্য হয়ে পড়ে। ভোগ-লালাসার বৃদ্ধি হয়ে বুদ্ধি চঞ্চল হয়ে পড়ে। বহুশাখাবিশিষ্ট বুদ্ধিদ্বারা আত্মতত্ত্বের উপলব্ধি হয় না এবং তা না হওয়া পর্য্যন্ত দুঃখ-সন্তাপ থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হওয়া যায় না। পরে নবম অধ্যায়ে পুনরায় বলা হয়েছে যে –

ত্রৈবিদ্যা মাং সোমপা পূতপাপা যজ্ঞৈরিষ্ট্বা স্বর্গতিং প্রার্থয়ন্তে ।
তে পুণ্যমাসাদ্য সুরেন্দ্রলোক মশ্নন্তি দৈব্যান্ দিবি দেবভোগান্ ॥
তে তং ভুক্ত্বা স্বর্গলোকং বিশালং ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্য লোকংবিশন্তি ।
এবং ত্রয়ীধর্মমনুপ্রপন্না গতাগতং কামকামা লভন্তে ॥ (গীতা ৯/২১-২২)

"বেদত্রয়ে বিহিত সকাম কর্মের অনুষ্ঠাতৃগণ, সোমরস-পায়ীগণ, পাপসমূহ থেকে বিমুক্ত হয়ে যারা আমাকে যজ্ঞসমূহ দ্বারা পুজা করে

স্বর্গপ্রাপ্তি প্রার্থনা করেন, সে সকল পুরুষগণ স্বীয় পুণ্যের ফলরূপে ইন্দ্রলোক প্রাপ্ত হয়ে স্বর্গে দিব্য দেবতাদিগের ভোগসকল উপভোগ করে থাকে এবং সেই বিশাল স্বর্গলোক উপভোগ করে পুণ্য ক্ষীণ হলে মৃত্যুলোক প্রাপ্ত হয়-এরূপে (স্বর্গের সাধনরূপ) বেদত্রয়ে কথিত (ঋক, যজুঃ, সাম) সকাম কর্মের আশ্রয়গ্রহণকারী ভোগকামনাযুক্ত পুরুষগণ বারংবার গমণা-গমণ করতে থাকেন।"

তাৎপর্য এই যে, সকাম কর্মে যুক্ত ব্যক্তিকে বারংবার সংসার চক্রে আসা-যাওয়া করতে হয়, তাঁরা জন্ম-গ্রহণরূপী কর্মফল-ই লাভ করে। জন্ম-মৃত্যুর চক্র থেকে তাঁরা রেহাই পেতে পারেন না। বলার তাৎপর্য এই যে, যেহেতু পরম শ্রেয় প্রাপ্তির অন্তরায় কাজেই উহাকে নিস্কাম কর্ম এবং নিস্কাম উপাসনা থেকে নিম্ন শ্রেণীর বলা হয়েছে। এর নিন্দা করা হয়নি, কোথাও এরূপ বলা হয়নি যে, বৈদিক সকামকর্মী পুরুষ **"মোহজাল-সমাবৃতাঃ"**, আসুরী সম্পদ যুক্ত পুরুষগণের ন্যায় তারা **"পতন্তি নরকেহশুচৌ"** অপবিত্র নরকে পতিত হয় কিংবা **"আসুরী যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্** ।। (১৬/২০) হে কৌন্তেয় ! ঐ সকল মূঢ়পুরুষগণ জন্মে-জন্মান্তর ধরে আসুরী যোনী প্রাপ্ত হয়ে, আমাকে প্রাপ্ত না হয়ে তদপেক্ষাও অতি নিকৃষ্টগতি প্রাপ্ত হয়ে থাকে। পক্ষান্তরে এরূপ বলা হয়েছে যে তাঁরা পাপ থেকে বিমুক্ত হয় (দেব-ঋষি। জনিত পাপ থেকে বিমুক্ত হয়ে) স্বর্গের ইচ্ছা রেখে যজ্ঞদ্বারা ভগবদ্-পুজনকারী হওয়ার ফলে স্বর্গের দিব্য এবং বিশাল ভোগসমূহকে ভোগ করে।

পক্ষান্তরে বেদের মাহাত্ম্যের বর্ণনা করা হয়েছে এরূপ বহু বাক্য গীতায় রয়েছে –**"কর্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষরসমুদ্ভবম্"** (গীতা ৩/১৫), "বেদ থেকে কর্ম এবং বেদ অক্ষরপরমাত্মা থেকে উৎপন্ন হয়েছে বলে জানবে।" **ওঁ তৎসদিতি নির্দেশো ব্রহ্মণস্ত্রিবিধঃ স্মৃতঃ। ব্রাহ্মণাস্তেন বেদাশ্চ যজ্ঞাশ্চ বিহিতাঃ পুরা ॥"** (গীতা ১৭/২৩), ওঁ, তৎ, সৎ এইরূপ তিন প্রকারের সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মের নাম কথিত আছে, তদ্দ্বারা সৃষ্টির আদিকালে ব্রাহ্মণ, বেদ ও যজ্ঞাদি

রচিত হয়েছে। এই কথনের দ্বারা বেদের উৎপত্তি পরমাত্মার দ্বারা হয়েছে, ইহা বলা হয়েছে। **"এবং বহুবিধা যজ্ঞা বিততা ব্রহ্মণো মুখে। কর্মজান্ বিদ্ধি তান্ সর্বানেবং জ্ঞাত্বা বিমোক্ষ্যসে।"** (৪/৩২) "এরূপ বহুবিধ যজ্ঞ বেদের বাণীতে বিস্তারিত রয়েছে, সেই সবকে শরীর, মন, এবং ইন্দ্রিয়সমূহের ক্রিয়া দ্বারা নিষ্পন্ন জান। এইপ্রকার তত্ত্বতঃ জেনে নিষ্কাম কর্মযোগ দ্বারা সংসার বন্ধন থেকে মুক্ত হবে।" এখানে বৈদিক কর্মসমূহকে তত্ত্বতঃ জেনে তাঁর দ্বারা নিষ্কাম আচরণ করে মোক্ষের প্রাপ্তি ঘটবে এরূপ বলা হয়েছে। **"যদক্ষরং বেদবিদো বদন্তি বিশন্তি"** (৮/১১) "বেদবক্তাগণ যে পরমাত্মাকে ওঁ কার নামে অভিহিত করেন।" কাজেই এক্ষেত্রে স্পষ্টরূপে বেদের প্রশংসা করা হয়েছে। ঠিক এরূপ বাক্য কঠোপনিষদে নিম্নলিখিত মন্ত্রে রয়েছে –

সর্বে বেদা যত্পদমামনন্তি তর্বাংসি সর্বাণি চ যদ্বদন্তি।
যদিচ্ছান্তো ব্রহ্মচর্যং চরন্তি তত্তে পদং সংগ্রহেণ ব্রবীম্যোমিত্যেতৎ ॥
(১/২/১৫)

"-------- **পবিত্রমোঙ্কার ঋক্সাম যজুরেব চ।**" পবিত্র ওঁ কার এবং ঋক্, সাম তথা যজুর্বেদ আমিই। (৯/১৭) এই বচনের দ্বারা গীতার বক্তা ভগবান বেদকে নিজের স্বরূপ বলে বর্ণনা করেছেন। **"ছন্দোভির্বিবিধৈঃ পৃথক্"** (১৩/৪) "বিভিন্ন বেদমন্ত্রদ্বারা (ক্ষেত্র-ক্ষত্রজ্ঞের তত্ত্বঃ) বিভাগপূর্বক বলে দিয়ে নিজের বাক্যের সমর্থনে বেদের প্রমাণ দিয়েছেন **"বেদৈশ্চ সর্বৈরহমেব বেদ্যো বেদান্তকৃদ্বেদবিদেব চাহম্।"** (১৫/১৫) সকল বেদদ্বারা আমিই জানিবার যোগ্য, বেদান্তের কর্তা এবং বেদবেত্তাও আমিই। এই বচনের দ্বারা ভগবান নিজেকে বেদ দ্বারা জানিবার এবং নিজেকে বেদের জ্ঞাতা বলে বেদকে স্পষ্টরূপে প্রতিষ্ঠা দান করেছেন। এছাড়াও আরও বিভিন্ন স্থানে ভগবান বেদের প্রশংসা করেছেন।

ফলে ইহা স্পষ্ট যে, গীতা বেদকে নীচু বলে মানে না। গীতায় শুধুমাত্র সকাম কর্মকে নিষ্কাম কর্ম অপেক্ষা নীচু বলা হয়েছে। বাস্তবিক

পক্ষে ইহলোক এবং পরলোকের সমস্ত ভোগ-পদার্থ মোক্ষ অপেক্ষা অত্যন্ত নীচু। স্বয়ং বেদও এই সিদ্ধান্ত প্রতিপাদন করে থাকে। যজুর্বেদের চল্লি শতম অধ্যায়ে এর বিবেচন রয়েছে। কঠোপনিষদে যম-নচিকেতার সংবাদে প্রেয়-শ্রেয়র বিবেচনা করা কালীন যমরাজ ভোগ ঐশ্বর্য্যাদি এবং ভোগ ঐশ্বের্য্যে অনাসক্ত থাকার জন্য নিচকেতার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। প্রেয়র নিন্দা এবং মোক্ষ-শ্রেয়ের অতি প্রশংসা করেছেন এবং ভোগ-ঐশ্বর্য্যে অনাশক্ত থাকার জন্য যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। (কঠ.ব. ২/১,২,৩), গীতাতেও এইরূপ বলা হয়েছে। নিস্কাম কর্ম, নিস্কাম উপাসনা এবং আত্মতত্ত্বের বিভিন্ন স্থানে প্রশংসা করে গীতা প্রকান্তরে বেদেরই সমর্থন করেছে।

প্রশ্ন ঃ– গীতা বর্ণাশ্রম-ধর্ম মান্য করে কি না ? যদি মান্য করে তবে কি প্রকারে ? যদি মান্য হয় তবে সকল ধর্মের পরিত্যাগ করে (গীতা ১৮/৬৬) শ্লোকের অর্থ কি ?

উত্তর – গীতা বর্ণাশ্রম স্বীকার করে। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শুদ্র যদি নিজের নিজের স্বাভাবিক বর্ণ-ধর্মে স্বার্থরহিত হয়ে নিস্কামভাবে ভগবদ্ প্রীতির জন্য আচরণ করে, তাহলে তাদের মুক্তি হওয়াকে গীতা পুরোপুরী স্বীকার করে। গীতার ১৮ অধ্যায়ে ৪১ থেকে ৪৪ শ্লোকে চার বর্ণের স্বাভাবিক কর্মের বর্ণনা করে ৪৫–৪৬ সংখ্যায় সেই স্বাভাবিক কর্মদ্বারা তাঁদের ক্ষেত্রে পরম প্রাপ্তি বলা হয়েছে এবং ৪৭–৪৮ শ্লোক সংখ্যায় বর্ণ-ধর্ম পালনের উপরে বিশেষ জোর দেওয়া হয়েছে।

গীতা জন্ম এবং কর্ম উভয় ভাবেই বর্ণ স্বীকার করে। **"চাতুর্ববর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ" (৪/১৩) গুণ** এবং কর্ম অনুযায়ী বিভাগ করে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় বৈশ্য এবং শুদ্র আমার দ্বারা রচিত হয়েছে।" এই কথনের দ্বারা তাদের পূর্বকৃত কর্মের ফলস্বরূপ গুণ-কর্ম অনুযায়ী রচিত হওয়া সিদ্ধ হয়, জন্ম হওয়ার পরবর্ত্তিকাল থেকে মান্য হতে পারে না। সেইজন্য গীতা বর্ণধর্মকে "স্বাভাবিক" এবং "সহজ" (জন্মের সঙ্গে উৎপন্নজাত) কর্ম বলেছে। পরমেশ্বরের শরণ হয়ে যে কেউই নিজের স্বাভাবিক কর্ম দ্বারা নিস্কামভাব নিয়ে তাঁর উপাসনা করে

মুক্ত হতে পারে। বর্ণ অনুযায়ী কর্মভেদ স্বীকার করেও মুক্তি সম্বন্ধে গীতা সকলকে সমান অধিকারী স্বীকার করে। গীতার ঘোষণা হচ্ছে –

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ (১৮/৪৬)
মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্ ॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণা পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা ।
অনিত্যমসুখং লোক মিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম ॥ (৯/৩২/৩৩)

যে পরমাত্মা হইতে সকল ভুতের উৎপত্তি হয়েছে এবং যার দ্বারা সর্ব জগৎ ব্যাপ্ত রয়েছে পরমেশ্বরকে স্বীয় স্বাভাবিক কর্মদ্বারা পূজা করে মনুষ্য পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়। হে অর্জুন ! স্ত্রী, বৈশ্য এবং শূদ্রাদিক তথা পাপযোনি বিশিষ্ঠ যে কেউ হোক না কেন, তাঁরাও আমাকে আশ্রয় করে পরম গতি প্রাপ্ত হয়, তাহলে পূণ্যশীল ব্রাহ্মণ এবং রাজর্ষী ভক্তগণ সম্বন্ধে আর বলার কি আছে ? অতএব তুমি এই ক্ষণভঙ্গুর মনুষ্য শরীর প্রাপ্ত হয়ে নিরন্তর আমাকে ভজনা করে।

"সর্বধর্মান পরিত্যজ্য"-র অর্থ গীতায় ১৮ অধ্যায়ের ৬৬ নং শ্লোকে সম্পূর্ণ ধর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ বলা হয়নি; কেননা এর আগের ১৬ অধ্যায়ের ২৩ এবং ২৪ নং শ্লোক সংখ্যায় শাস্ত্রবিধির ত্যাগে সিদ্ধি, সুখ এবং পরমগতির প্রাপ্তি না হওয়া বলা হয়েছে এবং শাস্ত্রবিধি অনুযায়ী ধর্ম পালন করাকে কর্তব্য বলে বলা হয়েছে। ১৮ অধ্যায়ের ৪৭ এবং ৪৮ নং শ্লোকেও স্বধর্ম পালনের উপরে খুব জোর দেওয়া হয়েছে। কাজেই পূর্বে এরূপ বলে পরে ধর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগের আদেশ দেওয়া সম্ভব নয়। যদি ক্ষণিকের জন্য এটা মানা হয় যে, নিজের কথনের বিরূদ্ধে ভগবান এখানে স্বরূপতঃ ধর্মের পরিত্যাগের আদেশ দিয়েছেন, তাহলে ১৮ অধ্যায়ের ৭৩ নং শ্লোকে **"করিস্যে বচনং তব"**– আপনার আদেশ অনুযায়ী করব" বলে অর্জুনের যুদ্ধরূপ বর্ণধর্মের আচরণ করা বিপরীত প্রতীত হচ্ছে। ভগবান সকল ধর্মের পরিত্যাগের আদেশ

দিয়েছেন, অর্জুন তা স্বীকারও করে নিয়েছে, তাহলে অর্জুন-এর বিপরীত যুদ্ধ কেন করবে ? এতে এটাই প্রমাণিত হয় যে, ভগবান সকল ধর্মের পরিত্যাগের জন্য আদেশ দেন নি । এখানে **"সর্বধর্মান্ পরিত্যজ্য"**-র অর্থ এই যে সকল ধর্মের "আশ্রয়"-এর পরিত্যাগ করে মানুষ যেন একমাত্র পরমাত্মার আশ্রয় গ্রহণ করে । স্বরূপতঃ ধর্ম পরিত্যাগের কথা বলা হয় নি । তাৎপর্য শুধু আশ্রয় (শরণ) পরিত্যাগের । বর্ণ-ধর্ম সম্বন্ধে ইহা বলা হয়েছে । বর্ণের ন্যায় আশ্রম ধর্মের সম্বন্ধে গীতায় স্পষ্টভাবে এবং বিশদ্ বর্ণনা দেখা যায় না । গৌণরূপে গীতা আশ্রম ধর্ম স্বীকার করে । **"ব্রহ্মচর্য্যং চরন্তি," যতয়ো বীতরাগঃ (৮/১১), "তপস্বিভ্যঃ** (৬/৪৬), "ব্রহ্মচর্যের পালন করে" "আসক্তিরহিত সন্ন্যাসী" "তপস্বীর চাইতে" প্রভৃতি শব্দদ্বারা ব্রহ্মচর্য্য, সন্ন্যাস এবং বাণপ্রস্থ আশ্রমের নির্দেশ করা হয়েছে । গৃহস্থ-ধর্মের বর্ণনা তো স্পষ্টরূপে রয়েছে ।

প্রশ্নঃ— "কর্ম" এবং "জ্ঞান" এই দুইয়ের মধ্যে গীতা কোনটি স্বীকার করে ? কিংবা দুটি-ই স্বীকার করে ? যদি শুধু কর্ম স্বীকার করে তবে জ্ঞান নিস্ফল হয় এবং যদি জ্ঞান স্বীকার করে তবে কর্ম নিস্ফল হয়ে যায় ; যদি জ্ঞান লক্ষ্যবস্তু হয় তবে কর্মের উপরে আগ্রহ কেন ?

উত্তরঃ — অধিকারী-ভেদে গীতা জ্ঞানযোগ এবং কর্মযোগের নিষ্ঠাকে (আস্থা) মুক্তির দুইটি স্বতন্ত্র সাধন পথ বলে স্বীকার করে । এই দুই নিষ্ঠার পরিণাম একই ভগবদ্ প্রাপ্তি হলেও দুই সাধন পথের কার্যপদ্ধতি, ভাব, পথ সর্বথা ভিন্ন হয়ে থাকে । উভয় নিষ্ঠার সাধনা একই সময়ে একই ব্যক্তির দ্বারা হতে পারে না ।

নিস্কাম কর্মযোগী সাধনকালে কর্ম, কর্মফল, পরমাত্মা এবং নিজেকে ভিন্ন-ভিন্ন মনে করে, কর্মফল এবং আসক্তির পরিত্যাগ করে ঈশ্বরে প্রবৃত্ত হয়ে ঈশ্বর-অর্পণযুক্ত বুদ্ধি দ্বারা সকল কার্য করে এবং জ্ঞানযোগী মায়ার গুণই গুণে প্রবৃত্ত রয়েছে এরূপ মনে করে ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা ঘটিত সকল ক্রিয়ার কর্তৃত্ব-অভিমান না রেখে কেবলমাত্র এক সর্বব্যাপী পরমাত্মার স্বরূপে এককভাবে যুক্ত হয়ে অবস্থান করে ।

দুইয়ের মধ্যে যে কোনও নিষ্ঠায় স্বরূপতঃ কর্মত্যাগ করা আবশ্যক নয় । উপাসনার আবশ্যকতা উভয় নিষ্ঠায় রয়েছে । এই বিষয়ের বিস্তৃত

বর্ণনা "গীতোক্ত সন্ন্যাস"-এর "গীতোক্ত নিস্কাম কর্মযোগের স্বরূপ" শীর্ষক প্রবন্ধে বলা হয়েছে।★

প্রশ্নঃ— গীতা মূর্তি পূজা স্বীকার করে কি না ? যদি স্বীকার না করে তবে নবম অধ্যায়ের ২৬ নং শ্লোকের অর্থ কি ? যদি স্বীকার করে তবে তাঁর স্বরূপ কি, সাকার না নিরাকার ?

উত্তর :— গীতা মূর্তি-পূজা স্বীকার করে, ৯ অধ্যায়ের ২৬ এবং ৩৪ শ্লোক-সংখ্যা দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়েছে। স্বরূপ সম্বন্ধে গীতা সাকার-নিরাকার উভয় স্বরূপকে মান্য করে। উদাহরণ রূপে কিছু শ্লোকর উদ্ধিতি করা হচ্ছে —

অজোহপি সন্নব্যয়াত্মা ভূতানামীশ্বরোহপি সন্ ।
প্রকৃতিং স্বামাধিষ্ঠায় সম্ভবাম্যাত্মমায়য়া ॥
যদা যদা হি ধর্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত ।
অভ্যুত্থানমধর্মস্য তদাত্মানং সৃজাম্যহম্ ॥
পরিত্রাণায় সাধুনাং বিনাশায় চ দুস্কৃতাম্ ।
ধর্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে ॥
জন্ম কর্ম চ মে দিব্যমেবং যো বেত্তি তত্ত্বতঃ ।
ত্যক্ত্বা দেহং পুনর্জন্ম নৈতি মামেতি সোহর্জুন ॥

(গীতা ৪/৬-৯)

অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্ ।
পরং ভাবমজানন্তো মম ভূতমহেশ্বরম্ ॥
পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রয়চ্ছতি ।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রয়তাত্মনঃ ॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ।
মামেবৈশ্যসি যুক্ত্বৈবমাত্মানং মৎপরায়ণঃ ॥

(গীতা ৯/১১, ২৬, ৩৪)

★"গীতোক্ত সাংখ্যযোগ" এবং "নিস্কাম কর্মযোগ" নিবন্ধ বর্তমান পুস্তকে অন্যস্থানে রয়েছে। ইহা আলাদা ভাবেও পুস্তকরূপে প্রকাশিত হয়েছে এবং গীতা প্রেস থেকে তা পাওয়া যেতে পারে।

ভগবান বলেছেন – "আমি অবিনাশী স্বরূপ অজন্মা হয়েও এবং সর্বভূতের ঈশ্বর হয়েও স্বীয় (নিজের) প্রকৃতিকে বশীভূত করে যোগমায়া দ্বারা আবির্ভুত হই। হে ভারত ! যখন যখন ধর্মের হানি এবং অধর্মের বৃদ্ধি হয় তখনই আমি নিজরূপের রচনা করি। সাধুপুরুষদের উদ্ধার করার জন্য এবং পাপকারীগণের বিনাশ করার জন্য তথা ধর্ম স্থাপন করার জন্য আমি যুগে যুগে আবির্ভুত হই। হে অর্জুন ! আমার সেই জন্ম এবং কর্ম দিব্য অর্থাৎ অলৌকিক, এই প্রকার যে ব্যক্তি তত্ত্বতঃ জানে সে শরীর ত্যাগ করে পুণরায় জন্ম প্রাপ্ত হয় না কিন্তু আমাকে প্রাপ্ত হয়।"

"সকল ভূতের মহান্ ঈশ্বররূপ আমার পরম ভাবকে যারা না জানে এরূপ মূঢ় লোক মনুষ্যের শরীর ধারণকারী আমাকে (পরমাত্মাকে) তুচ্ছজ্ঞান করে অর্থাৎ স্বীয় যোগমায়াতে সংসারের উদ্ধারের জন্য মনুষ্যরূপে বিচরণকারীকে সাধারণ মনুষ্য মনে করে থাকে। পত্র, পুষ্প, ফল, জল ইত্যাদি যা কিছু যে কেউ ভক্ত আমাকে প্রেমপূর্বক অর্পণ করে, সেই শুদ্ধবুদ্ধি নিস্কাম প্রেমী ভক্তের প্রেমপূর্বক অর্পিত সেই পত্রপুষ্পাদি আমি সগুণরূপে প্রকট হয়ে প্রীতির সঙ্গে ভক্ষণ করি। তুমি আমাতেই মনযুক্তকারী হও, আমারই ভক্ত হও, আমারই পুজনকারী হও এবং বাসুদেব আমাকেই প্রণাম কর, এভাবে আমার শরণাপন্ন হয়ে আত্মাকে আমাকে এককভাবে করে আমাকেই প্রাপ্ত হবে।"

পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরং ভবান্।
পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥
আহুস্ত্বামৃষয়ঃ সর্বে দেবর্ষির্নারদস্তথা।
অসিতো দেবলো ব্যাসঃ স্বয়ং চৈব ব্রবীষি মে॥
কিরীটিনং গদিনং চক্রিণঞ্চ তেজোরাশিং সর্বতো দীপ্তমন্তম্।
পশ্যামি ত্বাং দুর্নিরীক্ষং সমন্তাদ্দীপ্তানলার্কদ্যুতিমপ্রমেয়ম্।
কিরীটিং গদিনং চক্রহস্তমিচ্ছামি ত্বাং দ্রষ্টুমহং তথৈব।
তনৈব রূপেন চতুর্ভূজেন সহস্রবাহো ভব বিশ্বমূর্ত্তে॥

(গীতা ১০/১২–১৩; ১১/১৭,৪৬)

অর্জুন বলছেন – "আপনি-ই পরম ব্রহ্ম, পরম ধাম, আপনি-ই পরম পবিত্র, কেননা আপনাকে সকল ঋষিগণ সনাতন দিব্য পুরুষ, দেবতাদেরও আদিদেব, অজন্মা এবং সর্বব্যাপী বলে থাকেন ; সে রূপেই দেবর্ষি নারদ, অসিত, দেবলঋষি, মহর্ষি ব্যাস এবং স্বয়ং আপনিও আমাকে বলেছেন।" আপনাকে আমি মুকুটযুক্ত, গদাযুক্ত এবং চক্রযুক্ত সকলদিকে প্রকাশমান, তেজঃপুঞ্জ, প্রজ্বলিত অগ্নি এবং সূর্য্যের ন্যায় জ্যোতিযুক্ত, দেখতে অতি গহণ এবং অপ্রেমেয় স্বরূপ সর্বদিকেই দেখিতেছি।" "আমি সেইরূপ-ই আপনাকে মুকুটযুক্ত এবং হস্তে গদা ও চক্রযুক্ত দেখতে ইচ্ছা করি। অতএব হে বিশ্বরূপ ! হে সহস্রবাহো ! আপনি সেই চতুর্ভূজরূপ যুক্ত হোন অর্থাৎ আপনার চতুর্ভূজ রূপের দর্শন করান।"

ময্যাবেশ্য মনো যে মাং নিত্যযুক্তা উপাসতে ।
শ্রদ্ধয়া পরযোপেতাস্তে মে যুক্ততমা মতাঃ ॥ (গীতা ১২/২)

ভগবান বলেছেন– "আমাতে মন একাগ্র করে নিরন্তর আমার ভজন ও ধ্যানে মগ্ন হয়ে যে ভক্তগণ অতিশয় শ্রেষ্ঠ শ্রদ্ধার সহিত যুক্ত হয়ে সগুণ পরমেশ্বরূপ আমাকে ভজনা করেন তারা যোগীদিগের মধ্যেও অতি উত্তম যোগী বলে আমার মতে মান্য অর্থাৎ তাদের আমি শ্রেষ্ঠ বলে বিবেচনা করি।"

সঞ্জয় ধৃতরাষ্ট্রকে বলছেন –

তচ্চ সংস্মৃত্য সংস্মৃত্য রূপমত্যদ্ভুতং হরেঃ ।
বিস্ময়ো মে মহান্ রাজন্ হৃষ্যামি চ পুনঃ পুনঃ ॥

(গীতা ১৮/৭৭)

"হে রাজন্ ! শ্রীহরির সেই অতি অদ্ভুত রূপ পুনঃপুনঃ স্মরণ করে আমার চিত্তে অতিশয় আশ্চর্য্য হচ্ছে এবং আমি বারম্বার হর্ষিত হচ্ছি।"

উপর্যুক্ত শ্লোক সাকার স্বরূপের প্রতিপাদক। নীচে নিরাকার প্রতিপন্ন শ্লোক দেওয়া হচ্ছে।

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ ।
সর্বথা বর্ত্তমানোহপি স যোগী ময়ি বর্ত্ততে ।।(গীতা ৩/৩১)

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্ মাং প্রপদ্যতে ।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ ।। (গীতা ৭/১৯)
অব্যক্তোহক্ষর ইত্যুক্তস্তমাহুঃ পরমাং গতিম্ ।
যং প্রাপ্য ন নিবর্ত্তন্তে তদ্ধাম পরমং মম ।। (গীতা ৮/২১)
ময়া ততমিদং সর্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা ।
মৎস্থানি সর্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ ।।
ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্ ।
ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ ।। (গীতা ৯।৪-৫)
যে ত্বক্ষরমনির্দ্দেশ্যমব্যক্তং পর্য্যুপাসতে ।
সর্বত্রগমচিন্ত্যঞ্চ কূটস্থমচলং ধ্রুবম্ ।।
সংনিয়ম্যেন্দ্রিয়গ্রামং সর্বত্র সমবুদ্ধয়ঃ ।
তে প্রাপ্নুবন্তি মামেব সর্বভূতহিতে রতা ঃ।।(গীতা ১২।৩-৪)
বহিরন্তশ্চ ভূতানামচরং চরমেব চ ।
সূক্ষ্মত্বাত্তদবিজ্ঞেয়ং দূরস্থং চান্তিকে চ তৎ ।।
সমং সর্বেষু ভূতেষু তিষ্ঠন্তং পরমেশ্বরম্ ।
বিনশ্যৎস্ববিনশ্যন্তং যঃ পশ্যতি স পশ্যতি ।।
যদা ভূত পৃথগ্‌ভাবমেকস্থমনুপশ্যতি ।
তত এব চ বিস্তারং ব্রহ্ম সম্পদ্যতে তদা ।।
(গীতা ১৩-১৫, ২৭, ৩০)

ভগবান বলেছেন –

"যে পুরুষ একীভাবে স্থিত হয়ে সকলভূতে আত্মারূপে স্থিত সচ্চিদানন্দঘন বাসুদেবরূপে আমাকে ভজনা করে, সেই যোগী সর্বপ্রকারে নিযুক্ত থেকেও আমাতেই বর্ত্তমান আছে, কেননা তার অনুভবে আমি ব্যতীত আর কিছুই নেই । "অনেক জন্মের অন্তিম জন্মে তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত জ্ঞানী সর্বকিছুই বাসুদেব" এরূপে আমাকে ভজনা করেন, সেই মহাত্মা অতি দূর্লভ । যিনি অব্যক্ত ও অক্ষর বলে বর্ণিত হইয়াছেন, সেই অক্ষর নামক অব্যক্ত ভাবকে পরমগতি বলা হয় এবং সেই সনাতন অব্যক্তভাবকে প্রাপ্ত হয়ে মনুষ্য আর ফিরে আসে না, তাহাই আমার

পরম ধাম ।. সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মারূপ আমার দ্বারা এই জগৎ (বরফে জলের ন্যায়) পরিপূর্ণ রয়েছে এবং সকল ভূতসমূহ আমাতে সঙ্কল্পের আধারে স্থিত রয়েছে (এই নিমিত্ত প্রকৃত পক্ষে) আমি তাদের মধ্যে স্থিত নই এবং (সেই) ভূতগণ আমাতে স্থিত নহে; কিন্তু আমার যোগমায়া এবং প্রভাব দেখ, যে ভূতগণের ধারণ পোষনকারী ও ভূতগণের উৎপাদনকারী হয়েও আমার আত্মা বাস্তবপক্ষে ভূতগণে স্থিত নহে । যে পুরুষগণ ইন্দ্রিয়-সমুহকে উত্তমরূপে বশীভূত করে মন-বুদ্ধির অগোচর সর্বব্যাপী অকথনীয় স্বরূপ তথা সর্বদা একরূপে স্থিত নিত্য অচল, নিরাকার অবিনাশী সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে নিরন্তর একীভাবে ধ্যান করিতে করিতে উপাসনা করেন, সকল ভুতের হিতে রত এবং সর্বত্র সমভবে বিশিষ্ট যোগিগণ আমাকে-ই প্রাপ্ত হন । (পরমাত্মা) চরাচর (স্থাবর-জঙ্গম) সমস্তভূতে অন্তরে বাহিরে পরিপূর্ণ রয়েছেন এবং চরাচর রূপেও তিনিই রয়েছেন, সূক্ষ্ম হওয়ায় তিনি অবিজ্ঞেয় তথা অতি সমীপে এবং অতি দূরেও তিনিই রয়েছেন । যে পুরুষ বিনাশশীল সকল চরাচর ভূতগণের মধ্যে নাশরহিত পরমেশ্বরকে সমভাবে স্থিত দেখে সেই যথার্থরূপে দেখে । যে কালে ভূতগণের পৃথক পৃথক ভাবকে এক পরমাত্মার সঙ্কল্পের আধারে স্থিত দেখে এবং সেই পরমাত্মার সঙ্কল্প হইতে-ই সমস্ত ভূতগণের বিস্তার দেখে সেই কালে সে সচ্চিদানন্দঘন ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয় ।

প্রশ্ন- গীতায় বলা হয়েছে যে শিষ্য না বানিয়ে জ্ঞানের উপদেশ করা উচিত নয়, তাহলে অর্জুন কি শিষ্য ছিলেন ? তিনি কি পরমপদ প্রাপ্ত হয়েছিলেন ?

উত্তর - গীতায় কোথাও এ কথা বলা হয়নি যে, শিষ্য না বানিয়ে জ্ঞানের উপদেশ দেওয়া উচিত নয় । তথাপি অর্জুন নিজেকে ভগবানের শিষ্য বলে স্বীকারও করেছে **শিষ্যস্তেহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্যম্** (গীতা ২।৭) আমি আপনার শিষ্য, আপনার শরণাগত, আমায় শিক্ষা দিন - এরূপ বলিয়া অর্জুন শিষ্যত্ব স্বীকার করেছে এবং ভগবান এর প্রতিবাদ না করে বিভিন্ন স্থানে অর্জুনকে নিজের ইষ্ট, প্রিয় ভক্ত বলে

মেনে নিয়ে প্রকান্তরে তাকে শিষ্য বলে স্বীকারও করেছেন । অর্জুন পরমপদ লাভ করেছিলেন, মহাভারতের স্বর্গারোহন পর্বের চতুর্থ অধ্যায়ে এর উল্লেখ রয়েছে ।

প্রশ্ন - গীতা ভগবান কৃষ্ণের মুখ - নিঃসৃত বাণী না অন্য কেউ এর রচনা করেছেন ?

উত্তর - গীতা ভগবানের শ্রীমুখ-নিঃসৃত বচনামৃত ।

গীতায় শ্রীভগবানুবাচ বলে ভগবানের যে বচন রয়েছে তাঁর মধ্যে কিছুসংখ্যক শ্রুতি বাক্য শ্রুতি অনুয়ায়ী একই ভাবে পদ্যরুপে অর্জুনকে বলা হয়েছিল এবং অবশিষ্ট সংবাদ কথোপকথন রূপে হয়েছিল যা ভগবান ব্যাসদেব শ্লোকরুপে লিপিবদ্ধ করেছেন ।

*****
***
*
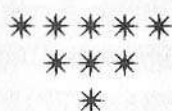
॥ শ্রী হরিঃ ॥

গীতোক্ত সন্ন্যাস বা সাংখ্যযোগ

জনৈক ব্যাক্তি প্রশ্ন করেছেন যে –

গীতায় বর্ণিত সন্ন্যাসের স্বরূপ কি ?

গীতার মর্ম বলে বোঝানো অতিশয় কঠিন । গীতা এমন এক গভীর (গহন) গ্রন্থ যে, অনেক বড়-বড় পন্ডিত এবং সাধু মহাত্মাগণ এতে বুদ্ধি খাটিয়ে নিজের নিজের মত প্রকট করেছেন, তা সত্ত্বেও যারা এই গীতা-শাস্ত্রের গভীরে প্রবেশ করে তারা এথেকে নিত্য নুতন অমূল্য-রত্ন ক্রমাগত পেয়ে যাচ্ছে, এমন যে শাস্ত্র তাঁর রহস্য সমন্ধে আমি কি বলব ! যদিও গীতা শাস্ত্রের বিবেচন করা আমার বুদ্ধির কাজ নয় তবুও আমি আমার সাধারণ বুদ্ধি অনুযায়ী মনে যা উপলব্ধি করেছি, সাধারণভাবে তা আপনাদের সামনে রাখছি । আমার উদ্দেশ্য বর্ণ, আশ্রম, সম্প্রদায়, মত বা কোন টিকাকারের উপর আক্ষেপ করা নয় । মনে যা উপলব্ধি হয়েছে শুধুমাত্র তা বলাই হল আমার উদ্দেশ্য ।

গীতোক্ত সন্ন্যাস সম্বন্ধে অতিশয় মতভেদ রয়েছে

(১) কারও মতে গীতায় সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ নামে দুই নিষ্ঠার বর্ণনা রয়েছে, এরমধ্যে কেবল সন্ন্যাস-ই মুক্তির প্রধান এবং প্রতক্ষ হেতু এবং সেই সন্ন্যাসের অর্থ হল পুরোপুরীভাবে জ্ঞানপূর্বক সমস্থ কর্মের স্বরুপে ত্যাগ করা অর্থাৎ শাস্ত্রে কথিত সন্ন্যাস আশ্রম গ্রহণ ।

(২) অপর পক্ষের মতে যদিও শাস্ত্রে-কথিত সন্ন্যাস আশ্রম অর্থাৎ জ্ঞানপূর্বক সমস্ত কর্মের স্বরুপে ত্যাগ করলেও ভগবদ্ প্রাপ্তি হতে পারে, কিন্তু গীতায় এর প্রতিপাদন করা হয় নি, কোন স্থানে বলা হলেও তা অতি গৌণরূপে রয়েছে । গীতা তো একমাত্র নিস্কাম কর্মযোগের-ই প্রতিপাদন করে এবং গীতায় কথিত সন্ন্যাস শব্দ-ও প্রায় ক্ষেত্রেই নিস্কাম কর্মযোগ প্রসঙ্গে বর্ণিত হয়েছে ।

(৩) তৃতীয় পক্ষ কর্ম স্বরূপে ত্যাগ-যুক্ত শাস্ত্রে কথিত সন্ন্যাস-আশ্রম স্বীকার করেও গীতায় কথিত সাংখ্য এবং কর্মযোগ নামে দুই ভিন্ন ভিন্ন নিষ্ঠাকে ভগবদ্ প্রাপ্তির দুই স্বতন্ত্র-সাধন বলে স্বীকার করে এবং সাংখ্য বা সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সন্ন্যাস-আশ্রম বলে স্বীকার করে না। এই মত অনুযায়ী সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ব-অভিমান রহিত হয়ে সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় একীভাবে স্থিত থাকাকে সন্ন্যাস বলে।

গৌণরূপে আরও অনেক মতামত রয়েছে, কিন্তু বলতে গেলে সে-সবই প্রায় উপর্যুক্ত তিনটি মতের অন্তর্গত হয়ে থাকে। এখন আমাদের দেখতে হবে যে এদের মধ্যে থেকে কোন মতটি অধিক যুক্তিযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী। ক্রমে এর উপরে বিবেচনা করা হচ্ছে ----

(১) প্রথম মত অনুযায়ী যদি সন্ন্যাস-কেই মুক্তির একমাত্র কারণ বলে স্বীকার করা হয়, তাহলে গীতায় যেখানে ভগবান বলেছেন -

যৎ সাংখ্যৈঃ প্রাপ্যতে স্থানং তদ্‌যোগৈরপি গম্যতে ।
(গীতা ৫/৫)

জ্ঞানযোগীদিগের দ্বারা যে পরমধাম প্রাপ্ত করা হয় নিস্কাম কর্মযোগী দিগের দ্বারাও তাহাই প্রাপ্ত করা যায়-এই বাক্য অর্থহীন হয়ে পড়ে। এখানে স্পষ্টরূপে সাংখ্যযোগের সমান-ই নিস্কাম কর্মযোগকেও স্বতন্ত্র সাধন বলে স্বীকার করা হয়েছে। এ ছাড়াও এই অধ্যায়ের দ্বিতীয় শ্লোকে সন্ন্যাস এবং কর্মযোগ উভয়কেই পরম কল্যাণকারী বলা হয়েছে এবং কর্মযোগকে সন্ন্যাস অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতে ইহা কিরূপে বলা সম্ভব যে নিস্কাম কর্মযোগ মুক্তির স্বতন্ত্র সাধন নয়? সাধনার প্রকারে অবশ্যই উভয় সাধনে যথেষ্ট তফাৎ রয়েছে এবং এই দুই সাধনের অধিকারীও দুই প্রকারের হয়ে থাকে, একই সঙ্গে উভয় প্রকারের সাধনা হওয়া সম্ভব নয়। বিভিন্ন সময়ে একই সাধক উভয় প্রকারের সাধনাও করতে পারে। কাজেই ইহা প্রামাণিত হল যে উভয় সাধন-ই মোক্ষ লাভের দুই ভিন্ন ভিন্ন পথ। এখন ইহা বিচার্য্য যে এক্ষেত্রে সন্ন্যাস বাক্য দ্বারা শাস্ত্রে কথিত সন্ন্যাস আশ্রম বলা হয়েছে কিংবা অন্য কিছু? অর্জুনের এই প্রশ্নে –

সংন্যাসং কর্মনাং কৃষ্ণ পুনর্যোগং চ শংসসি ।
যচ্ছ্রেয় এতয়োরেকং তন্মে ব্রুহি সুনিশ্চিতম্ ।।
(গীতা ৫ / ১)

হে কৃষ্ণ ! আপনি সমস্ত কর্মের সন্ন্যাসের এবং পুণরায় নিস্কাম কর্মযোগের প্রশংসা করছেন, কাজেই এই দুইটির মধ্যে যে একটি নিশ্চয়কৃত কল্যাণকারী তাহা আমাকে বলুন । যদি এরূপ মেনে নেওয়া হয় যে গীতায় সন্ন্যাস শব্দ দ্বারা শাস্ত্রোক্ত সন্ন্যাস আশ্রম বা কর্ত্তব্য কর্মের স্বরূপে ত্যাগ করার তাৎপর্য্য রয়েছে, তাহলে ইহাও যুক্তিযুক্ত নয় কেননা এর পূর্বে ভগবান কোথাও এরূপ আশ্রম বিশেষের বা কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগের প্রশংসা করেন নি যাতে করে অর্জুনের প্রশ্নের এরূপ অভিপ্রায় রয়েছে বলে ধরে নেওয়া যায় । উপরন্তু ভগবান এর পূর্বে বিভিন্ন স্থানে জ্ঞান, বৈরাগ্য প্রভৃতি সাত্ত্বিক ভাব তথা শরীর, ইন্দ্রিয় এবং মন দ্বারা হওয়া সমস্ত ক্রিয়ায় কর্ত্তৃত্ত্ব-অভিমান পরিত্যাগ করার প্রশংসা করেছেন । শুধু তাই নয় এর সঙ্গে সঙ্গে জ্ঞানীর শরীর দ্বারা নিয়ত-কর্ম করে যাওয়ার আবশ্যকতার প্রতিপাদন করেছেন (গীতা ৩।২০-২৩, ২৫-২৭, ২৯, ৩৩ ঃ অঃ ৪।১৫) । সম্যক (যথার্থ) জ্ঞানপূর্বক সন্ন্যাস আশ্রমে সহজভাবে মুক্তি হয়ে থাকে, এতে কোনও সন্দেহ নেই, কিন্তু আমার মনে হয় সেই মুক্তি সন্ন্যাস আশ্রমের উপর নির্ভর নয়, ওতে কারণ হচ্ছে যথার্থ জ্ঞান, যা সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমে উপলব্ধ হতে পারে । গীতা (৬-১,২)

ইহা ছাড়াও গীতায় ইহা নির্বিবাদে প্রমাণিত যে, সমস্ত কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ কখনই হতে পারে না,

ন হি কশ্চিৎ ক্ষনমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্মকৃত ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম সর্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ ।।
(গীতা ৩/ ৫)

যদি কেউ এরূপ ত্যাগও করে তবে গীতা সেই ত্যাগকে তামসী ত্যাগ বলে, –

নিয়তস্য তু সন্ন্যাসঃ কর্মণো নোপপদ্যতে ।
মোহাত্তস্য পরিত্যাগস্তামতঃ পরিকীর্তিতঃ ।।
(গীতা ১৮/ ৭)

এবং শুধু সেই উপরের ত্যাগ দ্বারা সিদ্ধি প্রাপ্ত না হবার কথাও বলেছে –

ন চ সংন্যসনাদেব সিদ্ধিং সমধিগচ্ছতি । (গীতা ৩। ৪)

উপরন্তু এর পরের শ্লোকে বাণী এবং ইন্দ্রিয় সমূহ দ্বারা হটপূর্বক কর্মের ত্যাগ করে মনে মনে বিষয়-চিন্তন করার নিন্দা করা হয়েছে এবং তাকে মিথ্যেচারী বলা হয়েছে গীতা ৩/৬ । এর পর বশীভূত ইন্দ্রিয়-সমূহ দ্বারা অনাসক্ত ভাবে কর্মযোগের আচরণকারীকে শ্রেষ্ঠ বলা হয়েছে। (গীতা ৩। ৫)

কাজেই বাহ্যিক কর্মসমূহকে শুধু স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করলেই এতে মুক্তির সম্ভাবনা বলে ধর নেওয়া যায় না এবং যদি মুক্তি হয়ে থাকে তাহলে ভগবান যে বলেছেন –

সন্ন্যাসঃ কর্মযোগশ্চ নিঃশ্রেয়সকরাবুভৌ । (গীতা ৫। ২)

কর্মের সন্ন্যাস এবং নিষ্কাম কর্মযোগ এই দুটিই কল্যাণকারী, এই সিদ্ধান্তে বাধার সৃষ্টি হয় । কেননা শুধু বাহ্যিক ভাবে কর্মের স্বরূপতঃ ত্যাগীকে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী তামস ত্যাগী বলা হয়েছে ।

এইস্থানে বর্ণিত 'নিঃশ্রেয়স' এবং তৃতীয় অধ্যায়ের চতুর্থ শ্লোকে বর্ণিত 'সিদ্ধিম্' এই ভভয়েরই অর্থ হচ্ছে কল্যাণ অর্থাৎ মুক্তি । যদি সেখানে বর্ণিত সিদ্ধি শব্দকে মুক্তির অর্থে না নিয়ে নিম্নশ্রেণীর অবস্থা বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে কর্মত্যাগে কল্যাণ না হবার দিক্‌টি আরও পরিপুষ্ট হয়, অর্থাৎ নিম্ন শ্রেণীর সিদ্ধিও যখন কর্মত্যাগের ফলে হয় না তাহলে মোক্ষরূপী পরম সিদ্ধি কি করে হতে পারে ? এইভাবে সবদিক ভেবে দেখলে এটাই প্রতিপাদিত হয় যে গীতায় সন্ন্যাস শব্দ জ্ঞানযোগের বোধক নয়, এর সম্বন্ধ রয়েছে অন্তঃকরণের ভাবে, কোন বাহ্যিক অবস্থার সঙ্গে নয় । কোন বর্ণ বা আশ্রমের সঙ্গেও এর সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হয় না । ভগবদ্ প্রাপ্তির ইহা এক মূল্যবান সাধন, যা সকল বর্ণ এবং সকল আশ্রমে (ব্রহ্মচর্য্য, গার্হস্থ, বানপ্রস্থ, এবং সন্ন্যাস) কাজে লাগতে পারে ।

লোকেদের ধারনা যে সাংখ্যনিষ্ঠার অধিকার শুধু সন্ন্যাস আশ্রমেই রয়েছে, কিন্তু এই ধারনা ঠিক বলে মনে হয় না। যদি এরূপ হত তাহলে গীতায় দ্বিতীয় অধ্যায়ের ১১ থেকে ৩০ শ্লোক পর্যন্ত যেখানে ভগবান সাংখ্যনিষ্ঠার বিস্তৃত বর্ণনা করেছেন, অর্জুনকে যুদ্ধের জন্য উৎসাহিত করতেন না (গীতা ২/১৮)। এবং অষ্টাদশ অধ্যায়ে যখন অর্জুন স্পষ্টরূপে ত্যাগ এবং সন্ন্যাসের স্বরূপ জানাবার জন্য প্রশ্ন করলেন তখন ভগবান প্রথমে ত্যাগের স্বরূপ ফলাসক্তির ত্যাগ বলে (গীতা ১৮/৯-১১,) পরে সাংখ্য অর্থাৎ সন্ন্যাসের সিদ্ধান্ত শোনাবার কথা বলে পরে স্পষ্ট ভাবে বলেছেন যে পাঁচটি কারণে ঘটিত প্রাকৃতিক কর্মে অশুদ্ধ বুদ্ধি হওয়ার ফলে যে (বিশুদ্ধ) আত্মাকে কর্তা বলে মানে সেই দুর্মতি আত্মাস্বরূপকে যথার্থ দেখে না অর্থাৎ যার কর্তৃত্ব-ভাব রয়েছে সে সাংখ্যযোগী নয়। সাংখ্যযোগী তাকেই বলা হয়ে যে –

যস্য নাহঙ্কৃতো ভাবো বুদ্ধির্যস্য ন লিপ্যতে।
(গীতা ১৮/ ১৭)

যার মধ্যে 'আমি করছি' এই ভাব থাকে না এবং যার বুদ্ধি সাংসারিক পদার্থে এবং কর্মে লিপ্ত হয় না – অতএব অহংকারের ত্যাগকেই সন্ন্যাস বলে। ভগবান যদি স্বরূপতঃ ত্যাগকে সন্ন্যাস বলে মানতেন তাহলে মন থেকে ত্যাগ করার জন্য বলতেন না (গীতা৫/১৩)।

কাজেই ইহা প্রমাণিত হল যে স্বরূপে কর্ম ত্যাগ করাকে সাংখ্য অথবা সন্ন্যাস বলা হয় না এবং সন্ন্যাসের মতই নিস্কাম কর্মযোগও মুক্তির সরাসরী উপায়।

(২) দ্বিতীয় পক্ষের মতে যদি এটা মানা হয় যে গীতায় শুধুমাত্র নিস্কাম কর্মযোগের-ই বর্ণনা করা হয়েছে এবং সন্ন্যাস শব্দ-ও এরই অন্তর্গত, তাহলে এটাও যুক্তিযুক্ত মনে হয় না, কেননা অর্জুনের জিজ্ঞাসার মিমাংসা করতে গিয়ে ভগবান অধিকারী অনুযায়ী দুই নিষ্ঠার স্বতন্ত্র বর্ণনা করেছেন –

লোকেঽস্মিন্ দ্বিবিধা নিষ্ঠা পুরা প্রোক্তা ময়ানঘ।
জ্ঞানযোগেন সাংখ্যানাং কর্মযোগেন যোগিনাম্ ॥
(গীতা ৩/ ৩)

দ্বিতীয় অধ্যায়ে তো এই দুই নিষ্ঠা বিভাগ পূর্বক পৃথক পৃথক বর্ণনা করা হয়েছে।

সাংখ্যযোগের বর্ণনা করে ভগবান বলেছেন যে –

এই বুদ্ধি তোমাকে জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হল এবং ইহাকেই (এখন) নিস্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন। এরূপে আরও বিভিন্ন বাক্য রয়েছে যার ফলে এই দুই নিষ্ঠার স্বাতন্ত্র প্রমাণিত হয় (গীতার ৫ অধ্যায়ের ১ থেকে ৫ পর্যন্ত শ্লোক দেখুন)। এতে কোন সন্দেহ নেই যে দুই নিষ্ঠার ফলরূপ প্রাপ্তি এক পরমাত্মাতেই ; কিন্তু দুটির স্বরূপ সর্বথা ভিন্ন, এই দুই নিষ্ঠার অনুষ্ঠানকারী সাধকের কার্য্য এবং বিচার প্রণালী, ভাবধারা এবং পথ সর্বথা ভিন্ন ভিন্ন। নিস্কাম কর্মযোগী সাধনা কালে কর্ম, কর্মফল, পরমাত্মা এবং নিজেকে ভিন্ন ভিন্ন মনে করে কর্মে ফল এবং আসক্তি পরিত্যাগ করে ঈশ্বরপরায়ণ হয়ে ঈশ্বর অর্পিত বুদ্ধি দ্বারাই সমস্ত কর্ম করে থাকে (গীতা ৩।৩০; ৪।২০; ৫।১০; ৯।২৭-২৮ ; ১২/১১-১২ ; ১৮/৫৬-৫৭)।

কিন্তু সাংখ্যযোগী মায়াদ্বারা উৎপন্ন গুণসমূহ গুণসমূহেতে প্রবৃত্ত রয়েছে এরূপ মনে করে মন, ইন্দ্রিয় এবং শরীর দ্বারা হওয়া সম্পূর্ন ক্রিয়ায় কর্ত্তৃত্বের অভিমান রহিত হয়ে কেবল এক সর্বব্যাপী সদ্দিচানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে অনন্যভাবে নিরন্তর স্থিত থাকে। (গীতা ৩/২৮; ৫/৮-৯, ১৩; ৬/৩১; ১৩/২৯-৩০; ১৪/১৯-২০; ১৮/১৭, ৪৯-৫৫)।

নিস্কাম কর্মযোগী নিজেকে কর্মের কর্ত্তা রূপে স্বীকার করে (গীতা ৫-১১) সাংখ্যযোগী নিজেকে কর্ত্তা স্বীকার করে না (৫/৮-৯), নিস্কাম কর্মযোগী তাঁর দ্বারা কৃত কর্মের ফল ভগবানে অর্পণ করে থাকে (৯/২৭-২৮), সাংখ্যযোগী মন এবং ইন্দ্রিয় সমূহদ্বারা ঘটিত ক্রিয়াকে কর্ম বলে মানে না (১৮/১৭)। নিস্কাম কর্মযোগী পরমাত্মা থেকে নিজেকে ভিন্ন জ্ঞান করে (১২/৬-৭), সাংখ্যযোগী সর্বদাই অভেদ বলে মানে (৬/২৯-৩১ ; ৭/১৯, ১৮/২০)। নিস্কাম কর্মযোগী প্রকৃতি এবং প্রকৃতির সত্তা স্বীকার করে (১৮/৯, ৬১)। সাংখ্যযোগী এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর

কারও সত্তা স্বীকার করে না (১৩/৩০), যদি কোনও ক্ষেত্রে মেনে নেওয়ার মত পরিলক্ষিত হয় তবে তা কেবল অধ্যারোপিত ভাবে অন্যকে শুধু বোঝাবার জন্য, যথার্থে নয়। সে প্রকৃতিকে মায়ামাত্র জানে, আসলে কোন কিছুই স্বীকার করে না, নিস্কাম কর্মযোগী কর্ম দ্বারা ফল উৎপন্ন হয় এরূপে মনে করে নিজেকে ফল ও আসক্তির ত্যাগী মনে করে থাকে, অর্থাৎ কর্ম এবং কর্মফলের আলাদাভাবে অস্তিত্ব স্বীকার করে। সাংখ্যযোগী কর্ম এবং কর্মফলের আলাদাভাবে সত্ত্বা স্বীকার করে না এবং এর সঙ্গে নিজের কোন সম্বন্ধও স্বীকার করে না। নিস্কাম কর্মযোগী কর্ম করে কিন্তু সাংখ্যযোগীর ক্ষেত্রে স্বভাব দ্বারা স্বাভাবিক ভাবেই কর্ম হয়ে থাকে, সে করে না (গীতা ৫/১৪)। নিস্কাম কর্মযোগীর মুক্তিতে তাঁর বিশুদ্ধ নিষ্কামভাব, ভগবদ্ শরণাগতি এবং ভগবদ্ কৃপা হেতু হয়ে থাকে (২ / ৫১ ; ১৮ / ৫৬)। সাংখ্যযোগীর মুক্তিতে হেতু হয় তাঁর এক সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় অভিন্ন ভাবে নিরন্তর গাঢ় স্থিতি (৫/১৭, ২৪)। এইভাবে পরিণামে কোন বিরোধ না থাকলেও দুই সাধন মার্গে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে এই দুইটি সর্বথা স্বতন্ত্র। এতে কোনও সন্দেহ নেই যে অর্জুনের পক্ষে উপযোগী মনে করে ভগবান তাকে নিষ্কাম ভক্তিযোগের জন্য আদেশ দিয়েছেন, কিন্তু গীতায় সাংখ্যনিষ্ঠার বর্ণনাও কম হয়নি এবং বিভিন্ন স্থানে ভগবান সাংখ্যনিষ্ঠার যথেষ্ট প্রশংসা করেছেন। কর্মযোগের বিশেষত্ব এই কারণে চিহ্নিত করা হয়েছে যে উহা সহজ-সাধ্য এবং দেহাভিমানী ব্যক্তিও এর সাধনা করতে পারে কিন্তু অপেক্ষাকৃত ভাবে সাংখ্যযোগ বেশ কঠিন (গীতা ৫/৬ শ্লোক দেখুন)। এভাবে ইহা প্রমানিত হল যে গীতায় উভয় নিষ্ঠারই বর্ণনা রয়েছে। শুধু কর্মযোগ কিংবা শুধু সাংখ্যযোগ প্রতিপাদ্য করা হয়নি এবং সন্ন্যাস শব্দটি কর্মযোগের অন্তর্গত নয়।

এই বিশ্লেষণের ফলে এটা স্পষ্ট যে গীতায় উভয় নিষ্ঠার বর্ণনা রয়েছে এবং সেখানে সাংখ্য বা সন্ন্যাস শব্দের অর্থ কর্মের স্বরূপে ত্যাগ নয়।

(৩) এবারে তৃতীয় পক্ষের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিবেচনা করলে এই সিদ্ধান্ত অধিক যুক্তিযুক্ত এবং হৃদয়গ্রাহী মনে হয়। বাস্তবিক পক্ষে গীতায় সন্ন্যাস শব্দের অর্থ সাংখ্য বা জ্ঞানযোগ বলেই ধরা হয়েছে। সন্ন্যাস, সাংখ্যযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতি শব্দের দ্বারা একই নিষ্ঠার বর্ণনা করা হয়েছে। গীতায় ১৮ অধ্যায়ের ৪৯ থেকে ৫৫ শ্লোক পর্যন্ত এই জ্ঞান নিষ্ঠার সবিস্তারে বর্ণনা রয়েছে। ৪৯ নং শ্লোকে **"পরমং নৈষ্কর্ম্যসিদ্ধিম্"** বলে সন্ন্যাস দ্বারা যার প্রাপ্তির ইঙ্গিত করা হয়েছে সেই সন্ন্যাসের অর্থ হল জ্ঞানযোগ। এই শ্লোকসমূহের বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে অভেদরূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মার যে ধ্যান করা হয় এবং সেই ধ্যানের যে ফল লাভ হয়, উহাকে পরাভক্তি বলে এবং উহাই এই জ্ঞানযোগের পরানিষ্ঠা। এই ধরনের জ্ঞানযোগের সাধক সংসারের সমস্ত পদার্থে এবং কর্মে ত্রিগুণময়ী মায়ার বিস্তার মনে করে নিজেকে দ্রষ্টা সাক্ষী বলে জানে (গীতা ১৪/১৯-২০)। এবং সে সর্বক্ষণ ব্রহ্ম থেকে সর্বদা নিজেকে অভিন্ন জ্ঞান করে ব্রহ্মে বিচরণ করে (গীতা ৫/২৬ ; ৬/৩১)। সে মায়াতে সকল কর্মের বিস্তার দেখে (গীতা ৩/২৭-২৮)। সে শরীর এবং মন-ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা ঘটিত সম্পূর্ন ক্রিয়ার কর্ত্তৃত্ব ভাবের অত্যন্ত অভাব অনুভব করে। ইন্দ্রিয় সমূহ-ই নিজ নিজ বিষয়ে প্রবৃত্ত রয়েছে, আত্মা এ থেকে পর এবং ভিন্ন, এরূপ জেনে সাধনা কালেও সে নিজের মধ্যে কর্ত্তৃত্ব ভাবের অভাব দেখে, পরন্তু মায়ার স্থানে সে এক ব্রহ্মের-ই বিস্তার দেখে এবং এভাবে দৃঢ় ধারনা হলে তাঁর দৃষ্টিতে এক ব্রহ্ম ভিন্ন আর কিছু-ই থাকে না। সম্পূর্ণ সংসারকে সে এক ব্রহ্মের-ই কার্য্যরূপ দেখে। সাধনা কালে প্রকৃতি এবং প্রকৃতির কার্য্যকে আত্মা থেকে ভিন্ন, অনিত্য এবং ক্ষনিক দেখে এবং নিজেকে অকর্তা, অভোক্তা মনে করে একমাত্র আত্মাকে সর্বত্র ব্যাপক মনে করে সাধনায় রত থাকে এবং শেষে যখন এক ব্রহ্মের সত্তা ছাড়া অন্য সমস্ত কিছুর অত্যন্ত অভাব হয়ে যায়, তখন সে সেই অনির্বচনীয় পরমপদ প্রাপ্ত হয়, তাঁর দৃষ্টিতে এক ব্রহ্মের সত্তার অতিরিক্ত আর কিছুই থাকে না। মন, বুদ্ধি এবং অন্তঃকরণ

প্রভৃতিও ব্রহ্মস্বরূপ হয়ে যায়, এক বাসুদেব ভিন্ন আর কোন কিছুরই অবশেষ থাকে না (গীতা ৫/১৭ ; ৭/১৯) ।

সে এই চরাচর সংসারের বাহিরে অন্তরে এবং চরাচরকেও পরব্রহ্ম পরমাত্মার রূপ মনে করে (গীতা ১৩/১৫) ।

এই ধরণের ব্যক্তি দ্বারা সাধনা কালে এবং সিদ্ধিলাভের পরেও লোকদৃষ্টিতে কর্ম হতে পারে কিন্তু সেই সমস্ত কর্মে এবং সংসারের সম্পূর্ণ পদার্থে তাঁর এক ব্রহ্ম ভিন্ন অন্য কোন দৃষ্টি না থাকায় এবং কর্তৃত্বের অভাবের ফলে তার সেই কর্মকে কর্ম বলা যায় না (দেখুন গীতা ১৮/১৭) ।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণের ফলে ইহা প্রমানিত হল যে তৃতীয় পক্ষের সিদ্ধান্ত অনুসারে গীতায় কথিত সন্ন্যাস, সন্ন্যাস-আশ্রম নয় পরন্ত সমস্ত কর্মে কর্তৃত্ব অভিমান রহিত হয়ে একমাত্র সর্বব্যাপী সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মায় ঐক্য-ভাবে যুক্ত হয়ে নিত্য স্থিত থাকাকে সন্ন্যাস বলা হয় এবং সেইজন্য সকল বর্ণ এবং সকল বর্ণব্যবস্থায় ইহা কার্য্যকারী । এরই নাম জ্ঞানযোগ, সাংখ্যযোগ এবং একেই গীতোক্ত সন্ন্যাস বলা হয় ।

এর সঙ্গে এটাও ঠিক যে গীতায় কর্মযোগ নামে অন্য এক স্বতন্ত্র সাধন পথেরও বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে, এতে সাধক ফল এবং আসক্তি ত্যাগ করে ভগবদ্ আজ্ঞানুসারে কেবলমাত্র ভগবানের জন্যই সম-বুদ্ধি যুক্ত হয়ে কর্ম করে । গীতায় ইহাকেই সমত্বযোগ, বুদ্ধিযোগ, কর্মযোগ, তদর্থকর্ম, মদর্থকর্ম, প্রভৃতি নামে বলা হয়েছে । এই নিষ্কাম কর্মযোগের মধ্যেও ভক্তিপ্রধান কর্মযোগ প্রধান এবং এর দ্বারা সাধক শীঘ্র কল্যাণ প্রাপ্ত হয় । (গীতা ৬/৪৭)

কাজেই এই দুই প্রকারের নিষ্ঠা দ্বারাই মুক্তি সম্ভব । কিন্তু কেউ যেন এরূপ না ভাবেন যে আমি শাস্ত্রে কথিত সন্ন্যাস আশ্রমের বিরোধী কিংবা যারা সন্ন্যাস আশ্রমে রয়েছেন তাদের যথার্থ জ্ঞান লাভ অর্জন করে মুক্তি লাভ স্বীকার করি না । কিন্তু আমার মনে হয় গীতায় কথিত সন্ন্যাস কোনও বিশেষ বর্ণ ব্যবস্থার উপর নির্ভর না হয়ে শুধু জ্ঞানের উপর অবলম্বিত রয়েছে, কাজেই গীতায় সকলেরই অধিকার রয়েছে ।

আমি তো এটাও স্বীকার করি যে, সাংখ্যনিষ্ঠার আগ্রহী সাধকের সন্ন্যাস আশ্রম অধিক সুবিধাকারী। অস্তু –

কারও মতে গীতায় কথিত সাংখ্য শব্দ মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শনের সমার্থক, কিন্তু ভেবে দেখলে এটা ঠিক মনে হয় না। গীতায় কথিত সাংখ্য মহর্ষি কপিল প্রণীত সাংখ্যদর্শন নয়, এর সম্বন্ধ হচ্ছে জ্ঞানের সঙ্গে। গীতায় ১৩ অধ্যায়ে ১৯-২০ নং শ্লোকে প্রকৃতি-পুরুষ শব্দ কথিত হয়েছে এবং সাংখ্যদর্শন গ্রন্থে দেখতে একই রকমের মত মনে হয় কিন্তু এতে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে।

সাংখ্যদর্শন পুরুষ অনেক (নানাত্ব) এবং তাঁর সত্ত্বাকে ভিন্ন-ভিন্ন বলে স্বীকার করে কিন্তু গীতা এক-ই পুরুষের অনেক রূপ স্বীকার করে (দেখুন গীতা ১৩/২২, ১৮/২০)। গীতায় ভূতসমূহের বিভিন্ন ভাব-কে একই পুরুষের ভাব বলা হয়েছে। সাংখ্যদর্শন সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে স্বীকার করে না, কিন্তু গীতা সৃষ্টিকর্ত্তা ঈশ্বরকে মুক্ত কণ্ঠে স্বীকার করে। এতে ইহাই প্রমাণিত হয় যে, গীতায় কথিত সাংখ্য মহর্ষি কপিল কথিত সাংখ্য থেকে ভিন্ন।

পুনশ্চ আরও লক্ষ্য করার বিষয় যে, গীতায় কথিত ধ্যানযোগ উভয় নিষ্ঠার সঙ্গে রয়েছে। সেইজন্য ভগবান ধ্যানযোগকে কোন পৃথক নিষ্ঠারূপে বলেন নি। ধ্যানযোগ নিস্কাম কর্মের সংঙ্গে ভেদরূপে এবং সাংখ্যযোগে অভেদরূপে থাকে। নিরন্তর সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার সঙ্গে অনন্য ভাবে যুক্ত হয়ে ধ্যান না হলে তো সাংখ্যযোগ সিদ্ধ হতে পারে না।

এই দুই নিষ্ঠা ছাড়াও শুধুমাত্র ধ্যানযোগ দ্বারাও পরমপদের প্রাপ্তি হতে পারে।

ধ্যানেনাত্মনি পশ্যন্তি কেচিদাত্মানমাত্মনা।
অন্যে সাংখ্যেন যোগেন কর্মযোগেন চাপরে।।

(গীতা ১৩/২৪)

(এছাড়া দ্রষ্টব্য ৯/৪-৫, ৬ ; ১২/৮)

কিন্তু ইহাকে স্বতন্ত্র নিষ্ঠা বলা যাবে না, কেননা অভেদরূপের ধ্যান সাংখ্যযোগ এবং ভেদরূপের ধ্যান কর্মযোগের অন্তর্গত বলে মানা হয়ে থাকে। ধ্যানযোগের সাধনা আলাদা ভাবে বলার কারণ হল, ইহা কর্ম কিংবা কর্ম-ত্যাগের উপর নির্ভর করে না, উপরন্তু উভয়েরই সাহায্যকারী হয়ে থাকে। কর্মের আশ্রয় কিংবা কর্মের ত্যাগ না করেও কেবলমাত্র ধ্যানযোগ দ্বারাও মুক্তি হওয়া সম্ভব।

এই সাধন অত্যন্ত উপযোগী এবং স্বতন্ত্র হওয়া সত্ত্বেও নিষ্ঠারূপে একে আলাদা বলা হয় নি। অতএব সাধকের উচিত সে যেন নিজ নিজ যোগ্যতা অধিকার অনুসারে ধ্যানযোগ সঙ্গে রেখে দুই নিষ্ঠার মধ্যে যে কোন একটি-কে অবলম্বন করে ভগবদ্ প্রাপ্তির জন্য প্রযত্ন করে।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

গীতায় কথিত নিষ্কাম কর্মযোগের স্বরূপ

গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ ভক্তিমিশ্রিত না ভক্তিরহিত ? যদি ভক্তিমিশ্রিত হয়, তাহলে এর স্বরুপ কি ?

এই প্রশ্নের উপরে বিচার বিবেচনা আরম্ভ করার পূর্বে কর্মের বিভিন্ন স্বরূপের উপরে যৎকিঞ্চিৎ ভেবে দেখার আবশ্যকতা রয়েছে বলে মনে হয়। বিভিন্ন ধরনের কর্ম রয়েছে, যাহা আমরা প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করতে পারি – নিষিদ্ধকর্ম, কাম্যকর্ম এবং কর্ত্তব্য-কর্ম।

চুরি, ব্যভিচার, হিংসা, অসত্য, কপটতা, ছল-চাতুরী, জোর-জবরদস্তি করা, অভক্ষ্য-ভক্ষণ এবং প্রমাদ প্রভৃতিকে নিষিদ্ধ কর্ম বলা হয়।

স্ত্রী, পুত্র, অর্থ প্রভৃতি প্রিয় বস্তু পাওয়ার জন্য এবং রোগ-আপদ-বিপদ প্রভৃতির নিবৃত্তির জন্য যে কর্ম করা হয়, উহাকে কাম্যকর্ম বলে।

ঈশ্বরের ভক্তি, দেবতাদের পূজন, যজ্ঞ, দান, তপ, মাতা-পিতা তথা গুরুজনদের সেবা, বর্ণ এবং আশ্রম-ধর্ম অনুযায়ী ধর্ম-পালন এবং শরীর সম্বন্ধীয় পান-ভোজন প্রভৃতিকে কর্ত্তব্য-কর্ম বলা হয়।

কর্ত্তব্য-কর্মও কামনাযুক্ত হলে কাম্য-কর্মের অন্তর্গত বলে ধরা যেতে পারে কিন্তু এতে বর্ণাশ্রমের স্বভাবিক ধর্ম এবং জীবিকা-নির্বাহের কর্মও সম্মিলিত থাকার ফলে, মনুষ্যের ক্ষেত্রে ইহা পালন করার এক বিশেষ দায়িত্ব রয়েছে। কোনও কিছু পাবার আশা নিয়ে শাস্ত্রোক্ত কাম্য কর্ম করা বা না করা নিজের নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে, কাজেই এতে পার্থক্য থাকে।

এই তিন প্রকারের কর্মের মধ্যে নিষিদ্ধ কর্মর সর্বথা ত্যাগ করা তো সকলের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মোক্ষ-লাভে ইচ্ছুক ব্যক্তিদের তো কাম্য-

কর্মে কোন প্রয়োজন নেই। অবশিষ্ট কর্ত্তব্য-কর্মেও ভাব অনুযায়ী সকাম এবং নিষ্কাম উভয় প্রকারেরই হয়ে থাকে।

সকাম-কর্ম

যে মুহূর্ত্তে সকাম-কর্মে প্রবৃত্ত হবার ইচ্ছা জাগে সেই ক্ষণ থেকে আরম্ভ করে কর্ম সমাপ্ত হবার পর চিরকাল পর্যন্ত মনে শুধু ফলের অনুসন্ধান হতে থাকে। যারা এরূপ কর্ম করে তাদের চিত্ত প্রতি পদে পদে ফল লাভের আশায় উন্মুখ হয়ে থাকে। যদি অর্থ লাভের আশায় কর্ম করা হয়ে থাকে তাহলে প্রতিটি মুহূর্ত্ত অর্থের স্মৃতি হতে থাকে এবং তাদের চিত্ত-বৃত্তিও অর্থরূপে পরিণত হয়। কর্মের সফলতায় যখন সে অর্থ লাভ করে তখন সে খুব খুসী হয় এবং বিফলতায় অর্থাৎ অর্থ প্রাপ্তি না হলে বা এতে কোন অন্তরায় ঘটলে তাঁর খুব দুঃখ হয়। তাঁর চিত্ত ফলানুসন্ধানে নিমজ্জিত থাকার ফলে প্রায় নিরন্তর ব্যথিত এবং অশান্ত থাকে। এরূপ পুরুষের বিষয়বিমোহিত চিত্ত কখনও কখনও তাকে নিষিদ্ধ কর্মেও প্রবৃত্ত করাতে পারে। যদিও শাস্ত্রোচিত কর্মে নিয়োজিত সকামী পুরুষ নিষিদ্ধ কর্মের আচরণে প্রবৃত্ত হতে চায় না, তবুও ভিতরে বিষয় জনিত লোভ থাকার ফলে তাঁর পতন হবার ভয় থাকে। যদি কর্মের অনুষ্ঠানে কোনও ত্রুটি ঘটে তাহলে সে সফল হয় না উপরন্তু প্রায়শ্চিত্ত বা দুঃখের ভাগীদার হয়। কিন্তু –

নিষ্কাম-কর্ম

আচরণ করে-এরূপ পুরুষের স্থিতি সকামী পুরুষের চেয়ে অতি বিলক্ষণ (অসাধারণ) হয়ে থাকে। তাঁর মনে কোনও প্রকারের সাংসারিক কামনা থাকে না, সে যা কিছু কর্ম করে, ফলের ইচ্ছার পরিত্যাগ করে এবং আসক্তিরহিত হয়ে করে। এখানে এই প্রশ্ন উঠতে পারে যে, যদি তাঁর ফলের কোন ইচ্ছা নেই তাহলে সে কর্ম-ই বা কেন করবে ? সংসারে সাধারণ কোন লোক হেতু ছাড়া কোন কর্ম করতেই পারে না, এবং হেতু কোন না কোন ফলেরই হয়ে থাকে। এটা ঠিক, সাধারণ

মনুষ্যের কর্মে প্রবৃত্ত হওয়ার পিছনে কোন হেতু থাকা অনিবার্য, কিন্তু হেতুর স্বরূপ ভিন্ন ভিন্ন হয়ে থাকে। সকাম ভাব রেখে যে কর্ম করে সে বিভিন্ন ফলের কামনা রেখে নানা প্রকারের কর্ম করে, কামনা দ্বারা তাঁর বুদ্ধি আচ্ছাদিত থাকে (দেখুন গীতা ২/৪২, ৪৩, ৪৪ ; ৯/২০, ২১) সেইজন্য সে কর্মের সফলতা-বিফলতায় সুখী-দুঃখী হয়ে থাকে, কিন্তু যে নিষ্কামভাব রেখে কর্ম করে সেই পুরুষের কর্মে একমাত্র হেতু থাকে "পরমাত্মার-প্রাপ্তি"।* ফলে নিত্যপ্রতি নুতন উৎসাহে নিরলসভাবে কর্মে প্রবৃত্ত হয়, সাংসারিক কামনা না থাকার ফলে সে আসক্ত হয় না এবং কর্মের সফলতা-বিফলতায় তাঁর লক্ষ্যবিন্দু থাকে সর্বোচ্চ, সে কর্মের বাহ্যিক ফল গ্রাহ্য করে না ; তাঁর দৃষ্টিতে সংসারের সকল পদার্থ সেই পরমাত্মার তুলনায় অতিশয় তুচ্ছ, মলিন এবং ক্ষুদ্র প্রতীত হয়, সে সেই সর্বশ্রেষ্ঠ পরমাত্মাকে লাভ করার শুভেচ্ছার তুলনায় জগতের সমস্ত শ্রেষ্ঠ পদার্থ সমূহকে তুচ্ছজ্ঞান করে থাকে (গীতা ২/৪৯)

সেইজন্য সাংসারিক বিষয়জনিত ফল প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে তার কোন হর্ষ-শোক হয় না। সকামী পুরুষের ন্যায় তাঁর দ্বারা নিষিদ্ধকর্ম হওয়ারও কোন সম্ভাবনা থাকে না। নিষিদ্ধকর্ম করার কারণ হল "আসক্তি বা লোভ"। নিষ্কামী পুরুষ জগতের সমস্ত পদার্থের লোভ পরিত্যাগ করে এ থেকে অনাসক্ত হতে চায়, একমাত্র পরমাত্মাকেই সে লোভের বস্তু মনে করে, ওতেই তার মন আসক্ত হয়ে পড়ে, অতএব তার প্রাপ্তির অনুকূল যে কার্য্য সে তা অতি উৎসাহের সঙ্গে করে থাকে। এটা নির্বিবাদ সত্য যে, সেই সকল কার্য্যই পরমাত্মার প্রাপ্তিতে অনুকূল যার জন্য ভগবানের আদেশ রয়েছে, যা শাস্ত্রবিহিত, যা কারও পক্ষে কোনও ভাবে বিন্দুমাত্রও অনিষ্টকারক নয়, এরূপ কর্মের মধ্যে নিষিদ্ধ কর্মের সমাবেশ কোনওভাবে হওয়া সম্ভব নয়। কাজেই নিষ্কামী পুরুষ সকামী পুরুষের চেয়ে সর্বথা অসাধারণ হয়ে থাকে।

---

* নিষ্কাম কর্মযোগীর পরমাত্মা কে লাভের কামনা পরিণামে পরম কল্যাণের হেতু হওয়ার ফলে আসলে তা কামনা নয়, ভগবদপ্রাপ্তির কামনাযুক্ত পুরুষকে প্রকৃতপক্ষে নিষ্কামী বলেই জানা উচিৎ।

সকামী পুরুষ জগতের পদার্থসমূহকে রমনীয়, সুখপ্রদ এবং প্রীতিকর মনে করে তা পাবার ইচ্ছায়, সফলতা-বিফলতায় সুখ-দুঃখের প্রত্যক্ষ ভাবযুক্ত হয়ে মনে মমতা রেখে আসক্তি পূর্বক কর্ম করে এবং নিষ্কামী পুরুষ সব কিছুকে ভগবানের মনে করে সফলতা-বিফলতায় সমভাব রেখে আসক্তি এবং ফলেচ্ছা ত্যাগ করে ভগবানের আদেশানুসারে ভগবানের জন্যই সমস্ত কর্মের আচরণ করে থাকে। ইহাই সকাম এবং নিষ্কাম কর্মের ভেদ।

গীতায় নিষ্কাম কর্মের আরম্ভ-র

বর্ণনা ২য় অধ্যায়ের ৩৯ নং শ্লোক সংখ্যা থেকে প্রারম্ভ হয়। শ্লোক সং ১১ থেকে ৩০ পর্যন্ত সাংখ্যযোগের প্রতিপাদন করে ৩১ শ্লোক থেকে অর্জুনকে ক্ষত্রিয়চিত কর্মে উৎসাহ জুগিয়ে ৩৮ শ্লোকে ভগবান বলেছেন যে –

সুখদুঃখে সমে কৃত্বা লাভালাভৌ জয়াজযৌ।
ততো যুদ্ধায় যুজ্যস্ব নৈবং পাপমবাপ্স্যসি॥

মোহজনিত পাপের ভয়ে ভীত অর্জুনকে সুখ-দুঃখ, জয়-পরাজয় এবং লাভ-ক্ষতি রূপ সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাব রাখলে কোনও পাপ না হবার যুক্তি (বুদ্ধি) সাংখ্য সিদ্ধান্ত অনুসারে বর্ণনা করে এর পরের শ্লোকে নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনার প্রারম্ভে বলেছেন –

এষা তেঽভিহিতা সাংখ্যে বুদ্ধির্যোগে ত্বিমাং শৃণু।
বুদ্ধ্যা যুক্তো যয়া পার্থ কর্ম্মবন্ধং প্রহাস্যসি॥
(গীতা ২/৩৯)

"হে পার্থ! এই বুদ্ধি তোমাকে জ্ঞানযোগের বিষয়ে বলা হল ইহাকেই এখন নিষ্কাম কর্মযোগের বিষয়ে শোন! এই বুদ্ধি দ্বারা যুক্ত হয়ে কর্ম করলে কর্মবন্ধনকে উত্তমরূপে নাশ করিবে।"

এর পরের শ্লোকে নিষ্কাম কর্মযোগের প্রশংসা করে ভগবান যৎকিঞ্চিৎ নিষ্কাম-কর্মরূপী ধর্মকে জন্ম মৃত্যুরূপী ভয়ানক ভয় থেকে ত্রান করার কথা বলেছেন। এর পরে ৪৭ শ্লোক সংখ্যায় কর্মের অধিকার এবং

ফলে অনধিকারের বর্ণনা করে ৪৮ শ্লোক সংখ্যায় ভগবান বলেছেন যে, কর্মমাত্রেরই সফলতা-বিফলতায় এবং এর ফল প্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমভাব থাকাই হল "সমত্ব" এই সমত্বভাবের কর্মের সঙ্গে যোগ হলে তা হল কর্মযোগ। এরূপ বলার পর অর্জুনকে আসক্তির পরিত্যাগ করে সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমবুদ্ধি রেখে কর্ম করার আদেশ দিয়েছেন এবং পরে এর ফলের বর্ণনায় বলেছেন –

"জন্ম-বন্ধন থেকে বিমুক্ত হয়ে অনাময় অমৃতময় পরমপদ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হওয়া (দেখুন গীতা ২/৫১)।

এরূপে ভগবান দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ থেকে ৫১ শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগের বিবেচন করেছেন, যদিও স্পষ্টভাবে এরমধ্যে ভক্তির কথা কোথাও বলা হয়নি কিন্তু তার মানে এই নয় যে কর্মযোগ ভক্তিশূণ্য। আমার ধারণায় গীতার নিষ্কাম কর্মযোগ সর্বথা ভক্তি মিশ্রিত। অবশ্য বলা যেতে পারে যে, কোথাও কোথাও ইহা প্রধানরূপে স্পষ্ট রূপে ব্যক্ত হয়েছে এবং কোথাও কোথাও গৌণ হয়ে অব্যক্তরূপে নিহিত রয়েছে।

পরমাত্মার অস্তিত্ব এবং তাঁকে লাভ করার শুভ ভাব তো সামান্যভাবে কর্মযোগের প্রতিটি উপদেশে নিহিত রয়েছে। নিষ্কাম কর্মযোগের প্রারম্ভ তখন থেকেই ধরা হয় যখন সাধক নিজের মনে পরমাত্মাকে পাবার জন্য শুভ এবং দৃঢ় ভাবনা রেখে সাংসারিক ভোগসমূহের প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তিতে হর্ষ-শোকের ইচ্ছা পরিত্যাগ করে ফলাসক্তির ত্যাগের ভাবনা পোষণ করে।

যে কর্ম ভগবানের প্রীতি অথবা তাকে পাবার জন্য করা না হয়, তাকে তো কর্মযোগ-ই বলা যাবে না। কর্মযোগ নামের সার্থকতা তখনই যখন কর্মের যোগ (সম্বন্ধ) ভগবানের সঙ্গে করা হয়। যদিও গীতায় কর্মযোগের বর্ণনা দুভাবে করা হয়েছে। কোনও কোনও শ্লোকে ভক্তির প্রধানতঃ স্পষ্ট ভাবে রয়েছে এবং কোথাও কোথাও অপ্রকটরূপে নিহিত রয়েছে।

যেখানে প্রধানরূপে ভক্তির কথন হয়েছে সেখানে"আমাতে অর্পণ করে", "পরমাত্মায় অর্পণ করে", "আমাকে স্মরণে রেখে কর্ম কর",

"সবকিছু আমাতে অর্পণ কর", "আমার জন্য কর্ম কর", "স্বাভাবিক কর্মদ্বারা পরমেশ্বরের পূজা কর", "আমার আশ্রয় রেখে কর্ম কর", "আমার পরায়ণ হও", প্রভৃতি বাক্য বলা হয়েছে (দেখুন গীতা ৩/৩০; ৫/১০ ; ৮/৭; ৯/২৭-২৮; ১২/৬; ১০, ১১; ১৮/৪৬, ৫৬, ৫৭ প্রভৃতি। যেখানে সামান্যরূপে ভক্তির অপ্রকট বিবেচন হয়েছে , সেখানে এরূপ বাক্য দেখা যায় না, দেখুন গীতা ২/৪৭-৪৮, ৪৯-৫০, ৫১, ৩/৭, ১৯, ৪/১৪ ; ৬/১; ১৮/৬,৯ প্রভৃতি)।

এতে ইহা প্রমাণিত হল যে ভগবদ্-ভাব উভয় বর্ণনার মধ্যে রয়েছে কাজেই যে শ্লোকের মধ্যে ভগবানের নাম, ভগবদ্-আশ্রয়, ভগবানের জন্য কর্ম প্রভৃতি ভাবের স্পষ্টরূপে বর্ণনা নেই, সেক্ষেত্রেও এরূপ ভাব রেখে আচরণ করলেও জীবের ভগবদ্-প্রাপ্তি হতে পারে; কেননা তাঁর একমাত্র উদ্দেশ্য থাকে ভগবদ্ প্রাপ্তির; এতে কোনও সন্দেহ নেই যে, কর্মযোগের সঙ্গে স্মরণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তির মিশ্রণ হলে অতি শ্রীঘ্রই ভগবদ্ প্রাপ্তি হয়ে থাকে এবং সমস্ত কর্মযোগীগণের মধ্যে এরূপ যোগী উত্তম বলে গণ্য হয়। ভগবান বলেছেন –

যোগিনামপি সর্বেষাং মদ্গতেনান্তরাত্মনা।
শ্রদ্ধাবান্ ভজতে যো মাং স মে যুক্ততমো মতঃ॥

(গীতা ৬/৪৭)

সকল যোগীদিগের মধ্যে যে শ্রদ্ধাবান্ যোগী আমাতে লগ্ন অন্তরাত্মা দ্বারা আমাকে নিরন্তর ভজনা করে সেই যোগী আমার পরমশ্রেষ্ঠ মাননীয় হয়।

যারা এভাবে স্পষ্ট ভক্তির মিশ্রণ করে না, তাদেরও কর্মযোগের দ্বারা ভগবদ্ প্রপ্তি হয় কিন্তু এতে যথেষ্ট সময় লাগে (দেখুন গীতা ৪/৩৮; ৬/৪৫)।

গীতায় নিষ্কাম কর্মযোগের বর্ণনা "সমত্বযোগ", "বুদ্ধিযোগ", "কর্মযোগ", "তদর্থকর্ম", "মদর্থকর্ম", "মদর্পণ", "মৎকর্ম" এবং "সাত্ত্বিক ত্যাগ" প্রভৃতি নামে করা হয়েছে। এই সবের ফল এক হলেও এর সাধনার ক্রিয়াতে ভেদ রয়েছে যেমন –

মদর্পণ এবং মদর্থ কর্মের ভেদ

কোন অংশে বর্ণনা করা হচ্ছে। মদর্পণ কিংবা ভগবদর্পণ একই এবং মদর্থ, তদর্থ বা ভগবদর্থ একই কথা। এর মধ্যে মদর্পণ কর্মের স্বরূপ এই যে, যেমন কোন লোক অন্য কোন উদ্দেশ্য রেখে কিছু অর্থের সঞ্চয় করে থাকে এবং তার নিকটে আগে থেকেই কিছু অর্থ সঞ্চিতও রয়েছে, কিন্তু সে যখন খুসী ইচ্ছামত অর্থ সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যের পরিবর্তন করতে পারে এবং সঞ্চিত অর্থও অন্যকে অর্পণ করতে পারে। কর্ম প্রারম্ভ করার মাঝখানে কিংবা কর্ম সম্পূর্ণ হওয়ার পরও তা অর্পণ হতে পারে। ভক্ত ধ্রুব রাজ্য প্রাপ্তির জন্য তপরূপী কর্ম আরম্ভ করেছিলেন, কিন্তু মাঝখানেই তাঁর ভাব পরিবর্তন হয়, তপরূপী কর্ম ভগবদর্পণে রূপান্তরিত হয় এবং এর ফলে তাঁর ভগবদ্প্রাপ্তি ঘটে।

এর সঙ্গে প্রারম্ভের ইচ্ছা অনুযায়ী তাঁর রাজ্যও লাভ হয়, কিন্তু সাধারণ লোকের মত রাজ্য তার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয় নি। ইহা ভগবদর্পণ কর্মের মহিমা বলে জানা উচিত। অতএব প্রারম্ভে অন্য উদ্দেশ্য থাকলেও যে কর্ম মাঝখানে কিংবা শেষে ভগবানে অর্পণ করা হয়, তাও ভগবদর্পণে পরিণত হয়।

মদর্থ বা ভগবদর্থ কর্মে এরূপ হয় না, উহা তো প্রারম্ভ থেকেই ভগবানের জন্য করা হয়ে থাকে। কোন দেবতার উদ্দেশ্যে প্রসাদ বা ব্রাহ্মণ ভোজনের জন্য ভোজন-সামগ্রীর সংগ্রহের ক্ষেত্রে যেমন প্রারম্ভ থেকেই এক নিশ্চিত উদ্দেশ্য থাকে ঠিক সেরূপ ভগবদর্থের জন্য যে সাধক কর্ম করে তারও প্রত্যেকটি কর্মের আরম্ভ ভগবানের উদ্দেশ্য রেখেই হয়ে থাকে। ভগবদর্থ কর্মের অবশ্য কিছু বিভিন্ন প্রকার রেয়েছে, যেমন ভগবদ্-প্রপ্তির প্রয়োজন রেখে কর্ম করা, ভগবানের আদেশ মনে করে কর্ম করা। ভগবদ্ সেবারূপ কর্মে নিযুক্ত হওয়া এবং ভগবানকে পাবার জন্য কর্মে নিয়োজিত হওয়া প্রভৃতি।

ভক্তি প্রধান কর্মযোগ সম্বন্ধে ইহা বলা হল। এছাড়াও সমত্বযোগ, কর্মযোগ এবং সাত্ত্বিক ত্যাগ প্রভৃতি দ্বারা প্রায় একই অর্থ বোঝা যায়।

দ্বিতীয় অধ্যায়ের ৪৭ থেকে ৫১ শ্লোক পর্যন্ত কর্মযোগের নামে যা বলা হয়েছে, অষ্টাদশ অধ্যায়ের ৩ থেকে ৯ শ্লোক পর্যন্ত ত্যাগের নামে তাঁর বর্ণনা করা হয়েছে। আসলে ফল এবং আসক্তির ত্যাগ তো সবেতেই রয়েছে, ভক্তিপ্রধান বা কর্মপ্রধান এই দুই প্রকারের বর্ণনা নিষ্কাম কর্মযোগের জন্যই রয়েছে। কাজেই এটা প্রমাণিত হল যে –

ভগবদ্ প্রপ্তির জন্য করা কর্ম-ই হচ্ছে নিষ্কাম কর্মযোগ। নিষ্কাম কর্মযোগীর ক্ষেত্রে ভগবদ্-প্রাপ্তির জন্য কর্তব্য কর্মের পরিত্যাগ করে নির্জনে থেকে ভজন-ধ্যান করারও কোন প্রয়োজন থাকে না। যদি কেউ তা করে তবে এতে কোন আপত্তি নেই। ভজন-ধ্যান তো সদা-সর্বদাই পরম শ্রেষ্ঠ বস্তু। কিন্তু নির্জনে ভজন-ধ্যান না করেও ভগবদ্-চিন্তনের সঙ্গে সঙ্গে শাস্ত্রে বিহিত কর্তব্য কর্ম অবিরত ভাবে করেও সাধক পরমাত্মার শরণ এবং তাঁর কৃপায় পরমগতি লাভ করে। ভগবান বলেছেন –

সর্বকর্ম্মাণ্যপি সদা কুর্বাণো মদ্ব্যপাশ্রয়ঃ।
মৎপ্রসাদাদবপ্নোতি শাশ্বতং পদমব্যয়ম্ ॥
চেতসা সর্বকর্ম্মাণি ময়ি সন্যস্য মৎপরঃ।
বুদ্ধিযোগমুপাশ্রিত্য মচ্চিত্তঃ সততং ভব ॥ (গীতা ১৮/৬৬-৬৭)

"মৎপরায়ণ নিষ্কাম কর্মযোগী সকল কর্ম সর্বদা করতে থেকেও আমার কৃপায় সনাতন অবিনাশী পরমপদ প্রাপ্ত হয়, কাজেই সকল কর্ম মনদ্বারা আমাতে অর্পণ করে মৎপরায়ণ হয়ে সমত্ত্ববুদ্ধিরূপ নিষ্কাম কর্মযোগ অবলম্বন করে নিরন্তর মদগতচিত্ত হও।"

আসলে কর্মের ক্রিয়া মনুষ্যকে বন্ধনে ফেলে না; ফলের ইচ্ছা এবং আসক্তির দ্বারাই তাঁর বন্ধন হয়ে থাকে। যদি ফল তথা আসক্তি না থাকে তাহলে কোন কর্মই মনুষ্যকে বাঁধতে পারে না। ভগবান স্পষ্টরূপে বলেছেন যে, নিজ-নিজ বর্ণ ধর্ম অনুযায়ী কর্মে নিযুক্ত পুরুষ সিদ্ধি লাভ করে, তবে কর্ম করা কালীন মনুষ্যের লক্ষ্য যেন পরমাত্মায় নিবদ্ধ থাকে।

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্চ সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ॥ (গীতা ১৮/৪৬)

"যে পরমাত্মা হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি হয়েছে এবং যে সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মা দ্বারা এই সম্পূর্ণ জগৎ বরফে জলের ন্যায় ব্যপ্ত রয়েছে, সেই পরমেশ্বরকে স্বীয় স্বাভাবিক কর্মদ্বারা পূজা করে মনুষ্য পরম সিদ্ধি লাভ করে।"

যেরূপ পতিব্রতা স্ত্রী পতিকেই সর্বস্ব বিবেচনা করে পতির চিন্তাকরতঃ পতির আজ্ঞানুসারে পতির নিমিত্ত কায়মনোবাক্যে (নিজ দায়িত্বের) সংসারের সমস্ত কর্ম করতঃ পতির প্রসন্নতা লাভ করে, সেইরূপ নিস্কাম কর্মযোগী এক পরমাত্মাকেই নিজের সর্বস্ব জ্ঞান করে তাঁর চিন্তন করিতে করিতে তাঁর আজ্ঞানুসারে কায়মনোবাক্য দ্বারা সেই পরমাত্মার নিমিত্ত কর্তব্য কর্মের আচরণ করে পরমাত্মার প্রসন্নতা এবং পরমাত্মকে প্রাপ্ত হয়।

চরাচর সমস্ত ভূত-প্রাণীসমূহে পরমাত্মাকে ব্যাপক জ্ঞান করে সকলকেই পরমাত্মার স্বরূপ মনে করে নিজ কর্ম দ্বারা কর্মযোগী ভক্ত ভগবানের পূজা করে থাকে। রাজার প্রসন্নতা অর্জনের জন্য তাঁর সকল কর্মচারী একই ধরণের কাজ করুক—সকলেই মন্ত্রী কিংবা সেনাপতির কার্য্য করুক-ইহা আবশ্যক নয়। নিজ নিজ যোগ্যতা অনুযায়ী রাজা যাকে যে কাজে নিযুক্ত করেছেন, তাকে সেই কাজ সুষ্টুভাবে সম্পাদন করে রাজাকে সন্তুষ্টু করার চেষ্টা করা উচিত। তাঁর উচিত অন্যের অতিশয় শ্রেষ্ঠ কাজের প্রতি বিন্দুমাত্রও লক্ষ্য না করে নিজ মনিবের প্রসন্নতার জন্য তাঁর নিজের কাজ সুষ্টভাবে সম্পাদন করে। রাজ-দরবারের একজন বিদ্বান পণ্ডিত বেদগান শুনিয়ে রাজাকে যে পরিমাণে প্রসন্ন করে, তৎপরতার সঙ্গে রাজার আদেশ পালনকারী সাধারণ মাহিনার ঝাড়ুদার ব্যক্তিও রাজ-বাড়ীকে পরিস্কার-পরিচ্ছন্ন রেখে রাজাকে সেই পরিমাণে প্রসন্ন রাখতে পারে। কারও নিজের কর্ত্তব্য কর্মের পরিত্যাগ করার প্রয়োজন নেই, মনিবকে প্রসন্ন রাখার জন্য অবশ্যকতা রয়েছে নিজের স্বার্থ ত্যাগ করে নিজের কর্ত্তব্য-কর্ম মনিবকে অর্পণ করার। এটা

হল নিজ কর্মের দ্বারা পরমাত্মার পুজা এবং এর দ্বারা পরমাত্মার প্রপ্তি হয়ে থাকে।

নিস্কাম কর্মযোগীর লক্ষ্য হল শুধুমাত্র পরমাত্মা ! অর্থের লোভী মানুষ যেমন নিজের প্রত্যেকটি কাজে শুধুমাত্র অর্থ পাবার উপায় ভেবে থাকে; যে কোন উপায়ে অর্থ চাই, শুধু এই ভাবটি তার মনে নিরন্তর জেগে থাকে। যে কাজে অর্থ খরচ হয়, অর্থের উপার্জন হয় না কিংবা উপার্জনে যৎকিঞ্চিত বিঘ্ন থাকে, সেই কাজের ধারেকাছেও সে যেতে চায় না। সে শুধু সেই কাজই করে থাকে যা অর্থ প্রাপ্তির অনুকূল বা সাহায্যকারী। ঠিক তদনুরূপ ভাবে নিস্কাম কর্মযোগী সর্বদাই কায়মনোবাক্যে সেই কাজই করে যার দ্বারা ঈশ্বর প্রসন্ন হন। সে ভূলেও পরমাত্মা প্রাপ্তিতে বাধাদানকারী চুরি, ব্যভিচার, মিথ্যে, কপটতা, মাদক দ্রব্য সেবন, অভক্ষ্য-ভক্ষণ প্রভৃতি নিষিদ্ধকর্ম এবং যাতে ব্যর্থ সময় নষ্ট হয় এরূপ প্রমাদ কর্ম করে না। করা তো দুরে থাকুক, এরূপ কর্ম তার কাছে অসহ্য হয়ে থাকে। সে নিরন্তর সেই সকল ন্যায়যুক্ত এবং শাস্ত্রবিহিত কর্মের চিন্তনে এবং কার্য্যে প্রবৃত্ত থাকে যা তাঁর চরম লক্ষ্য পরমাত্মার প্রাপ্তিতে অনুকূল এবং সাহায্যকারী হয়ে থাকে। সে অন্যের মনোহর এবং মান-সম্মান প্রদানকারী কর্মের প্রতি কখনও লোলুপ দৃষ্টিতে তাকিয়ে দেখে না, চুপচাপ স্বাভাবিক ভাবেই নিজের কর্ত্তব্য কর্ম করতে থাকে। সে তাকিয়ে দেখে না যে এই কর্ম ছোট, সেই কর্ম বড়; কেননা সে জানে যে স্বরুপতঃ কর্ম পরমাত্মার প্রাপ্তিতে হেতু নয়, হেতু হল অন্তঃকরণের ভাব। ভাবের দ্বারাই মনুষ্যের উত্থান এবং পতন হয়ে থাকে। সেইজন্য অন্যের অনুকরণ করে এমন কোন অতি শ্রেষ্ঠ কর্মও করতে চায় না, যা তাঁর ক্ষেত্রে বিহিত নয়। সে এটা লক্ষ্য করে না যে আমার এই কর্মে এই দোষ রয়েছে অপরের সেই কর্ম সর্বথা দোষমুক্ত ! সে ইহাও জানে যে, অপরের গুণযুক্ত উত্তম কর্মের চেয়ে নিজের গুণরহিত ধর্মই নিজের জন্য শ্রেষ্ঠ এবং আচরণযোগ্য। স্বধর্মের পালনে মনুষ্য পাপ প্রাপ্ত হয় না (দেখুন গীতা ১৮/৪৭)। বর্তমানে নিস্কাম

কর্মের এই রহস্যটি না জেনেই লোকে সবকিছুকে একাকার করার ব্যর্থ প্রচেষ্টায় নিয়োজিত রয়েছে। ভগবান বলেছেন–

সহজং কর্ম কৌন্তেয় সদোষমপি ন ত্যজেৎ ।

সর্বারম্ভা হি দোষেণ ধূমেনাগ্নি রিবাবৃতাঃ ॥(গীতা ১৮/৪৮)

"দোষমুক্ত ও স্বাভাবিক কর্ম ত্যাগ করিবে না কেননা ধুমদ্বারা (আচ্ছাদিত) অগ্নির ন্যায় সকল কর্মই কোন না কোনও দোষ দ্বারা আবৃত রয়েছে।"

মনুষ্য যে বর্ণে উৎপন্ন হয়েছে, তাঁর স্বাভাবিক কর্ম-ই হল তাঁর স্বধর্ম, ভারতবর্ষের সুব্যবস্থিত বর্ণ ব্যবস্থা হল এর পরম আদর্শ। যারা এই বর্ণ ব্যবস্থা ভেঙ্গে দেওয়ার জন্য সচেষ্ট রয়েছে, তাঁরা খুব ভূল করছে। জগতে ভেদ (অসামঞ্জস্য) কখনই লোপ হতে পারে না, বিশৃঙ্খলা অবশ্যই হতে পারে যা আরও দুঃখদায়ক হয়ে থাকে।

যেরূপ জাতি বা বর্ণে মানুষ জন্মায়, যেরূপ মাতা-পিতার রজ-বীর্য্যের দ্বারা শরীর তৈরী হয়, জন্ম হবার পর থেকে বুদ্ধি বিকশিত হওয়া পর্যন্ত যেমন পরিবেশে তাঁর লালন-পালন হয়, প্রায় তাঁরই অনুরূপ কর্মে তাঁর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি এবং উৎসাহ হয়ে থাকে। সেইজন্য সেটাই তাঁর স্বভাব বা প্রকৃতি বলা হয়ে থাকে। এবং এই স্বভাব অর্থাৎ প্রকৃতির অনুকূল বিহিত কর্মকেই গীতায় স্বধর্ম, সহজকর্ম, স্বকর্ম, নিয়তকর্ম, স্বভাবকর্ম, স্বভাবনিয়ত কর্ম প্রভৃতি নামে বলা হয়েছে। সাধকের জন্ম যদি ব্যবস্থিত বর্ণযুক্ত সমাজে হয়ে থাকে তাহলে তাঁর পক্ষে নিজের সহজ কর্ম সহজেই বুঝে নেওয়া সম্ভব কিন্তু যদি এরূপ না হয় তাহলে উপযুক্ত চিহ্ন দ্বারা মানুষের নিজের প্রকৃতি অনুযায়ী নিজের নিজের কর্ত্তব্য কর্ম করা উচিৎ। ঠিক এই স্বধর্ম অনুযায়ী আসক্তি এবং স্বার্থভাব ছেড়ে অখিল ভুবনে পরমাত্মাকে ব্যপক মনে করে সকলের সেবা করার মনোভাব রেখে মনুষ্যকে নিজের নিজের কর্ত্তব্য কর্ম করা উচিত।

একজন বৈশ্য ব্যক্তি তাঁর দোকানের কাজকর্ম করে, ব্যবসায় তাঁর কর্ত্তব্য কর্ম। কিন্তু সেই কর্ত্তব্য কর্ম নিস্কাম কর্মযোগের শ্রেণীতে তখনই উন্নিত হতে পারে যখন তা স্বার্থবুদ্ধি দ্বারা না হয়ে কেবলমাত্র পরমাত্মার

সেবা করার নির্মল ভাব রেখে হয় । দোকানদারী ছেড়ে বনে-জঙ্গলে যাওয়ার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন রয়েছে মনের ভাব পরিবর্তন করার, স্বার্থ এবং কামনার কলঙ্ক মুছে ফেলার । যেদিন সাংসারিক স্বার্থের স্থানে মনে পরমাত্মার স্থান প্রাপ্ত হয় সেই দিন তাঁর সেই কর্ম, যা বন্ধনের কারণ ছিল, স্বরূপতঃ সেইরূপে থেকেই তা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করার কারণ হয়ে যায় ।

পারদ এবং শংখিয়া (এক ধরণের ভয়ংকর বিষ) অমৃতের ন্যায় কাজ করতে পারে, যদি তা অভিজ্ঞ কবিরাজ দিয়ে শোধন করে শুদ্ধ করে নেওয়া যায় । যে পারদ বা সংখিবিষর দ্বারা মানুষের মৃত্যু হয় সেই পারদ বা সংখিবিষের বিষঅংশ শোধন করে নিলে তা অমৃত হয়ে যায় । এরূপে যে পর্যন্ত কর্মে স্বার্থ এবং আসক্তি রয়েছে সে পর্যন্ত তাঁর দ্বারা বন্ধন বা মৃত্যু হতে থাকে, যেদিন স্বার্থ এবং আসক্তির ত্যাগ করে কর্মকে শুদ্ধ করে নেওয়া হয়, সেই দিন তা অমৃত হয়ে মনুষ্যকে পরমাত্মার অমর পদ প্রদান করাতে কারণরূপ হয়ে থাকে । সেইজন্য কোনও কর্ত্তব্য কর্মের ত্যাগ করার প্রয়োজন নেই, প্রয়োজন রয়েছে বুদ্ধিকে শুদ্ধ করার । একজন সকামভাব রেখে যজ্ঞ, দান, তপ করে এবং অন্যজন শুধুমাত্র নিজ বর্ণ অনুসারে কর্ম, ভিক্ষা, যুদ্ধ, ব্যবসায় বা সেবা করে থাকে, কিন্তু তা করে সবার মধ্যে পরমাত্মাকে ব্যাপক মনে করে, সকলকে সুখ দেবার এবং সকলের সেবার পবিত্র মনোভাব রেখে, তাহলে সে সেই শুধু যজ্ঞ, দান, তপকারীর চেয়ে শ্রেষ্ঠ, কেননা তাঁর কামনা না থাকার জন্য সিদ্ধি-অসিদ্ধিতে সমভাব থাকে এবং নিরন্তর পরমাত্মার ভাব এবং পরমাত্মার আদেশের প্রতি দৃষ্টি থাকার জন্য ফলে লোভ এবং আসক্তি তাঁর কাছে ঘেঁসতে পারে না । লোভ এবং আসক্তি না থাকার ফলে তাঁর দ্বারা পাপ বা নিষিদ্ধকর্ম হওয়া কখনই সম্ভব নয় ।

আমার বলার তাৎপর্য এই নয় যে, যজ্ঞ, দান, তপ করা উচিত নয় কিংবা এগুলি লঘু সাধনা । এই সমস্তই সর্বথা উত্তম এবং অন্তঃকরণের শুদ্ধিতে এবং পরমাত্মার প্রাপ্তিতে যথেষ্ট সাহায্যকারী, কিন্তু তা সম্ভব হয়

যখন তাহা নিস্কামভাব রেখে করা হয় । অতএব এখানে যা কিছু লেখা হয়েছে তা শুধুমাত্র নিস্কাম কর্ম যোগের প্রকৃত মহিমার দৃষ্টিকোন থেকে লেখা হয়েছে।

উপর্যুক্ত বিশ্লেষণে ইহা প্রমাণিত হল যে জেনেশুনে নিস্কাম কর্মযোগী দ্বারা পাপ ঘটতে পারে না ,ভূল, স্বভাব, অজ্ঞান বা ভ্রম-বশে যদি কোথাও কোন পাপ হয়ে যায় তাহলে তা তাঁর ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না, কেননা সেই কর্মের সঙ্গে তার স্বার্থের কোন সম্বন্ধ নেই । স্বার্থ-রহিত কর্মের অনুষ্টান কর্তাকে আবদ্ধ করতে পারে না, (দেখুন গীতা ৪/১৪, ৫/১০) । পক্ষান্তরে তার প্রতিটি কর্ম ভগবদর্পণ হওয়ার ফলে সে সম্পূর্ণভাবে পরমাত্মার কৃপাপাত্র হয়ে যায় ।

রাজার অনেক কর্মচারী থাকে, সকলেই যোগ্যতা অনুযায়ী বেতন পান এবং সকলের উপরেই রাজার কোন না কোনও দায়িত্ব থাকে । কিন্তু প্রতিটি বেতনভুক্ত রাজকর্মচারী রাজ্যের আইনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়, যদি ভুল বা অজ্ঞান বশতঃ কোন রাজ-কর্মচারী কোনও নিয়ম ভঙ্গ করে তাহলে আইন অনুযায়ী সে দণ্ডের ভাগী হয় । কিন্তু যদি কেউ কখনও কোনও প্রকারে রাজ্য বা রাজার কাছে নিজের স্বার্থ সিদ্ধি না করে শুধু অহৈতুকী রাজভক্তির জন্য রাজসেবা করে, তবে তাঁর নিঃস্বার্থ সেবায় রাজা মুগ্ধ থাকে । যদি তাঁর দ্বারা অজ্ঞানবশতঃ কখনও কোন ভূল হয়ে যায়, তবুও রাজা তাতে অপ্রসন্ন হন না; রাজা ইহা জানেন যে এই ব্যক্তি তো রাজ্যের একজন নিঃস্বার্থ সেবক । সেবাকারী যদি ভূলের জন্য দন্ড প্রার্থনা করে তাহলে রাজা বলেন যে, ভাই ! তোমার উপকারের জন্য আমার কৃতজ্ঞ, তোমার একটি ভুলের জন্য আর কি দণ্ড দিব ! শুধু তাই নয় তাঁর উপকারের জন্য রাজা নিজেকে তার ঋনী মনে করে সর্বপ্রকারে তার হিত সাধন করতে চায় । এরূপে পরমাত্মার যে নিঃস্বার্থ সেবক হয়, যে নিজের প্রতিটি কর্মকে তাঁর প্রীতির জন্য তাঁর শ্রীচরণে অর্পণ করে থাকে, যদি তাঁর দ্বারা কোন ভুল হয় তবে অকারণ সুহৃদ পরমাত্মা তা লক্ষ্য করেন না । ইহা অনিয়ম নয়, কিন্তু স্বার্থহীন সেবকের ক্ষেত্রে এটাই নিয়ম ।

এভাবে পরমাত্মার প্রপ্তির জন্য কর্ত্তব্য-কর্মের আচরণকারী সাধক অবশেষে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয়, কিন্তু এ ভাবে যিনি পরমাত্মাকে লাভ করেছেন সেই জীবন্মুক্ত মহাপুরুষ দ্বারাও লোক শিক্ষার জন্য রাজা জনকের ন্যায় আজীবন কর্ম হতে পারে (দেখুন গীতা ৩/২০)। যদিও তাঁর জন্য কোন করার অবশেষ থাকে না (গীতা ৩/১৭), কিন্তু যে পর্য্যন্ত মন এবং ইন্দ্রিয়-সমূহ সচেতন থাকে, সে মর্য্যন্ত তাঁর দ্বারা কর্মত্যাগের কোন হেতু থাকতে পারে না। উপরন্তু কর্মযোগ দ্বারা সিদ্ধি-প্রাপ্ত জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের চিহ্ন সাধারণ ব্যক্তির চেয়ে অনেক অলৌকিক হয়ে থাকে (দেখুন গীতা ২/৫৫, ১২/১৩-১৯)।

ঈশ্বর-প্রাপ্ত এরূপ মহাপুরুষের কর্ম গীতায় তৃতীয় অধ্যায়ের ২৫ শ্লোক-সংখ্যা অনুযায়ী কেবলমাত্র লোক-সংগ্রহের জন্য হয়ে থাকে, এবং তা কামনা এবং সংকল্পহীন হওয়ায় স্বরূপতঃ হলেও বাস্তবিক পক্ষে তাঁকে কর্ম বলা যায় না (দেখুন গীতা ৪-১৯/২০)।

এভাবে নিস্কাম কর্মযোগের সাধক পরমাত্মার প্রাপ্তির জন্য কর্মসমূহকে পরমাত্মায় অর্পণ করার ফলে অবশেষে পরমাত্মার অনুকম্পায় পরমাত্মাকে লাভ করে, যে কর্মে আরম্ভ থেকে শেষ পর্যন্ত পরমাত্মার সঙ্গে এত ঘনিষ্ট এবং অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রয়েছে, সেই কর্ম কখনও ভক্তি রহিত হতে পারে না। অতএব গীতার নিস্কাম-কর্মযোগ সর্বথা ভক্তি মিশ্রিত।

এবং

ফল তথা আসক্তির ত্যাগ করে কেবলমাত্র ভগবানের আজ্ঞানুসারে ভগবদর্থ সম বুদ্ধি রেখে শাস্ত্রবিহিত কর্ত্তব্য কর্ম হল এর স্বরূপ।

[275] ক০ প্রা০ উ০ (বাংলা) ৪ B

॥ শ্রী হরিঃ ॥

ধর্ম কাহাকে বলে ?

প্রশ্ন - দয়া করে ধর্মের ব্যখ্যা করুন ?

উত্তর - ধর্মের ঠিক ঠিক ব্যখ্যা করতে পারেন এমন পুরুষ বর্ত্তমান সময়ে পাওয়া কঠিন।

প্রশ্ন - আপনি যেরুপ মনে করেন দয়া করে তাহাই বলুন।

উত্তর - ধর্মের বিষয় অতিশয় গভীর, আমার ধর্মগ্রন্থ সমূহের জ্ঞান খুবই কম, বেদ তো আমি প্রায় অধ্যায়ন-ই করিনি। আমি তো একজন সাধারন মানুষ, এরূপ অবস্থায় ধর্মের তত্ত্ব বলা একপ্রকারে বালোকোচিত কাজ। এছাড়াও আমি যেটুকু জানি, তাও বলা সম্ভব নয় কেননা যেটুকু জানি তাও স্বয়ং নিজের জীবনে কার্য্যকরী করতে পারি নি।

প্রশ্ন - যাই হোক, আপনি ধর্ম বলতে কি বোঝেন ?

উত্তর - যা ধারন করার যোগ্য।

প্রশ্ন - ধারন করার যোগ্য বস্তু কি ?

উত্তর - এই লোকে এবং পরলোকে যাতে কল্যাণ হয়,
- মহাপুরুষ প্রদত্ত সেই শিক্ষা।

প্রশ্ন - মহাপুরুষ কাকে বলা হয় ?

উত্তর - যে তত্ত্ববেত্তা পুরুষ পরমাত্মার তত্ত্বকে যথার্থভাবে জানে।

প্রশ্ন - তার চিহ্ন কি ?

উত্তর - **অদ্বেষ্টা সর্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ।**
নির্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখ ক্ষমী ॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ ॥

(গীতা ১২।১৩-১৪)

যে সর্বভূতে দ্বেষভাব রহিত এবং স্বার্থরহিত, সকলের প্রেমী এবং হেতুরহিত দয়ালু তথা মমতা রহিত এবং অহঙ্কার রহিত, সুখ ও দুঃখ প্রাপ্তিতে সমান এবং ক্ষমাবান অর্থাৎ যে অপরাধ কারীদিগেরও অভয়দাতা হয়।

যে ধ্যানযোগে যুক্ত যোগী লাভহানিতে সতত সন্তুষ্ট আর মন ইন্দ্রিয়গণের সহিত শরীর বশকারী ও আমাতে দৃঢ় নিশ্চয় বিশিষ্ট হয়, সেই আমাতে অর্পিত মন এবং বুদ্ধিযুক্ত আমার ভক্ত আমার প্রিয় হয়।

সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ সমলোষ্টাশ্মকাঞ্চনঃ ।
তুল্যপ্রিয়াপ্রিয়ো ধীরস্তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতি ।।
মানাপমানয়োস্তুল্যস্তুল্যো মিত্রারিপক্ষয়োঃ ।
সর্বারম্ভপরিত্যাগী গুণাতীতঃ স উচ্যতে ।।

(গীতা ১৪।২৪-২৫)

যে নিরন্তর আত্মভাবে স্থিত, দুঃখ এবং সুখে সমভাব আর মাটি, পাথর এবং সুবর্ণতে সমভাব বিশিষ্ট ও ধৈর্য্যবান এবং যে প্রিয় এবং অপ্রিয় কে সমজ্ঞান করে তথা স্বীয় নিন্দা এবং স্তুতিতে সমান ভাব বিশিষ্ট।

যে মান এবং অপমানে সমান ভাব বিশিষ্ট এবং মিত্র ও শত্রু পক্ষতেও সমান ভাবযুক্ত, সে সর্বারম্ভে কর্ত্তৃত্বাভিমান রহিত পুরুষ গুণাতীত কথিত হয়। এগুলি হল মহাপুরুষের চিহ্ন।

প্রশ্ন - এই সকল চিহ্নযুক্ত কোনও মহাপুরুষ আপনার দৃষ্টিতে বর্ত্তমান সময়ে হিন্দুজাতির মধ্যে আছে কি ?

উত্তর - অবশ্যই রয়েছে কিন্তু আমি বলতে পারব না।

প্রশ্ন - আপনি কাহাকে হিন্দু বলে মনে করেন ?

উত্তর - যে নিজেকে হিন্দু বলে মানে সেই হিন্দু।

প্রশ্ন - হিন্দু শব্দের অভিপ্রায় কি ?

উত্তর - হিন্দুস্তানে (আর্য্যবর্ত্তে)জন্ম হওয়া এবং কোনও হিন্দু আচার্য্য পরিচালিত মত স্বীকার করা।

প্রশ্ন - সনাতন ধর্মী, আর্য্য, শিখ, জৈন, বৌদ্ধ এবং ভারতের বনাঞ্চলে বসবাসকারীরা কি সবাই হিন্দু ?

উত্তর - যদি তাঁরা নিজেকে হিন্দু বলে মানে তবে তাহারা অবশ্যই হিন্দু।

প্রশ্ন - বিভিন্ন হিন্দুদের দ্বারা পরিচালিত সকল মত হিন্দু-ধর্ম বলে মানা যেতে পারে ?

উত্তর - অবশ্যই।

প্রশ্ন - এই মতসমূহের মধ্যে আপনি সবচেয়ে প্রধান শ্রেয়স্কর বলে কোন মতটি মানেন ?

উত্তর - অহিংসা, সত্য, অস্তেয়, ব্রহ্মচর্য্য, অপরিগ্রহ, শৌচ, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, ঈশ্বরভক্তি, জ্ঞান, বৈরাগ্য, মনের নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়দমন, তিতিক্ষা, শ্রদ্ধা, ক্ষমা, বীরত্ব, দয়া, তেজ, সরলতা, স্বর্থত্যাগ, অমানিত্ব, দম্ভহীনতা, অপৈশুনতা, নিস্কপটতা, বিনয়, ধৃতি, সেবা, সৎসঙ্গ, জপ, ধ্যান, নির্বৈরতা, নির্ভয়তা, সমতা, নিরহংকারতা, মৈত্রী, দান, কর্ত্তব্যপরায়ণতা এবং শান্তি এই চল্লিসটি গুণের মধ্যে যে মতবাদে যত অধিক সংখ্যক গুণ রয়েছে সেই মতই সবচেয়ে প্রধান এবং শ্রেয়স্কর বলে মানার যোগ্য।

প্রশ্ন - এই চল্লিসটি গুণের যদি সংক্ষেপে ব্যখ্যা দিয়ে দিন, তাহলে খুবই ভাল হয়।

উত্তর - ভাল কথা, তাহলে শুনুন।

(১) অহিংসা - মন, বানী এবং শরীর দ্বারা কাকেও কোনও প্রকারের কষ্ট না দেওয়া।

(২) সত্য - অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়সমূহ দ্বারা যেরূপ নিশ্চয় করা হয়েছে তা প্রিয় শব্দ দ্বারা যথার্থ ভাবে বলা।

(৩) অস্তেয় - কোনও ধরনের চুরি না করা।

(৪) ব্রহ্মচর্য্য - আঠ প্রকারেন মৈথুনের ত্যাগ।

(৫) অপরিগ্রহ - মমতা যুক্ত বুদ্ধি রেখে সংগ্রহ না করা।

(৬) শৌচ - বাহির ও ভিতরের পবিত্রতা রক্ষা করা।

(৭) সন্তোষ - সর্বথা তৃষ্ণার অভাব।

(৮) তপ - স্বধর্ম পালনে কষ্ট সহ্য করা।

(৯) স্বাধ্যায় - পারমার্থিক গ্রন্থের অধ্যায়ন এবং ভগবানের নাম এবং গুণের কীর্ত্তন।

(১০) ঈশ্বরভক্তি - ভগবানে শ্রদ্ধা এবং ভক্তি হওয়া।

(১১) জ্ঞান - সৎ এবং অসৎ পদার্থ ঠিক ভাবে জানা।

(১২) বৈরাগ্য - ইহ লোক এবং পরলোকের সমস্ত পদার্থে আসক্তির অত্যন্ত অভাব।

(১৩) মনের নিগ্রহ - মনকে বশীভুত করা।

(১৪) ইন্দ্রিয় দমন - সমস্ত ইন্দ্রিয় সমূহকে বশীভূত রাখা।

(১৫) তিতিক্ষা - শীত-উষ্ণ এবং সুখ দুঃখাদির দ্বন্ধে সহনশীলতা রাখা।

(১৬) শ্রদ্ধা - বেদ, শাস্ত্র, মহাত্মা, গুরু এবং পরমেশ্বরের বাক্যে প্রতক্ষ্যের ন্যায় বিশ্বাস।

(১৭) ক্ষমা - অপরাধকারীদের প্রতি কোনও প্রকারের দন্ড দেবার মনোভাব পোষণ না করা।

(১৮) বীরত্ব - কাপুরুষতার সর্বথা অভাব।

(১৯) দয়া - কোনও প্রাণীর দুঃখ দেখে হৃদয় দ্রবীভূত হওয়া।

(২০) তেজ - শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সেই শক্তি, যার প্রভাবে বিষয়াসক্ত নীচ প্রকৃতির লোকও প্রায় পাপাচরণ থেকে সরে গিয়ে শ্রেষ্ঠ কর্মে নিয়োজিত হয়।

(২১) সরলতা - শরীর এবং ইন্দ্রিয়সমূহের সঙ্গে অন্তঃ-করণের সরলতা।

(২২) স্বার্থত্যাগ - কোনও কার্য্য দ্বারা এই লোক কিংবা পরলোকের কোনও স্বার্থের ইচ্ছা না রাখা।

(২৩) অমানিত্ব - সৎকার, মান এবং পূজো প্রভৃতি না চাওয়া।

(২৪) দম্ভহীনতা - ধর্মীয় প্রভৃতি আড়ম্বর, দম্ভ ইত্যাদি না রাখা।

(২৫) অপৈশুনতা - কারও নিন্দা বা অসাক্ষাতে নিন্দা (আড়ালে নিন্দা) না করা।

(২৬) নিস্কপটতা - নিজের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য কোনও কথা গোপন না করা।

(২৭) বিনয় - নম্রতার ভাব।

(২৮) ধৃতি - ভয়ানক বিপত্তি এলেও বিচলিত না হওয়া।

(২৯) সেবা - (সকল ভূতে হিতে রত থাকা), সকল জীব সমূহকে যথাযথভাবে সুখ দেবার জন্য মন, বাণী এবং শরীরদ্বারা নিরন্তর নিঃস্বার্থভাবে নিজ শক্তি অনুসারে চেষ্টা করা।

(৩০) সৎসঙ্গ - সন্ত-মহাত্মা পুরুষদের সঙ্গ করা।

(৩১) জপ - নিজ ইষ্টদেবের নাম বা মন্ত্রের জপ করা।

(৩২) ধ্যান - নিজ ইষ্টদেবের চিন্তন করা।

(৩৩) নির্বৈরতা - শত্রুভাব পোষণ করে যে তাঁর প্রতিও দ্বেষ ভাব না হওয়া।

(৩৪) নির্ভয়তা - ভয়ের সর্বথা অভাব।

(৩৫) সমতা - মস্তক, পা প্রভৃতি অঙ্গের ন্যায় সকলের প্রতি বর্ণাশ্রমের মর্য্যাদা অনুযায়ী যথাযথ ব্যবহারে ভেদ রেখেও আত্মরূপে সকলকে সমভাবে দেখা।

(৩৬) নিরহংকারতা - মন, বুদ্ধি, শরীর প্রভৃতিতে অহং ভাবের অভাব এবং এর দ্বারা হওয়া কর্মে কর্ত্তৃত্ব ভাবের সর্বথা অভাব।

(৩৭) মৈত্রী - প্রাণীমাত্রে ভালবাসা।

(৩৮) দান - যে স্থানে যে সময়ে যার যে বস্তুর অভাব রয়েছে তাঁকে সেই বস্তু প্রত্যুপকার এবং ফলের ইচ্ছা না রেখে হর্ষ এবং সম্মান পূর্বক প্রদান করা।

(৩৯) কর্ত্তব্যপরায়ণতা - নিজের কর্ত্তব্যে তৎপর থাকা।

(৪০) শান্তি - ইচ্ছা এবং বাসনার একান্তভাবে অভাব হওয়া এবং অন্তঃকরণে নিরন্তর প্রসন্নতা থাকা।

প্রশ্ন - আপনি বর্ণাশ্রম মানেন কিনা ?

উত্তর - মানি এবং তা পালন করা ভাল মনে করি।

প্রশ্ন - যারা বর্ণাশ্রমের পালন করে না তাদের কি আপনি হিন্দু বলে মানেন না ?

উত্তর - যদি তারা নিজেকে হিন্দু বলে মনে করে তাহলে তাদের হিন্দু বলে না মানার আমার কি অধিকার আছে ? কিন্তু যারা বর্ণাশ্রম ধর্মের পালন করে না, শাস্ত্রে তাদের নিন্দা করা হয়েছে। কাজেই বর্ণাশ্রম ধর্মের অবশ্যই পালন করা উচিত।

প্রশ্ন - বর্ণ ব্যবস্থা আপনি জন্মগত ভাবে মানেন না কর্মগত ?

উত্তর - জন্ম এবং কর্ম উভয় ভাবেই মানি।

প্রশ্ন - এই দুইয়ের মধ্যে আপনি প্রধান কাকে মানেন।

উত্তর - নিজের নিজের ক্ষেত্রে দুইটি প্রধান।

প্রশ্ন - বর্ণ কয়টি ?

উত্তর - ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটি বর্ণ।

প্রশ্ন - ব্রাহ্মণের কর্ম কি ?

উত্তর - **শমো দমস্তপঃ শৌচং ক্ষান্তিরার্জমেব চ।**
জ্ঞানং বিজ্ঞানমাস্তিক্যং ব্রহ্মকর্ম স্বভাবজম্ ।

(গীতা ১৮/৪২)

"অন্তঃকরণের নিগ্রহ, ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, বাহির ভিতরের শুদ্ধি, ধর্মের জন্য কষ্ট সহ্য করা এবং ক্ষমাভাব তথা মন, ইন্দ্রিয়সমূহ এবং শরীরের সরলতা, আস্তিকবুদ্ধি, শাস্ত্রবিষয়ের জ্ঞান এবং পরমাত্মতত্ত্বের অনুভব-এগুলি হল ব্রাহ্মণের স্বাভাবিক কর্ম অর্থাৎ ধর্ম।"

এছাড়াও যজ্ঞ করা, যজ্ঞ করানো, দান দেওয়া, দান গ্রহণ করা, বিদ্যাভ্যাস করা এবং করানো এগুলিও কর্তব্যকর্ম। এরমধ্যে যজ্ঞ করা, দান দেওয়া এবং বিদ্যাভ্যাস-এই তিনটি সামান্য ধর্ম এবং যজ্ঞ করানো,

দান গ্রহণ করা এবং লেখাপড়া শেখানো – এগুলি জীবিকা অর্জনের বিশেষ ধর্ম ।

প্রশ্ন - ব্রাহ্মণের জীবিকা অর্জনের সর্বোত্তম ধর্ম কি ?

উত্তর - কৃষক শষ্য নিয়ে যাওয়ার পর জমিতে এবং যেখানে শষ্যাদির ক্রয় বিক্রয় হয় সেখানে পড়ে থাকা শষ্যসমূহ জড়ো করে তার দ্বারা শরীর - নির্বাহ করা সর্বোত্তম । একেই ঋত বা সত্য বলে বলা হয়েছে । কিন্তু এই প্রণালি বর্ত্তমানে নষ্ট হয়ে যাওয়ার দরুণ এভাবে নির্বাহ করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়েছে । অতএব সাধারণ জীবিকা অনুযায়ী নির্বাহ করা উচিত ।

প্রশ্ন - সাধারণ জীবিকায় সর্বোত্তম কোনটি ?

উত্তর - যাচনা না করে নিজে থেকে যা পাওয়া যায় সেই পদার্থ সর্বোত্তম, একে অমৃত বলা হয় । নির্ধারিত করে মাইনের দ্বারা এবং যাচনা করে দান গ্রহণ করাকে নিন্দনীয় বলা হয়েছে । এর মধ্যেও যাচনা করে দান নেওয়াকে বিষতুল্য বলা হয়েছে ।

প্রশ্ন - যদি এই বৃত্তি দ্বারা জীবিকা নির্বাহ না হয় তাহলে ব্রাহ্মণের কি করা উচিত ।

উত্তর - ক্ষত্রিয়ের বৃত্তি দ্বারা নির্বাহ করা যায়, তাতেও যদি না হয় তাহলে বৈশ্যের বৃত্তি গ্রহণ করে নির্বাহ করা যেতে পারে । কিন্তু দাস বৃত্তির অবলম্বন আপদ্‌কালেও গ্রহণ করা উচিত নয় ।

প্রশ্ন - ক্ষত্রিয়ের কর্ম কি ?

উত্তর - **শৌর্য্যং তেজো ধৃতির্দাক্ষ্যং যুদ্ধে চাপ্যপলায়নম্ ।**
দানমীশ্বরভাবশ্চ ক্ষাত্রং কর্ম স্বভাবজম্ ।

"শৌর্য্য, তেজ, ধৈর্য্য, চতুরতা এবং রণক্ষেত্র থেকে না পালানোর স্বভাব তথা দান এবং স্বামীভাব এগুলি ক্ষত্রিয়ের স্বাভাবিক কর্ম ।

প্রজানাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেব চ ।
বিষয়েস্ব্প্রসক্তিশ্চ ক্ষত্রিয়স্য সমাসতঃ ।। (মনুস্মৃতি ১/৮৯)

প্রজ্ঞা রক্ষা, দান দেওয়া, যজ্ঞ করা, বিদ্যাভ্যাস এবং বিষয়সমূহে নিজেকে নিয়োজিত না করা সংক্ষেপে এগুলি ক্ষত্রিয়ের কর্ম।

এরমধ্যে প্রজা পালন করা, সৈন্যবল প্রস্তুত করা, ন্যায় করা, কর আদায় করা এবং অস্ত্রদ্বারা অন্যকে রক্ষা করা প্রভৃতি জীবিকা অর্জনের কর্ম। দান করা, যজ্ঞ করা এবং বিদ্যাভ্যাস-এ গুলি সামান্য ধর্ম।

প্রশ্ন - এই কর্ম দ্বারা যদি ক্ষত্রিয়ের জীবিকা নির্বাহ না হয় তাহলে তাঁর কি করা উচিত।

উত্তর - বৈশ্য বৃত্তি দ্বারা জীবিকা চালানো যেতে পারে, তাতেও যদি না হয় তবে শূদ্র-বৃত্তি দ্বারা কাজ চালানো যেতে পারে।

প্রশ্ন - বৈশ্যের কর্ম কি ?

পশূনাং রক্ষণং দানমিজ্যাধ্যয়নমেবচ।
বনিক্‌পথং কুসদং চ বৈশ্যষ্য কৃষিমেব চ ॥

(মনুস্মৃতি ১/৯০)

পশু রক্ষণা-বেক্ষণ, দান দেওয়া, যজ্ঞ করা, বিদ্যা অধ্যয়ন, ব্যবসায়, সুদ এবং কৃষিকার্য্য এগুলি হল বৈশ্যের কর্ম।

পশুপালন, কৃষি তথা সৎ এবং পবিত্র ব্যবসায়-এগুলি স্বভাবিক এবং জীবিকা চালানোর কর্ম। সুদও জীবিকার একটি অঙ্গ, কিন্তু কেবলমাত্র সুদ উপার্জন করা নিন্দনীয়। যজ্ঞ, দান এবং অধ্যয়ন এগুলি সামান্য ধর্ম।

প্রশ্ন - সৎ এবং পবিত্র ব্যবসায় কাহাকে বলে, একটু বুঝিয়ে বলুন ?

উত্তর - অন্যের অংশের উপর দৃষ্টি না রেখে মিথ্যা এবং কপটের ত্যাগ করে ন্যায়পূর্বক পবিত্র বস্তুসমূহের ক্রয়-বিক্রয় করা হল সৎ এবং পবিত্র ব্যবসায়।*

---

* সকল বস্তুর ক্রয় এবং বিক্রয় কার্য্যে ওজন, মাপ ও সংখ্যা আদিতে কম দেওয়া বা অধিক নেওয়া এবং বদলাইয়া অথবা এক বস্তুতে অন্য বস্তু মিশিয়ে অন্য (খারাপ) বস্তু দেওয়া অথবা ভাল নিয়ে নেওয়া তথা লাভ, আড়তদারী ও দালালী পূর্বে নিশ্চিত করে তা থেকে অধিক অর্থ নেওয়া অথবা কম দেওয়া এবং মিথ্যা, কপট, চুরী ও জবরদস্তী করে অথবা অন্য কোনও প্রকারে অন্যের সত্ত্ব গ্রহণ করে নেওয়া ইত্যাদি দোষশূণ্য যে সত্যতাপূর্বক পবিত্র বস্তুর ব্যবহার তাঁহারই নাম সত্যব্যবহার।

প্রশ্ন - এর দ্বারা যদি জীবিকা নির্বাহ না হয় তাহলে বৈশ্যের কি করা উচিত ?

উত্তর - শূদ্রবৃত্তি দ্বারা কাজ চালানো যেতে পারে কিন্তু অপবিত্র বস্তুসমূহের এবং ফাট্‌কাবাজীর কাজ কখনও যেন করা না হয় ।

প্রশ্ন - দয়া করে অপবিত্র বস্তুর ব্যাখ্যা করুন ?

উত্তর - মদ্য, মাংস, হাঁড়, চামড়া, শিং, গালা, নীল প্রভৃতি পদার্থ হল শাস্ত্রবর্জিত ঘৃণিত এবং অপবিত্র ।

প্রশ্ন - শূদ্রের কর্ম কি ?

উত্তর - সেবা এবং কারীগরীর কাজই হল এদের স্বাভাবিক এবং জীবিকা অর্জনের কর্ম ।

॥ শ্রী হরিঃ ॥

ধর্ম এবং তাঁর প্রচার ?

বর্ত্তমানে সংসারের প্রায় সকল জাতি নুন্যাধিকরূপে নিজ নিজ ধর্মের উন্নতি এবং প্রচারের জন্য নিজ নিজ পদ্ধতি অনুসারে প্রযত্ন চালাচ্ছে। এদের মধ্যে কেউ কেউ নিজের ধর্মভাব বিশ্বের সর্বত্র ছড়িয়ে দেবার জন্য অদম্য উৎসাহের সঙ্গে প্রয়াস চালাচ্ছেন । খৃষ্টধর্ম প্রচার করার জন্য খৃষ্টান-জগৎ প্রচুর অর্থ খরচ করে যাচ্ছে। আমেরিকা থেকে কোটি কোটি টাকা এই কাজের জন্য ভারতবর্ষে আসছে এবং লক্ষ লক্ষ খৃষ্টান মহিলা পুরুষগণ সুদুর গ্রামে গঞ্জে গিয়ে বিভিন্ন জনসেবা এবং লোকেদের মধ্যে লোভ জাগিয়ে, তাদের প্রলোভিত করে নানা ভাবে বাক্যজাল দ্বারা নিজেদের স্বমতে এনে ধর্মের প্রচার করে যাচ্ছে।

বিপথে চালিত কিছু লোক অপরের অর্থ, স্ত্রী প্রভৃতির অপহরণ, ধর্মের নামে হিংসা এবং ভিন্নধর্মী ব্যক্তির হত্যা করাকে-ই ধর্ম বলে মেনে নিয়েছেন এবং এর প্রচার করতে ইচ্ছুক রয়েছেন । এই ধরনের ধর্ম প্রচারের ফলে চারিদিকে অশান্তি এবং দুঃখ ছড়িয়ে পড়ছে। নিজের বুদ্ধি অনুসারে জন কল্যাণের জন্য যে ধর্মকে অধিক প্রয়োজনীয় মনে হয়, তাঁর প্রচার করার জন্য প্রযত্ন করা মানুষের কর্ত্তব্য । এই দৃষ্টিতে যদি কেউ বাস্তবিক পক্ষে এই পবিত্র উদ্দেশ্য নিয়ে শুধুমাত্র জন কল্যাণের জন্য নিজের ধর্মের প্রচার করতে ইচ্ছুক হয়, তাহলে তাঁদের এই কার্য্য অনুচিত নয়, কিন্তু তাদের এই কার্য্য দেখে আমাদের কি করণীয় এটা বিচার্য বিষয় । আমার ধারণায় একমাত্র হিন্দু ধর্ম-ই সর্বপ্রকারে পূর্ণ ধর্ম, যার চরম লক্ষ্য হল মনুষ্যকে ত্রিতাপ অনল থেকে মুক্ত করে অনন্ত সুখের শেষ সীমানায় নিয়ে গিয়ে তাকে চিরকালের জন্য আনন্দময় করে

তোলা। এই ধর্মের পবিত্র বার্তা পেয়ে বিভিন্ন সময়ে জগতের দুঃখদগ্ধ অশান্ত প্রাণী পরম শান্তি লাভ করেছেন এবং আজও জগতের উন্নত চিন্তাশীল ব্যক্তিগণ অত্যন্ত আগ্রহ সহকারে এই বার্তা পাওয়ার আশায় উদ্‌গ্রীব হয়ে রয়েছেন। যে ধর্মের এত অপার মহিমা রয়েছে, অনাদিকাল থেকে প্রচলিত, পবিত্র এবং গভীর অর্থবহ সেই ধর্মের অনুসরণকারী জাতি মোহবশে জগতের অন্যান্য অপূর্ণ মতের আশ্রয় গ্রহণ করে অজ্ঞান স্রোতে নিজেকে প্রবাহিত করতে উদ্যত-এটা অতি দুঃখের কথা।

যদি ভারতবর্ষ তাঁর শাশ্বত ধর্মের পুণ্য আদর্শ ভুলে গিয়ে পার্থিব সুখের ব্যর্থ কল্পনার পিছনে উন্মত্ত হয়ে শুধুমাত্র ভৌতিক, স্বর্গাদি সুখকে চরম প্রাপ্তবস্তু বলে স্বীকার করে এমন ধর্মের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হয়ে পড়ে তাহলে খুবই অনর্থের সম্ভাবনা রয়েছে। এই অনর্থের সুত্রপাত-ও হয়েছে। বিভিন্ন সময়ে এর অনেক উদাহরণ পাওয়া যায়। লোকে প্রায়ই পরমানন্দ প্রাপ্তির লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হয়ে শুধু নানা ধরনের ভোগ্য বস্তু অর্জন করাকেই নিজের কর্ত্তব্য বলে মেনে নিয়েছেন। ধর্ম অবক্ষয়ের এই প্রারম্ভিক দুষ্পরিণাম দেখেও যদি ধর্মপ্রেমী বন্ধুগণ ধর্ম নাশের ফলে উৎপন্ন এই ভয়ানক বিপত্তি থেকে জাতিকে বাঁচাবার জন্য আশাপ্রদ ভাবে চেষ্টা না করেন তাহলে তা অতিশয় পরিতাপের বিষয়!

বর্ত্তমানে আমাদের দেশে অধিকাংশ লোক শুধু অর্থ, নাম এবং কীর্ত্তি অর্জনের পিছনেই নিজের অমুল্য এবং দুর্লভ সময়কে খরচ করছেন। কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তি স্বরাজ্য এবং সংস্কারের কাজে নিযুক্ত রয়েছেন, কিন্তু সেই সত্য ধর্মের প্রচারের জন্য তো যৎকিঞ্চিৎ কাহাকেও দেখা যায়! যদিও মান, বড়াই এবং প্রতিষ্ঠার কামনা এবং স্বার্থপরতার ত্যাগ করে স্বরাজ্য এবং সমাজ সংস্কারের জন্য প্রযত্ন করলেও আসল সুখ লাভের ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ সুফল হয়, কিন্তু ভৌতিক

সুখের চেষ্টা আসলে পরম লক্ষ্য ভুলিয়ে দেয় । সেই শান্তিপ্রদ সত্য ধর্মের প্রচার কার্য্য-ই আসল সুখের প্রাপ্তিতে পূর্ণভাবে সাহায্য করতে পারে ।

যদিও সংসারের মতমতান্তরের জ্ঞান আমার খুবই কম, কিন্তু সাধারণভাবে আমি বিশ্বাস করি যে, সর্বোত্তম এবং সকলের পক্ষে উপযোগী ধর্ম তাকেই বলা যাবে, যার লক্ষ্য সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ, নিত্য, যাতে নিরন্তর আনন্দ প্রাপ্ত হয় এবং যাতে সকলের অধিকার আছে । কেবল মাত্র পার্থিব বা স্বর্গসুখের বর্ণনাকারী ধর্মও বুদ্ধিমানের নিকট গ্রহনীয় নয় । অতএব সেটাই সর্বোত্তম ধর্ম যা পরম কল্যাণ লাভ করতে সাহায্য করে । আমার ধারণায় তা হল একমাত্র বৈদিক সনাতর ধর্ম নিম্নলিখিতভাবে শাস্ত্রে যার স্বরূপ বর্ণনা করা হয়েছে ।

অভয়ং সত্ত্বসংশুদ্ধির্জ্ঞানযোগব্যবস্থিতিঃ ।
দানং দমশ্চ যজ্ঞশ্চ স্বাধ্যায়স্তপ আর্জবম্ ।।
অহিংসা সত্যমক্রোধস্ত্যাগঃ শান্তিরপৈশুনম্ ।
দয়া ভূতেস্বলোলুপ্তং মার্দ্দবং হ্রীঃরচাপলম্ ।।
তেজঃ ক্ষমা ধৃতিঃ শৌচমদ্রোহো নাতিমানিতা ।
ভবন্তি সম্পদং দৈবীমভিজাতস্য ভারত ।। (গীতা ১৬/১-৩)

"সর্বথা ভয়ের অভাব, অন্তঃকরণের উত্তমরূপে স্বচ্ছতা, তত্ত্বজ্ঞানের নিমিত্ত ধ্যানযোগে নিরন্তর দৃঢ় স্থিতি,★ সাত্ত্বিক দান,✣ ইন্দ্রিয়সমূহের দমন, ভগবৎপূজা ও অগ্নিহোত্রাদি উত্তম কর্মসমূহের আচরণ এবং বেদ শাস্ত্রের পঠন পাঠন পূর্বক ভগবানের নাম ও গুণ কীর্ত্তন তথা স্বধর্ম পালনের নিমিত্ত কষ্ট সহ্য করা এবং শরীর ও ইন্দ্রিয়ের সহিত অন্তঃকরণের সরলতা, কায়মনোবাক্য দ্বারা কাহাকেও কোনও প্রকারে কষ্ট

★ পরমাত্মার স্বরূপ তত্ত্বতঃ জানিবার নিমিত্ত সচ্চিদানন্দঘন পরমাত্মার স্বরূপে একীভাবে ধ্যানে নিরন্তর গাঢ় স্থিতিরই নাম "জ্ঞানযোগব্যবস্থিতি" বুঝিতে হইবে ।

✣ গীতা অধ্যায় ১৭ শ্লোকসংখ্যা ২০ অনুযায়ী দানকরাই কর্ত্তব্য এরূপ মনে করে যে দান দেশ (যে দেশে যে কালে যে বস্তুর অভাব হয় সেই দেশ ও কাল সেই বস্তু দ্বারা প্রাণীগণের সেবা করিবার যোগ্য বুঝা যায়) ও পাত্র প্রাপ্ত হইলে অনুপকারী ব্যক্তিকে দেওয়া হয়, সেই দান সাত্ত্বিক কথিত হইয়াছে ।

না দেওয়া, যথার্থ ও প্রিয় ভাষণ,❀ স্বীয় অপকারকারীর প্রতিও ক্রোধ না হওয়া, সফল কর্মে কর্ত্তৃত্বাভিমান পরিত্যাগ করা, অন্তঃকরণের উপরামতা অর্থাৎ চঞ্চলতার অভাব, কাহারও নিন্দাদি না করা, সকল ভূতপ্রাণীদিগের প্রতি হেতুরহিত দয়া, বিষয় সমূহের সহিত ইন্দ্রিয়গণের সংযোগ হইলেও আসক্তি না হওয়া, কোমলতা, লোক ও শাস্ত্রবিরুদ্ধ আচরনে লজ্জা, ব্যর্থ চেষ্টা সকলের অভাব, তেজ,✤ ক্ষমা, ধৈর্য্য, অন্তর বাহিরের শুদ্ধি⑥ কাহারও প্রতি শত্রুভাব না হওয়া, আপনাতে পূজ্যতা অভিমানের অভাব - হে অর্জুন এইগুলি হল দৈবী সম্পদ্ প্রাপ্ত পুরুষের চিহ্ন ।

ধৃতি ক্ষমা দমোঽস্তেয়ং শৌচমিনিন্দ্রয়নিগ্রহঃ ।
ধীর্বিদ্যা সত্যমক্রোধো দশকং ধর্মলক্ষণম্ ।। (মনু ৬/৯২)

ধৈর্য্য, ক্ষমা, মনের নিগ্রহ, চুরী না করা, বাহির ভিতরের শুদ্ধি, ইন্দ্রিয়সমুহের সংযম, সাত্ত্বিক বুদ্ধি, আধ্যাত্মবিদ্যা, যথার্থ ভাষণ এবং ক্রোধ না করা—এগুলি ধর্মের চিহ্ন ।

অহিংসাসত্যাস্তেয়ব্রহ্মচর্য্য পরিগ্রহা যমাঃ । (যোগ ২/৩০)

"অহিংসা, সত্যভাষণ, চুরী না করা, ব্রহ্মচর্য্যের পালন এবং ভোগ্য বস্তু সংগ্রহ না করা"-এই পাচটি যমের চিহ্ন ।

শৌচসন্তোষতপঃ স্বধ্যাযেশ্বরপ্রণিধানানি নিয়মাঃ ।। (যোগ ২/৩২)

"বাহির ভিতরের পবিত্রতা, সন্তোষ, তপ, স্বাধ্যায়, এবং সর্বস্ব ঈশ্বরে অর্পণ এই পাঁচটি হল নিয়ম । এই সকলের নিস্কামভাবে পালন করাই হল প্রকৃত ধর্ম্মাচরণ" ।

❀ অন্তঃকরণ এবং ইন্দ্রিয়দ্বারা যে ভাবের নিশ্চয় হয় ঠিক্‌ঠিক্ সেই ভাবই প্রিয়শব্দ দ্বারা বলার নাম সত্যভাষণ ।

✤ শ্রেষ্ঠ পুরুষগণের সেই শক্তির নাম তেজ, যাহার প্রভাবে তাহাদের সমক্ষে বিষয়সক্ত ও নীচ প্রকৃতিবিশিষ্ট মনুষ্যও প্রায় অন্যায় আচরণ হইতে নিবৃত্ত হইয়া তাদের উপদেশানুসারে শ্রেষ্ঠ কর্মসমূহে প্রবৃত্ত হইয়া যায় ।

⑥ সত্যতাপূর্বক শুদ্ধব্যবহার দ্বারা অর্থের এবং তদ্বারা প্রাপ্ত অন্নের দ্বারা আহারের আর যথাযোগ্য বর্ত্তনে আচরনের এবং জল মৃত্তিকাদি দ্বারা শরীরের শুদ্ধিকে "বাহিরের শুদ্ধি" কহে এবং রাগ, দ্বেষ, কপটাদি বিকারের নাশ হইয়া অন্তঃকরনের স্বচ্ছ হওয়ার নাম অন্তরের শুদ্ধি ।

এগুলিই ধর্মের সর্বোত্তম লক্ষণ (চিহ্ন) এবং এর দ্বারাই পরমপদ প্রাপ্ত হয় । অতএব যারা সত্যিকারের মনুষ্য সেবা করতে চান, তাদের উচিত যে তারা যেন উপর্যুক্ত চিহ্নযুক্ত ধর্মকে উন্নতির পরম সাধনা মনে করে স্বয়ং তার আচরন করে এবং নিজের উদাহরণ এবং যুক্তিদ্বারা এই ধর্মের মাহাত্ম্য বিশ্লেষণ করে প্রতিটি মানুষের হৃদয়ে তা গ্রহণের জন্য তীব্র ইচ্ছা জাগিয়ে তোলে । বাস্তবে ইহাই ধর্মের আসল প্রচার এবং এর দ্বারাই লৌকিক উত্থানের সঙ্গে সঙ্গে দেশ কালের সীমার অতীত মুক্তিরূপ পরম কল্যাণের প্রাপ্তি হতে পারে । এই স্থিতিতে পৌছে মানুষ আর দুঃখরূপ সংসারে পুনরায় ফিরে আসে না । এদের লক্ষ্য করে শ্রুতি-তে বলা হয়েছে –

ন চ পুনরাবর্ততে ন চ পুনরাবর্ততে । (ছান্দোগ্য ৮/১৫/১)

এই পরম আনন্দের নিত্য এবং মধুর স্বাদ আস্বাদন করাবার জন্য প্রতিটি মানুষের বিশেষভাবে বৈদিক সনাতন ধর্মের প্রচারের জন্য চেষ্টা করা উচিত ।

কারও কারও মতে স্বরাজ্য এবং বিপুল অর্থের অভাবে ধর্মপ্রচার হতে পারে না; কিন্তু আমার ধারণায় তাঁদের এই মত পুরোপুরি ঠিক নয় ।

রাজনৈতিক অধিকার অর্জনের ফলে ধর্ম-প্রচারে সাহায্য হতে পারে, কিন্তু এটা ঠিক নয় যে স্বরাজ্য না পেলে ধর্ম-প্রচার হতেই পারে না । ধর্ম পালনের দ্বারা সর্বশ্রেষ্ঠ আধ্যাত্মিক স্বরাজ্য পাওয়া যেতে পারে; এর তুলনায় এই সাধারণ স্বরাজ্যের কথা আর কি বলার আছে ! এটা তো অনায়াসেই পাওয়া যেতে পারে ।

ধর্মের প্রচারের জন্য অর্থেরও প্রয়োজন নেই, সম্ভবতঃ এর দ্বারা আংশিকরূপে কিছুটা সাহায্য হতে পারে । এরজন্য প্রধান আবশ্যকতা রয়েছে প্রকৃত ত্যাগী এবং ধর্মজ্ঞ প্রচারকের । এরূপ ব্যক্তি যদি মান, বড়াই, নিজের প্রচার এবং স্বার্থত্যাগ করে প্রাণপণে ধর্ম-প্রচারের জন্য কটিবদ্ধ হয় তাহলে দ্রব্য প্রভৃতি বস্তুর কোন অভাব থাকতে পারে না, উপরন্তু তারা প্রতিপক্ষিদের উপরেও ভালোবাসায় বিজয় প্রাপ্ত করে

তাদেরও নিজের বন্ধু-তে পরিণত করতে পারেন। শুধুমাত্র সংখ্যাবৃদ্ধির জন্য লোভ বা কথার বাক্যজালে ফুসলিয়ে বা ভয় দেখিয়ে কারও ধর্ম পরিবর্ত্তন করার ফলে তাঁর বিশেষ কোন হিতসাধনের কারণ হয় না এবং এরূপ স্বার্থযুক্ত ধর্ম প্রচারের ফলে প্রচারকেরও বিশেষ কোন ফল (লাভ) হয় না। মানুষ যখন ধর্মের মাহাত্ম স্বয়ং ভাল ভাবে বুঝে তা পালন করে, তখন সে তাতে আনন্দ এবং শান্তি পায় এবং এরূপ অপূর্ব আনন্দ এবং পরম শান্তির অনুভব করার ফলেই মানুষ সংসারের পাঁকে আবদ্ধ অশান্ত, দুঃখী জীবের শোচনীয় স্থিতি দেখে করুণাপূর্ণ চিত্তে তাদের শান্ত এবং সুখী করার জন্য প্রযত্ন করে থাকে, এটাই হল সত্যিকারের ধর্ম প্রচার।

অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় যে, এই অপার আনন্দের প্রতক্ষ্য সাগর থাকলেও লোকে দুঃখরূপ সংসার সাগরে মগ্ন হয়ে ভয়ানক সন্তাপ প্রাপ্ত হচ্ছে। মৃগতৃষ্ণায় পরিশ্রান্ত এবং ব্যাকুল মৃগসমূহ যেমন গঙ্গাতীরে থেকেও ভয়ানক তৃষ্ণায় ব্যাকুল হয়ে ছটফট করে মরে যায়, বর্ত্তমানে সেইরূপ অবস্থা আমার ভাইবোনদের হয়েছে।

সত্য ধর্ম পালনের ফলে যে অপার আনন্দের স্থিতি হয় তা না বোঝার জন্য মানুষের বর্ত্তমান অবস্থা হচ্ছে। অতএব এমন লোকেদের দয়ার পাত্র মনে করে তাদের সনাতন বৈদিক ধর্মের তত্ত্ব বোঝাবার জন্য সচেষ্ট হলে তাঁদের উপকার এবং সত্যিকারের সংশোধন হওয়া সম্ভব। এই ধর্মের বর্ণনা রয়েছে এমন অনেক গ্রন্থ আমাদের রয়েছে এবং এই সকল গ্রন্থের চিন্তন এবং অনুশীলন করা খুব সহজ নয়। অতএব এমন একটি গ্রন্থ অবলম্বন করা উত্তম যা সরল সহজ ভাবে মানুষকে এই পুণ্য পথে নিয়ে আসতে পারে। আমার ধারণায় এই পবিত্র গ্রন্থ হল শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা। খুব স্বল্প সরল শব্দে অতি কঠিন সিদ্ধান্তকে ভালভাবে বুঝাবার মত, সকল প্রকারের সাধকের পক্ষে তাদের অধিকার অনুসারে উপর্যুক্ত পথ-প্রদর্শনকারী, প্রকৃত ধর্মের পথপ্রদর্শক, পক্ষপাত এবং স্বার্থরহিত উপদেশ সমূহের অপূর্ব সংগ্রহযুক্ত এই একটিই হল সার্বভৌম মহান্ গ্রন্থ। জগতের অধিকাংশ মহানুভব ইহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার

করেছেন। গীতায় এমন কয়েকশত শ্লোক রয়েছে* যার একটিও পূর্ণভাব ধারন করলে মানুষ মুক্ত হতে পারে, কাজেই সম্পূর্ণ গীতার কথা আর কি বলার আছে!

অতএব ধর্মের বিস্তৃত বিশ্লেষণ যুক্ত গ্রন্থ দেখার যাদের সময় হয়ে ওঠে না, তাদের উচিত তারা যেন

অর্থসহিত গীতার অধ্যয়ন অবশ্যই করেন এবং এতে বর্ণিত উপদেশ পালনে তৎপর হোন। মনুষ্যমাত্রই মুক্তির অধিকারী এবং গীতা মুক্তি পথপ্রদর্শক একটি প্রধান গ্রন্থ, সেইজন্য পরমেশ্বরে ভক্তি এবং শ্রদ্ধাকারী প্রতিটি আস্তিক মনুষ্যের এতে অধিকার রয়েছে। গীতা প্রচারের ক্ষেত্রে ভগবান কোনও দেশ, কাল, জাতি বা ব্যক্তিবিশেষের জন্য কোন প্রতিবন্ধকের বিধান রাখেন নি, বরঞ্চ ভক্তগণের মধ্যে গীতার প্রচারকারীকে নিজের সর্বশ্রেষ্ঠ প্রেমী রূপে চিহ্নিত করেছেন।

য ইমং পরমং গুহ্যং মদ্ভক্তেষ্বভিধাস্যতি।
ভক্তিং ময়ি পরাং কৃত্বা মামেবৈষ্যত্যসংশয় ॥

(গীতা ১৮/৬৮)

"যে পুরুষ আমাতে পরম প্রেম করে এই পরম রহস্যযুক্ত গীতা শাস্ত্র আমার ভক্তগণের নিকটে বলবে, অর্থাৎ নিস্কামভাবে প্রেমপূর্বক আমার ভক্তগণের পড়াইবে বা অর্থের ব্যাখ্যা দ্বারা ইহার প্রচার করবে, সে নিশ্চয় আমাকেই প্রাপ্ত হবে।"

ন চ তস্মান্মনুষ্যেষু কশ্চিন্মে প্রিয়কৃত্তমঃ।
ভবিতা ন চ মে তস্মাদন্যঃ প্রিয়তরো ভুবি ॥

(গীতা ১৮/৬৯)

"এবং তাঁর চেয়ে আমার অতিশয় প্রিয় কর্মকারী মনুষ্যদিগের মধ্যে কেহ নেই এবং তা থেকে অধিক আমার প্রিয়তর পৃথিবীতে অন্য কেহ হবেও না।"

---

* যেমন গীতা অধ্যায় ২।৭১, ৩।৩০, ৪।৩৪, ৫।২৯, ৬।৪৭, ৭।১৪, ৮।১৪, ৯।৩২, ১০।৯, ১০, ১১।৫৪,৫৫, ১২।৮, ১৩।১০, ১৪।১৯,২৬, ১৫।১৯, ১৬।১, ১৭।১৬, ১৮।৬৫, ৬৬ প্রভৃতি।

অতএব সকল দেশের সকল জাতিতে গীতাশাস্ত্রের প্রচার প্রবল ভাবে করা উচিত। কেবলমাত্র গীতার প্রচারের দ্বারাই পৃথিবীর মানুষের উদ্ধার হতে পারে। কাজেই এই গীতা-ধর্মের প্রচারের জন্য সকলের প্রযত্নশীল হওয়া উচিত। এর দ্বারা সকলেই আত্যন্তিক সুখ প্রাপ্ত হতে পারে। **এটিই** একমাত্র সরল, সহজ, এবং মুখ্য উপায়।

****

***

*
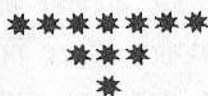
॥ শ্রী হরিঃ ॥

ব্যবসায়ে সংশোধনের আবশ্যকতা ?

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের ব্যবসায় এবং ব্যবসায়ীবর্গের অবস্থা অতি দুর্দশাগ্রস্ত । ব্যবসায়ের এই দুরবস্থায় জন্য বিদেশী শাসনও একটি বড় কারণ কিন্তু প্রধান কারণ হল ব্যবসায়ী বর্গের নৈতিক অধঃপতন । ব্যবসায়ে উন্নতির আসল রহস্যকে ভূলিয়ে দিয়ে লোকে ব্যবসায়ে কপট জালসাজী, মিথ্যে প্রভৃতিকে গ্রহণ করে তাঁকে অতিশয় ঘৃনাস্পদ করে তুলছেন । অত্যধিক লোভের বর্দ্ধিত বৃত্তির ফলে যে কোনও উপায় অর্থ উপার্জ্জন করাকে ব্যবসায় বলে স্বীকার করে নেওয়া হয়েছে । অনেকেই ব্যবসায়ে মিথ্যা, কপটতা প্রভৃতি থাকাকে আবশ্যক এবং স্বাভাবিক বলে মেনে নিয়েছেন এবং এরূপ বলেও থাকেন যে ব্যবসায়ে মিথ্যে, কপট ছাড়া কাজ হয় না । কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইহা একটি বড় ভ্রম । ছল, কপট, মিথ্যে প্রভৃতির ফলে ব্যবসায়ে আর্থিক লাভ হওয়া তো দূরের কথা অধিকন্তু ক্ষতি হয়ে থাকে । ধর্মের ক্ষতি তো খুবই স্পষ্ট । ব্যবসা-জগতে অন্যের অপেক্ষা ইংরাজ জাতির প্রতি অধিক বিশ্বাস রয়েছে । ব্যবসায়ীবর্গ ইংরাজদেব সঙ্গে ব্যবসা করতে ততখানী ঝুকি মনে করে না যা তারা নিজেদের মধ্যে ব্যবসা করতে ভেবে থাকেন । দেখা যায় যে খাদ্যশষ্য এবং তৈলবীজ প্রভৃতি ইংরাজদের বাজারদরের চেয়ে কিছু কম দামেও বিক্রি করা হয়ে থাকে এবং আমদানী করা মালের খরিদ বিক্রির ক্ষেত্রেও ইংরাজদের প্রাথমিকতা দেওয়া হয়, এর এটাই কারণ যে ইংরাজদের মধ্যে সততা বেশী । এইজন্যই তাঁদের উপর লোকের বিশ্বাস বেশী । আমার বলার তাৎপর্য এই নয় যে ইংরাজদের মধ্যে সকলেই সৎ এবং ভারতীয় ব্যবসায়ীরা সকলেই অসৎ । আমার বলার তাৎপর্য্য এই

যে, ব্যবসায়ে আমাদের চাইতে তাদের ব্যবহারে সততা বেশী। কিন্তু তাঁদের এই সততার পিছনে কোন ধার্মিক দৃষ্টিকোন নেই বরঞ্চ তা হল ব্যবসায়ে শ্রীবৃদ্ধি এবং অবাঞ্ছিত ঝামেলা এড়ানো।

ব্যবসায়ে সততা থাকার জন্য যে সকল ইংরাজ এবং ভারতীয় ফার্মের প্রতি জনসাধারনের বিশ্বাস বয়েছে তাঁদের মাল কিছু বেশী দামে কিনতেও লোকে দ্বিধা করে না, যদি বাজার দরে মাল পাওয়া যায় তাহলে লোকে গরজ করতে কাজ করতে চায়।

ব্যবসায়ে প্রধানতঃ ক্রয় বিক্রয় হয়ে থাকে এবং তা বিভিন্ন মাপদণ্ডে হয়ে থাকে ; কোন বস্তু ওজনে বিক্রি হয়, কোনটা মেপে, কোনটা বা গননা করে। নমুনা দেখা বা দেখানোও একটি ক্রম রয়েছে। যারা অপরের হয়ে মাল খরিদ বিক্রি করে থাকে তাঁদের আড়তদার বলা হয় এবং যারা অপরের কাছ থেকে অপর কাউকে কারও পক্ষ না নিয়ে সঠিক দামে কারও প্রতি পক্ষপাত না করে ন্যায্য দালালী নিয়ে মাল খরিদ করিয়ে দিয়ে থাকেন, তাঁদের দালাল বলা হয়। এই ভাবে ব্যবসা করা হয়ে থাকে। বস্তুর ক্রয় বিক্রয়ে ওজন মাপ এবং সংখ্যা প্রভৃতিতে কম দেওয়া বা অধিক নেওয়া, বস্তু বদল করে এক বস্তুর মধ্যে অন্য নিম্নশ্রেনীর বস্তু মিশিয়ে দেওয়া বা বঞ্চনা করে ভাল বস্তু নিয়ে নেওয়া মুনাফা, আড়তদারী বা দালালী পূর্বে নিশ্চিত করে পরে তাঁর চাইতে অধিক নেওয়া, বা কম দেওয়া, আড়ত বা দালালীর জন্য মিথ্যা বুঝিয়ে কাজ হাসিল করা, কিংবা চুরি, মিথ্যে, কপট বা জোর জবরদস্তী দ্বারা কারও ন্যায্য পাওয়া নিজে হস্তগত করা- এগুলি হল ব্যবসায়ের দোষ। বর্ত্তমানে এই সমস্ত দোষের বিশেষভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। কোন দোষের কিছুমাত্র পরোয়া না করে যে কোনও উপায়ে যে অর্থ উপার্জন করে তাকে লোকে চতুর এবং বুদ্ধিমান মনে করে। সমাজে সে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অর্থ রোজগারের ফলে তাঁর পরিবার এবং সমাজ তাঁর সকল কুকাজ সহ্য করে নেয়। এই জন্যই মিথ্যে, কপটতা প্রভৃতির প্রবৃত্তি প্রতিদিন বেড়েই চলেছে। ব্যবসায়ে মিথ্যে, কপটতা, প্রভৃতি করা উচিত নয় অথবা এগুলি না করলেও যে

অর্থ উপার্জন করা যায়, এরূপ ধারনা প্রায়ষঃ লোপ হতে চলেছে কাজেই যে দিকে তাকাই এহ দৃষ্টিকোন পরিলক্ষিত হতে থাকে।

অধিকাংশ ভারতীয় মিল মালিকের সঙ্গে কারবার করলে ব্যবসায়ীবর্গের সর্বদাই এই ভয় থাকে যে বাজারে দর বেড়ে গেলে নমুনা অনুয়ায়ী মাল ডেলীভারি দেওয়া হবে না কিংবা সময়মত মাল পাওয়া যাবে না। কাপড় মিলে যে ধরনের কারচুপী করা হয়ে থাকে, যদি বাস্তবে তা সত্য হয় তবে সমগ্র ব্যবসায়ে তা একটা আঘাত আনবে। তুলো ক্রয় করার সময়ে মেনেজিং এজেন্টগণও খুব গোলমাল করে থাকেন।

তুলো বাজারে দরের খুব উঠা নামা হয়ে থাকে। তুলোর সওদা হয়ে যাবার পর যদি দর বেড়ে যায়, তাহলে এজেন্ট সেই তুলো নিজের নামে রেখে নেয় এবং যদি দর পড়ে যায় তাহলে নিজের নামে কেনা তুলো সুযোগ বুঝে মিলের একাউন্টে খরিদ দেখিয়ে থাকে। ওজন বাড়াবার জন্য কাপড়ে কলপ মেশাবার কাজে আমেদাবাদ বিখ্যাত। তুলোর দাম বেড়ে গেলে বুনোর কাজে সুতো কমিয়ে দেওয়া হয়। বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়ে কণ্ট্রাকটরের মালও সময়মত ডেলিভারী দেওয়া হয় না। থানের কাপড়ে দৈর্ঘ্য প্রস্তেও মাপে কম করে দেওয়া হয়ে থাকে। সূতোর বাণ্ডিলেও ওজন কমিয়ে দেওয়া হয়, এই সমস্ত বিভিন্ন কারণে অধিকাংশ মিলের বাজারে প্রভাব পড়ে না। অপর পক্ষে বিদেশী বস্ত্রের ব্যবসা আমাদের পক্ষের ক্ষতিকর হওয়া সত্ত্বেও শর্ত পালনে অধিক উদারতা এবং সততার জন্য অনেক দেশী ব্যবসায়ী এই কাজ ছেড়ে দিতে চায় না। এখানকার মালের অধিক দাম হওয়ার একমাত্র কারণ হল অত্যধিক লোভ। খাদ্য বস্তুতে অন্যান্য নিম্নশ্রেনীর পদার্থ, মাটি প্রভৃতি মেশানো থাকে। জীরা, ধনে, সরষে, তিল প্রভৃতি বস্তুতে অন্যান্য বস্তু কিংবা মাটি মেশানো হয়ে থাকে। কৃষক তো সামান্য মাটির ভেজাল দেয়, কিন্তু ব্যবসায়ীবর্গ সেই রংগের মাটি খরিদ করে অধিক পরিমাণে মিশিয়ে থাকে। মালের ওজন বাড়াবার জন্য বর্ষাকালে তা ভিজে জায়গায় রাখা হয়, ফলে কোনও কোনও ক্ষেত্রে মাল পঁচে যায়,

এই পচা মাল খেয়ে যদি লোকে অসুখেও পড়ে তবুও ব্যবসায়ীর ঘরে অধিক উপার্জন হওয়া চাই। শস্য প্রভৃতি মজুত করার স্থানে আগে থেকেই তলায় এবং কোনার দিকে নিম্নশ্রেনীর মাল রেখে সামনের দিকে নমুনা দেখানোর জন্য ভাল মাল রেখে দেওয়া হয়, ওজনেও কারচুপী করা হয়। মালপত্র ওজন করার বাটখারা দুই ওজনের রাখা হয়।

পাটের ব্যবসায়েও চুরি কম হয় না। ওজন বাড়ানোর জন্য জল মেশানো হয়। মিলে যারা নিরীক্ষণ কাজে নিযুক্ত তাদের কিছু উৎকোচ দিয়ে ভাল মালের জায়গায় নিম্ন শ্রেনীর মাল দিয়ে দেওয়া হয়। ওজনেও চুরি করা হয়। এরূপে তুলোতেও জল এবং মাটি মেশানো হয়। পাটের মত তুলোর বান্ডিলেও ভিতরে খারাপ মাল ঢুকিয়ে দেওয়া হয়।

চাষীর কাছ থেকে বস্তু কেনার সময় দামে, ওজনে কম দিয়ে তার অপেক্ষা ভাল বস্তু হস্তগত করে ধোঁকা দিয়ে তাদের ঠকানোর চেষ্টা করা হয় এবং বিক্রি করার সময় এর উল্টো করার চেষ্টা হয়ে থাকে।

খাদ্য পদার্থের মধ্যেও শুদ্ধ ঘী, তেল এমনটি আটা পাওয়াও কঠিন হয়ে পড়েছে। এমন কোন কাজ নেই যা ব্যবসায়ীরা লোভবশে না করে। ঘীয়ের মধ্যে চর্বী, তেল, ভেজিটেবল ঘী এবং কেরোসীন তেলও মেশানো হয়। তেলেও কম ভেজাল দেওয়া হয় না। সরিষার সঙ্গে তিসি, রেড়ী মেশানো হয়ে থাকে এবং বড় বড় মিলে কুসুমের বীজও মেশানো হয়। এর ফলে বদহজম, কলেরা, আমাশয় প্রভৃতি রোগের বিস্তার হয়। মানুষ কষ্ট পায়, মারাও পড়ে, কিন্তু লোভীর এদিকে কোন ভ্রুক্ষেপ নেই ! এই তেলের খৈল গাভীকে খাওয়ানো হয় ফলে তাঁরা বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হয়। যারা নিজেকে গোভক্ত এবং গোপালক বলে দাবী করেন তাদের দ্বারাও এই জঘন্য কাজ করা হয়ে থাকে। যখন সরকারী অফিসার এই সমস্ত মিল পরিদর্শনের জন্য আসেন তখন তাঁদের ধোঁকা দিয়ে বা অর্থ উৎকোচ দিয়ে সরিয়ে দেওয়া হয়। "জ্বালানী তেল" এরূপ সাইনবোর্ড টাঙ্গিয়েও দন্ড এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করা হয়।

নারিকেল, সরিষা, তিল প্রভৃতির তেলে এক ধরনের বিদেশী কেরোসীন তেল মেশানো হয় যা পেটে বিভিন্ন ধরনের অসুখের সৃষ্টি করে।

বর্ত্তমানে রোগের যে এত বিস্তার হয়েছে, প্রায় প্রতিটি ঘরেই রোগী দেখা যায় এর একটি প্রধান কারণ হল লোভের বশীভূত হয়ে খাদ্য পদার্থে অখাদ্য বস্তুর ভেজাল দেওয়া।

কাপড়ের ব্যবসাতেও ছোট বড় সব জায়গাতেই চুরি হয়ে থাকে। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় বড় শহরের বড় দোকানদাররা বড় চুরী করে, গ্রামের দোকানদাররাও কোন অংশে বাদ যায় না। যেখানে নির্দিষ্ট মুনাফায় মাল বিক্রি করার নিয়ম রয়েছে, সেখানে তাঁরা খরিদদারকে ঠগবার জন্য জাল বিল্টি আনিয়ে নেন। মুখে এক কাজে এক।

সুতোর গ্রাম্য ব্যবসারীরাও সুতোর বান্ডিল থেকে সুতোর মোঠার বদল করে ৮ নং থেকে ১৬ নম্বরের সুতোর মোঠা বানিয়ে থাকে। কলকাতার কিছু কারখানায় শুধু এই ধরনের জালাসাজীর কাজ করা হয়ে থাকে, যারা কাপড় বোনে তাদের ঠকাবার জন্য এরূপ করা হয়ে থাকে! এতে খরচায় বৃদ্ধি হয়, কাপড় বুননকারী ঠকে এবং সুতো জড়িয়ে যায়।

কোথাও কোথাও এমন চিনি মিলও আছে যেখানে বিদেশী চিনিতে গুড় মিশিয়ে রঙ্গের বদল করা হয় এবং বেনারসের বা দিশী চিনীর নামে বিক্রি করা হয়।

আড়ত, দালালী, কমীশন প্রভৃতিতেও বিভিন্নভাবে চুরি করা হয়ে থাকে। আড়তদারদের এরূপ মনে রাখা উচিত যে আড়তদারীর যে দর পূর্ব থেকে নিশ্চিত করা হয়েছে, কারচুপী করে তাঁর চাইতে এক পয়সাও বেশী নেওয়া সে যেন হারামের মনে করে। মহাজনকে জানানো হয় যে ১/২% কিংবা ৩/৪% আড়ত নেত্তয়া হবে কিন্তু ছল,কপট করে বেশী মাত্রায় আদায় করা হয়ে থাকে এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে ২%, ৩% কিংবা ৪% আদায় করেও তৃপ্তি হয় না। চট, বস্তা, মজুরি ইত্যাদির

আঁড়ালে মহাজনের কাছ থেকে লুকিয়ে কিংবা মালের উপর অধিক মূল্য চাপিয়ে দালালী কিংবা রিবেট তাকে না দেওয়া , অথবা নিজের মালকে বাজার থেকে খরিদ করা হয়েছে এরূপ দেখিয়ে এবং অন্য বিভিন্ন অসৎ উপায়ে মহাজনকে ঠকানো হয় ।

কমিশনের কাজেও বড় বড় চুরি হয়ে থাকে । বাজার দর পড়ে গেলে পূর্বের অধিক দরের বিক্রিত বস্তুকে বর্ত্তমানের কম দরের বিক্রি বলে চালিয়ে দেওয়া হয় । বাজার দর উচুঁ হলে অন্যের সঙ্গে সাঁঠগাঠ করে বাস্তবে বিক্রি না হলেও পূর্বের তারিখে বহু মালের খরিদ দেখিয়ে তাঁরা বর্ত্তমান দরে মিথ্যে বিক্রি দেখানো হয় । নির্ধারিত দরের চাইতেও বেশী বা কম দরে মাল বিক্রি করা হয় ।

দালালির কাজে নিজের সামান্য মুনাফার জন্য খরিদদারের যথেষ্ট ক্ষতি করা হয় । এটা দালালের কর্ত্তব্য যে, যার মাল যাকে দেখানো হয়, উভয়ের প্রতিই তার যেন সমান হিতের ভাব থাকে । লোভবশে নিজের অধিক অর্থ উপার্জনের উপরে দৃষ্টি রেখে উভয়কে ভুল বুঝিয়ে খরিদদারকে দর বাড়বার এবং বিক্রেতাকে দর কমে যাওয়ার কথা বুঝিয়ে কাজ হাসিল করা খুবই অন্যায় । সততার সঙ্গে নিজের মত স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া উচিত । উভয়পক্ষকেই নিজের স্পষ্ট ধারণা এবং বাজারের প্রকৃত পরিস্থিতি জানানো উচিত ।

এ বিষয়ে আর কত বলা যাবে ! ব্যবসার নামে চুরি, ডাকাতি প্রতারণা সবই করা হয়ে থাকে । ঈশ্বর, প্রারব্ধ, ন্যায়, সত্য প্রভৃতি কারও উপর বিশ্বাস নেই । আসলে ব্যবসায়ে কুশলতা-ও নেই । দক্ষ ব্যবসায়ী সৎ হয়ে থাকে, সে কাহাকেও বঞ্চনা করে না । সততার সঙ্গে ব্যবসা করে সে সকলের বিশ্বাস অর্জন করে, যত বিশ্বাস বাড়ে, ব্যবসায়ে ঝামেলা তত কমে আসে, এবং ব্যবসাতেও ক্রমান্নয়ে উন্নতি হতে থাকে । যারা দরদাম করে মালের বিক্রি করে, গ্রাহকদের সঙ্গে তাদের যথেষ্ট মানসিক পরিশ্রম করতে হয় । একবার বিশ্বাস জমে গেলে যে একদামে মাল বিক্রি করে, মাল বেচতে তাঁর কোন আয়াস হয় না ; গ্রাহক গরজ করে, দাম জিজ্ঞাসা না করেই তাঁর মাল খরিদ করে থাকে, সেখানে

তাদের ঠকে যাবার কোন ভয় থাকে না। কিন্তু আজকাল তো প্রায় সকলেই দোকান খোলার সময় এরুপ প্রার্থনা করে থাকে যে, হে, ভগবান, এমন কোন খরিদদার পাঠাও যার পকেট টাকায় ভর্ত্তি কিন্তু যার আক্কেল নেই। অর্থাৎ ভগবান যেন এমন গ্রাহক পাঠান যাহাকে আমরা ঠকাতে পারি, মূর্খতাবশে নির্বিবাদে যে আমাদের কাছে তাঁর সর্ব্বস্য খোয়াতে পারে। এতে এটা প্রমাণীত হয় যে কোনও গ্রাহক নিজের বুদ্ধি এবং সাবধানতার ফলে যদি নিজেকে রক্ষা করতে না পারে তাহলে দোকানদার তার সর্বস্য লুণ্ঠন করতে সর্বদাই প্রস্তুত।

স্বল্প অবধির জীবনর জন্য ঈশ্বরে অবিশ্বাস করে পাপ অর্জন করা ভয়ানক মূর্খোমী। অর্থ রোজগারে যা হবার তাই হয়ে থাকে উপরন্তু যা পাপ করা হয় তা সঙ্গে যায়। পাপের অর্জিত অর্থ টিকে থাকে না, এক দিক দিয়ে আসে, অন্য দিক দিয়ে চলে যায়; অবশেষে যা থাকার তাই থাকে। অর্থের বৃদ্ধি হওয়া দেখে লোকে মনে মনে মুগ্ধ হয়। পাপকার্য্য দ্বারা অর্থ উপার্জন করার ধারণা-ই ভ্রমমূলক। এতে অর্থ উপার্জন তো হয় না, কিন্তু আত্মার পতন অবশ্যই হয়ে থাকে। লোক–পরলোক ভ্রষ্ট হয়। অন্যায়পথে রোজগার করে তাঁর মধ্যে থেকে যৎসামান্য দান করে যারা ধর্মাত্মা হতে চায় তাঁরা ভ্রান্ত ধারণা করে রেখেছেন। ঈশ্বরের দরবারে সকলের সত্যিকারের বিচার হয়, সেখান এই চাতুরী করে এড়িয়ে যাওয়া যাবে না।

অতএব পরমাত্মায় বিশ্বাস করে ব্যবসায়ে মিথ্যে, কপটতা প্রভৃতির সর্বথা পরিত্যাগ করা উচিত। কোনও বস্তুতে অন্য কোনও বস্তুর কখনও ভেজাল দেওয়া উচিত নয়। ওজন বাড়ানোর জন্য তুলো, পাট, শষ্য প্রভৃতিতে জল মেশানো বা ভিজে জায়গায় তা রাখা উচিত নয়। খাদ্য বস্তুতে ভেজাল দিয়ে জনগনের স্বাস্থ্য এবং ধর্ম কখনই নষ্ট করা উচিত নয়। ওজনে, মাপে বা সংখ্যায় কম দেওয়া বা বেশী নেওয়া উচিত নয়। নমুনা অনুযায়ী মালের খরিদ বিক্রি করা উচিত।

আড়তদারী নির্ধারিত করে তাঁর চাইত একটি পয়সাও বেশী নেওয়া ভয়ানক পাপ। এ থেকে নিজেকে বাঁচানো উচিত। ঠিক এই

ভাবে কমিশনের কাজেও বঞ্চনা করে কাজ গোছানো উচিত নয়। দালালদেরও উচিত যে ক্রেতা বিক্রেতার কাছে প্রকৃত অবস্থার বর্ণনা করে তাদের ভ্রমিত না করে নিজের অধিকারের এবং পারিশ্রমিকের ন্যায্য পাওয়া গ্রহণ করেন।

আমরা যার সঙ্গে ব্যবহার করে থাকি, তাঁর প্রতি আমাদের সেরূপ ব্যবহার-ই করা উচিত, যা আমরা নিজে অপরের কাছ থেকে আশা করি। আমরা যেমন নিজের হিত এবং স্বার্থের দিকে লক্ষ্য রাখি, ঠিক সেইরূপে অপরের হিত এবং স্বার্থের প্রতি লক্ষ্য রাখা উচিত। সেই শ্রেষ্ঠ যে নিজের স্বার্থের পরিত্যাগ করে অপরের হিতের জন্য চিন্তা ভাবনা-করে অপরের স্বার্থের বিনিময়ে নিজের স্বার্থের পরিত্যাগ করে। ব্যবসায়ী হলেও এরূপ পুরুষ-ই বাস্তবিক সাধু।

বর্ত্তমান সময়ে ফাট্‌কা খেলার প্রবৃত্তির অত্যধিক বৃদ্ধি হয়েছে। এই ফাট্‌কার ফলে অর্থ, জীবন এবং ধর্মের প্রতি যে কি পরিমাণে আঘাত করা হচ্ছে! দেশের মনস্বীদের এদিকে মনোযোগ দিয়ে অতি শীঘ্রই যাতে ইহা দমন করা যায় সেজন্য সর্বভাবে প্রয়ত্ন করা উচিত। পূর্বে এই ফাট্‌কার প্রচলন শুধু বোম্বাই শহরে ছিল এবং কোথাও কোথাও বর্ষার পুর্বাভাষ করে সওদা করা হতো, কিন্তু আজকাল এর প্রচলন তো প্রায় সর্বত্রই এবং ব্যবসার প্রায় সর্বক্ষেত্রে বিস্তার লাভ করেছে।

অনতিকাল পূর্বে ব্যবসায়ীবর্গ ফাট্‌কাকারীদের ঘৃণার চোখে দেখতেন এবং তাঁদের সঙ্গে ওঠাবসা করতে বা তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে দ্বিধা বোধ করতেন। কিন্তু বর্ত্তমানে এমন ব্যবসায়ী খুবই কম রয়েছেন যারা ফাট্‌কা করেন না। যে কাজে মালের প্রকৃত লেনদেন না হয়ে শুধুমাত্র বিভিন্ন সময়ে দরের কম বেশী দ্বারা লাভ লোকসানের লেনদেন হয়ে থাকে, উহাকে ফাট্‌কা বলে। তুলো, পাট, চট, তৈলবীজ, হুন্ডি শেয়ার এবং রূপো প্রভৃতি প্রায়ঃ সকল বস্তুরই ফাট্‌কা হয়ে থাকে। সাট্টাবাজ অর্থের রোজগারে সুখী হয় না এবং অর্থের ক্ষতিতেও সুখী হয় না, তার চিত্ত সর্বদাই অশান্ত থাকে। তাঁর খরচের খুবই বৃদ্ধি হয়, পরিশ্রমসাধ্য কাজ করতে সে হতোদ্যম হয়ে পড়ে। সে রাতোরাত

লক্ষপতি হবার স্বপ্ন দেখে। ছল, কপট প্রভৃতিকে ফাট্‌কার অভিন্ন অঙ্গ বলে বোঝা উচিত। দীঘকাল ধরে সঞ্চিত প্রতিস্ঠা সাট্টাবাজ মাত্র কয়েক ঘণ্টায় বিনষ্ট করে ফেলে। ফাট্‌কার ফলে বড় শহরে প্রতি বৎসরে কোন না কোন আত্মহত্যা কিংবা আত্মহত্যার প্রচেষ্টা ঘটে। আত্মহত্যা করার কথা তো অনেকের মনে বহুবার জাগে। ফাট্‌কাবাজের আত্ম সুখ পাওয়া তো দূরের কথা, তারা পরিবারের সুখ থেকেও বঞ্চিত হয়। কাহারও কাহারও চিত্ত ফাট্‌কার কাজে এত মগ্ন থাকে যে, খিদে, পিপাসা কিংবা ঘুমেরও খেয়াল থাকে না। তারা অসুখে ভোগে কিংবা উত্তেজনাবশে পথে পতিত হয়ে হূঁশ হারিয়ে ফেলে, ঘুমে তাঁরা প্রায়ই ফাট্‌কার স্বপ্ন দেখে। ধর্ম, দেশ, মাতা, পিতা প্রভৃতির সেবা করা তো দূরের কথা, তাঁরা নিজের সন্তান এবং স্ত্রীরও ভালভাবে দেখা শোনা করতে পারে না। ঘরে সন্তান অসুখে ছট্‌ফট্‌ করছে, পত্নি অসুখে ব্যাকুল এমন এবস্থাতেও ফাট্‌কাবাজ বিলেত থেকে আসা টেলিগ্রাম পাওয়ার জন্য ফাটকাস্থানে এদিকে ওদিক ঘুরছে। জনৈক ভদ্রলোক স্বচক্ষে দেখা এই ঘটনার কথা আমাকে বলেছিলেন। দুঃখের কথা যে, এরূপ ফাট্‌কার কাজকেও লোকে ব্যবসা বলে ডাকে; যেখানে ঘরের, সংসারের কিংবা শরীরেরও কোন হুঁস থাকে না। আমার মনে হয় যে যদি সামান্য সময়ের জন্যও এই একাগ্রতা ঈশ্বরের প্রতি হয় তাহলে পারমার্থিক পথে অকথনীয় উন্নতি হতে পারে। ফাট্‌কার এই প্রবৃত্তির ফলে পরিশ্রম যুক্ত রোজগার নষ্ট হয়ে যাচ্ছে, দক্ষতা হ্রাস পাচ্ছে। কাজেই এই পরিপ্রেক্ষিতিতে এর প্রসার রোধ হওয়া প্রয়োজন।

এই ফাট্‌কা ছাড়াও ঘোড়াদৌড় (রেস) দ্বারা জুয়া খেলা হয়, এবং এতে সমাজের ধনী মানী ব্যক্তিগণ উৎসাহের সঙ্গে বাজী লাগিয়ে থাকেন। প্রজাপতি মনু জীবসমূহ দ্বারা সংঘটিত জুয়াকে সবচেয়ে পাপময় জুয়া বলে অভিহিত করেছেন। কাজেই ফাট্‌কা, জুয়া সর্বতোভাবে পরিত্যাজ্য। যদি কেউ লোভের বশে কিংবা দোষযুক্ত মনে করেও আত্মার দূর্বলতার জন্য ফাট্‌কা সর্বথা পরিত্যাগ করতে না পারে, তারও কমপক্ষে ঘোড়াদৌড়ে বাজী লাগানো সর্বথা বন্ধ করে দেওয়া

উচিত এবং মাল ছাড়াই (ব্লেক সেল) যেন কখনও করা না হয় । এভাবে মালা যে বিক্রি করে তাঁর মাল কারও খরিদ করা উচিত নয়, কেননা এতে ভয়ানক ক্ষতি হয় । ফাট্‌কাবাজীর দ্বারা হওয়া ক্ষতি জেনেও যে ইহা ত্যাগ করে না, সে স্বয়ং নিজের হিংসাযুক্ত ক্ষতি তো করেই থাকে অপরেরও যথেষ্ট ক্ষতি করে । যারা মালের করনারিং করে মূল্য বৃদ্ধি ঘটায়, তাঁরা ভীষন পাপ করে । অতএব করনারিং কাজে কখনও অংশ গ্রহণ করতে নেই, এতে গরীবের সন্তাপ এবং তাদের অভিশাপের ভাগীদার হতে হয় ।

গালা, রেশম, চামড়ার মত কোন ব্যবসায়ে খুবই হিংসা হয় ।

গালা এক ধরনের কীট থেকে উৎপন্ন হয় । বৃক্ষ থেকে এক ধরণের লাল-লাল ছাল কাটা হয়, উহাতে দুই ধরনের জীব থাকে । তাঁর মধ্যে এক প্রকারের জীব খুব সুক্ষ্ম হয়, যা বর্ষার গরমে গালা থেকে বেরিয়ে দেওয়ালে উঠতে থাকে, তাতে দেওয়াল লাল হয়ে যায় । অপর শ্রেণীর জীব দেখতে একটু লম্বা হয় এবং এগুলিকে গালার বীজ বলে মানা হয়ে থাকে । এই সমস্ত জীবের ভীষণভাবে হিংসা করা হয়ে থাকে।

প্রথমত গালা পরিস্কার করার ফলেই অসংখ্য প্রাণী মারা পড়ে । এরপরে থলেতে ভরে প্রজ্বলিত অগ্নিকুণ্ডে উহা গালানো হয় । এই সমস্ত কীটের রক্ত মিশ্রণে গালা তৈরী হয় । যে সময়ে উহা গালানো হয়, তখন থলের ভীতর থেকে চটচট শব্দ হতে থাকে । চারিদিকে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে, জল দুষিত হয়, রোগের সংক্রামন দেখা দেয় । এই কাজ যারা করে তাদের মধ্যে অধিকাংশই বৈশ্য জাতির ।

এইরুপে রেশম তৈরীতেও খুবই হিংসা হয় । রেশমের কীট জড়িত রেশম ফুটন্ত জলে ফেলে দেওয়া হয় । বেচারী সেই সকল কিট্ ঝলষে যায়, পরে তাদের গায়ের উপরে জড়িত রেশম আলাদা করে নেওয়া হয় ।

চামড়ার জন্য ভারতবর্ষে কত গো হত্যা করা হয়ে থাকে, তা বলার নেই । অতএব গালা, রেশম এবং চামড়ার ব্যবসা এবং তাঁর ব্যবহার করা থেকে প্রতিটি ধর্মপ্রেমী সুধীগণকে বিরত থাকা উচিত ।

কেউ কেউ শুধুমাত্র সুদের কারবার করেন । যদিও সুদের কারবার নিষিদ্ধ নয়, তবুও ব্যবসার সঙ্গে সংলগ্ন থেকে সুদের উপার্জন শ্রেষ্ঠ । যারা সুদের সাথে সাথে ব্যবসাও করেন তারা অকর্মণ্য হন না, আলস্যযুক্ত এবং অতিশয় কৃপনও হন না । তাঁর ব্যবসায়ে কুশলতা বাড়ে । ছেলেরাও কাজ কর্ম শিখে থাকে, কর্মঠতা বৃদ্ধি পায় । অতএব শুধুমাত্র সুদের পেশা করা উচিত নয়, কিন্তু যদি কেউ এরূপ করতে না পারে তাহলে কমপক্ষে লোভে বশীভূত হয়ে গরীব দুঃখীদের সর্বস্য অপহরণ করা যেন অবশ্যই ত্যাগ করে । সুদের কারবারীরা গরীবদের উপর খুব অত্যাচার করে থাকে । কম অর্থ দিয়ে অধিক অর্থের অঙ্গীকার পত্রে সই করিয়ে নিয়ে থাকে । অতি সামান্য কারণেই তাদের বিরক্ত করেন । যারা সুদের বিনিময়ে টাকা নিয়ে থাকেন, সুদ দিতে দিতে তাদের রোজগার করা অর্থ নিঃশেষ হয়ে যায় । শুধু রোজগারের টাকাই নয়, স্ত্রীর গহনাগাঠি, পশু, অর্থ, জমি, ঘর-বাড়ী সবই সুদ দিতে দিতে শেষ হয়ে যায় । সুদের কারবারীর নির্দয়ভাবে জমি ঘর বাড়ীর নীলাম করে স্ত্রী-পুত্রদের পথের অনাসৃত ভীখিরী বানিয়ে ছাড়ে । লোভের জন্যই এই সমস্ত পাপ হয় । অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুদের কারবারীদের অত্যধিক লোভের জন্যই পাপের এরূপ অধিক বৃদ্ধি হয়ে থাকে । অতএব সুদের কারবারীদের কমপক্ষে লোভের বশীভূত হয়ে এরূপ অন্যায় করা উচিত নয় ।

যথাসাধ্য বিদেশী বস্ত্র এবং অন্যান্য বিদেশী ব্যবসা পরিত্যাগ করা উচিত ।

প্রথম এবং সর্বশেষে কথা এই যে, মিথ্যে কপট, ছলনার পরিত্যাগ করে, অন্যের কোন ভাবে ক্ষতি না করে ন্যায় এবং সততার সঙ্গে ব্যবসা করা উচিত । ব্যবসার শুদ্ধির সম্বন্ধে সংক্ষেপে এটা বলা হল । কমপক্ষে এটুকু অবশ্যই করা উচিত । কিন্তু যদি বর্ণধর্মের পালন করে নিস্কামভাব রেখে ব্যবসার দ্বারা পরমাত্মার পূজন করা যায়, তাহলে এর দ্বারা পরমপদেরও প্রাপ্তি হতে পারে ।

❖❖❖❖❖❖❖

॥ শ্রী হরিঃ ॥

ব্যবসায় দ্বারা মুক্তি

অসত্য, কপট এবং লোভ প্রভৃতির পরিত্যাগ করে যদি ভগবানের প্রীতির হেতু ন্যায়যুক্ত ব্যবসায় করা যায় তাহলে ইহাও মুক্তির মুখ্য হেতু হতে পারে। মুক্তির প্রধান হেতু হল ভাব, ক্রিয়া নয়। শাস্ত্রবিধি অনুসারে সকাম ভাব রেখে যজ্ঞ, দান, তপ প্রভৃতি উত্তম কর্ম যে করে সে মুক্ত হয় না, সকাম বুদ্ধি রাখার ফলে হয় সে যে জন্য সৎকার্য্য করা হয় তাতে সফল হয় অথবা এক নির্দিষ্ট সময়ের জন্য স্বর্গ প্রাপ্ত হয়; কিন্তু নিস্কাম ভাবযুক্ত সাধারণ কর্মও মুক্তির হেতু হতে পারে। সেইজন্য সকাম কর্মকে স্বল্প এবং তুচ্ছ বলা হয়েছে। একেবারেই কিছু না করার তুলনায় সকাম ভাব রেখে যজ্ঞ প্রভৃতি কর্ম করা অতি উত্তম, এই ধরনের লোকদের উৎসাহিত করা উচিত, কিন্তু যে পর্যন্ত সকাম ভাব রয়েছে, যে পর্যন্ত সেই কর্ম স্ত্রী, অর্থ, মান বড়াই কিংবা স্বর্গের অতিরিক্ত পরমপদ লাভ করাতে সমর্থ হয় না। এছাড়া গীতায় ভগবান সকাম কর্মকে নিস্কাম কর্মের অপেক্ষা নীচু বলেছেন (দেখুন গীতা অঃ ২।৪২, ৪৩, ৪৪, অধ্যায় ৭।২০, ২১, ২২, অধ্যায় ৯।২০, ২১)। অপর পক্ষে ভগবান নিস্কাম কর্মের প্রশংসা করে বলেছেন যে --

নেহাভিক্রমনাশোহস্তি প্রত্যবায়ো ন বিদ্যতে ।
স্বল্পমপ্যস্য ধর্মস্য ত্রায়তে মহতো ভয়াৎ ॥

(গীতা ২। ৪০)

"এই নিস্কাম কর্মযোগের আরম্ভের অর্থাৎ বীজের বিনাশ নেই এবং বিপরীত ফলরূপ দোষও হয় না, এইজন্য এই নিস্কাম কর্মযোগরূপ ধর্মের অতি অল্প সাধনও জন্মমৃত্যুরূপ ভয়ানক ভয় থেকে উদ্ধার করে।

অতএব মুক্তিলাভে ইচ্ছুক সকলকেই এই নিস্কাম কর্মের আচরণ করা উচিত। মুক্তির জন্য জ্ঞানের আবশ্যকতা রয়েছে, কোন বাহ্যিক

উপকরণের প্রয়োজন নেই, সেইজন্য সাধনসম্পন্ন হলে সকলেই মুক্তি প্রাপ্ত করার অধিকারী।

ব্যবসায়ীবর্গের ব্যবসায় পরিত্যাগ করার আবশ্যকতা নেই। তাঁরা চাইলে ব্যবসাকেও মুক্তি সাধনায় পরিণত করতে পারেন। বর্ণ ধর্মের বর্ণনার করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন

যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্ ।
স্বকর্মণা তমভ্যর্চ্য সিদ্ধিং বিন্দতি মানবঃ ।।

(গীতা ১৮।৪৬)

"যে পরমাত্মা হইতে সকল ভূতের উৎপত্তি হয়েছে এবং যারা দ্বারা এই সর্বজগৎ (যেমন জল দ্বারা বরফ) ব্যাপ্ত রয়েছে, সেই পরমেশ্বরকে স্বীয় স্বাভাবিক কর্মদ্বারা পূজা করে মনুষ্য পরম সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।"

এই মন্ত্র অনুসারে বৈশ্যগণ নিজের বর্ণোচিত কর্ম ব্যবসায় দ্বারা ভগবানের পূজা করে পরম সিদ্ধি পেতে পারেন। এই ভাবনায় যুক্ত হয়ে ব্যবসায় করে সরল এবং সহজভাবে সাংসারিক সকল কর্ম ভালভাবে করতে থেকেও মনুষ্য জীবনের অন্তিম লক্ষ্যে উপনীত হতে পারেন। লোভ অথবা অর্থের ইচ্ছা না রেখে, কর্ত্তব্যবুদ্ধি দ্বারা ব্যবসায় করা উচিত। কর্ত্তব্যবুদ্ধি রেখে করা কর্মে পাপ টিকে থাকতে পারে না। পাপের কারণ হল লোভ এবং আসক্তি। কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে এর স্থান নেই। কর্ত্তব্যবুদ্ধিযুক্ত ব্যবসা দ্বারা অন্তঃকরণের শুদ্ধি এবং ঈশ্বরের প্রসন্নতা প্রাপ্ত হয়। শুদ্ধ অন্তঃকরণে তত্ত্বজ্ঞানের স্ফুরণা হয়ে থাকে এবং এর ফলে ভগবদ্‌কৃপা হলে সুলভতায় পরমপদের প্রপ্তি হয়। পরমপদ প্রাপ্তির ইচ্ছা না রেখে শুধু ঈশ্বরের প্রীতির জন্য যে ব্যবসায় করে সে আরও উত্তম এবং প্রশংসনীয়।

গীতার উপর্যুক্ত মন্ত্র অনুযায়ী যখন এই বিবেক জাগ্রত হয় যে সমগ্র সংসার-ঈশ্বর দ্বারা উৎপন্ন এবং সেই ঈশ্বরই সমগ্র সংসারে স্থিত হয়েছেন, তাহলে তাঁকে কখনও ভোলা যেতে পারে না। পরমাত্মার এই চেতন এবং বিজ্ঞান স্বরুপের নিত্য জাগৃতি থাকার জন্য মায়া অথবা

অন্ধকারের কার্য্যরূপ কাম, ক্রোধ, লোভ মোহ প্রভৃতি নিকটে ঘেঁষতে পারে না। আলোয় অন্ধকার কি করে টিকে থাকতে পারে ? ব্যবসায়ে অসত্য, ছল, কপট প্রভৃতি করার পিছনে কাম, লোভ প্রভৃতি দোষযুক্ত কারণ থাকে। যখন কাম, লোভ প্রভৃতির অভাব হয়ে যায় তখন ব্যবসা স্বতঃই পবিত্র হয়ে যায়। এবারে বিচার্য্য প্রশ্ন হল যে, সেই ব্যবসায় দ্বারা ঈশ্বরের পূজা কিভাবে করা যায় ? পূজার জন্য শুদ্ধ বস্তুর প্রয়োজন। পাপরহিত ব্যবসায় শুদ্ধ তো হলো, কিন্তু এদ্বারা পূজো হবে কি ভাবে ? পূজা হল ইহাই যে **লোভের জায়গায় ঈশ্বর প্রেমের ভাবনা করে নেওয়া**। পতিব্রতা রমনীর ন্যায় সমস্ত সংসারের কার্য্য ঈশ্বর – প্রীতর্থ, ঈশ্বরের আজ্ঞা অনুযায়ী হওয়া চাই। এরূপ ব্যবসায় কার্য্যে কোনও দোষ টিকে থাকতে পারে না এবং যদি কোথাও কোন কার্য্যে অজ্ঞানবশতঃ ভুলে কোন দোষ ঘটে যায়, তাহলে তাঁকে দোষ বলা যায় না। কেননা, ওতে সকাম ভাব নেই। যদি কোন লোক স্বার্থ, মান বড়াইয়ের সবর্থা ত্যাগ করে লোকসেবার কার্য্যে লেগে পড়ে এবং যদি কখনও দৈবক্রমে কোন ভূল হয়ে যায়, তবুও লোকে তাকে দোষারোপন করে না এবং তাকে দোষ স্পর্শ করে না। এই হল স্বার্থ ত্যাগের – নিস্কাম ভাবের মহত্ব। যদি কেউ বলে যে স্বার্থ ছাড়া ব্যবসায়ে প্রবৃত্তিই বা কেন হবে, যখন কোন স্বার্থই নেই তাহলে কেউ ব্যবসায় কেন করবে ? এর উত্তরে বলা হচ্ছে যে, স্বার্থের দৃষ্টিকোন দিয়ে দেখলেও এতে খুব বড় স্বার্থ নিহিত রয়েছে। অন্তঃকরণের শুদ্ধি হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হওয়া এবং এর ফলে পরমাত্মাকে লাভ করা কি কম বড় স্বার্থ ? এটাই পরম স্বার্থ। কিন্তু স্বার্থের এই বুদ্ধিও যে পরিমাণে ত্যাগ করা যায়, ততই শীঘ্র সিদ্ধি হয়। যেহেতু স্বার্থবুদ্ধি ছাড়া লোকে প্রবৃত্ত হতে চায় না, সেইজন্য এখানে এই স্বার্থের কথা বলা হয়েছে, আসলে স্বার্থ রেখে কোনও কাজে প্রবৃত্ত হওয়া খুব উত্তম জিনিষ নয়। যদি এখানে এই প্রশ্ন করা হয় যে লোভ বুদ্ধি না রেখে কারবার করলে তো এতে লোকসানই হবে, লাভ হওয়া কখনও সম্ভব নয়। যদি এরূপ হয় তাহলে এই কাজ শুধু ধনী ব্যক্তিরাই করতে পারেন সর্বসাধারনের

পক্ষে এই উপায় যুক্তিযুক্ত নয়। কিন্তু এটা ঠিক নয়। এক জন বিশ্বস্ত, সৎ কর্মচারী মালিকের আজ্ঞানুসারে মালিকের জন্য কুশলতার সঙ্গে আলস্য এবং প্রমাদ পরিত্যাগ করে দোকানের কাজ করে থাকে, নিজের উন্নতি ভিন্ন দোকানের কোন কাজে তাঁর অন্য কোন স্বার্থ নেই। তার অন্য কোন প্রকারের কোনও স্বার্থ বুদ্ধি নেই। এরূপ কার্য্য দ্বারা উন্নতিতে কোথাও কোন অন্তরায়ের সৃষ্টি হয় না। তদনুরূপ ভাবে ভক্ত নিজ প্রভূর প্রীতিরূপ স্বার্থের আশ্রয় রেখে সব কিছু ঈশ্বরের মনে করে তাঁর আজ্ঞানুসারে সমস্ত কার্য্য করে তাহলে তাঁর উন্নতিতে কোন বাঁধা আসতে পারে না। অর্থের রোজগার সম্বন্ধে বলা যায় যে ধনীব্যক্তি নিঃস্বার্থ বুদ্ধি রেখে কাজ করতে পারে এবং গরীব তা পারে না এটা মেনে নেওয়া ভ্রান্তিমূলক। পক্ষান্তরে প্রায়ই এর বিপরীত দৃষ্টান্ত দেখা যায়। আসলে অর্থ নিঃস্বার্থভাবে অন্তরায়ের সৃষ্টি করে। যে স্বার্থবুদ্ধি থেকে সর্বথা মুক্ত রয়েছে তাঁর কথা আলাদা, আসলে প্রায়ই অর্থ থেকে অহংকার, মমতা, লোভ, প্রমাদ উৎপন্ন হয়েই থাকে। ন্যায়যুক্ত নিস্বার্থ ব্যবসার জন্য অধিক মূলধনেরও প্রয়োজন নেই। বাস্তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন অল্প বা অধিক মূলধনের নয় সমস্তই নির্ভর করে কর্ত্তার বুদ্ধির উপরে! নিঃস্বার্থবুদ্ধি না থাকায় একজন ধনীব্যক্তি গরীবদের সেবা করতে পারে না, কিন্তু একজন কেবল, তেল বা ভাজা বিক্রয়কারী গরীব দোকানদার নিঃস্বার্থবুদ্ধি রাখার ফলে সংসারের সেবা করতে সমর্থ হয়। বড় ব্যবসায়ী পাপবুদ্ধির ফলে নরকে যেতে পারে, কিন্তু পান সুপারী বিক্রেতা, নিঃস্বার্থ ভক্ত, জনতারূপী পরমাত্মার সেবা করে পরমপদ প্রাপ্ত করতে পারে।

দোকানদারকে এরূপ বুদ্ধিযুক্ত হওয়া উচিত যে তাঁর দোকানে যে গ্রাহক আসে সে সাক্ষাৎ পরমত্মারই স্বরূপ। লোভী দোকানদার যেমন মিথ্যে, কপটতা বশে মেকী আদর সৎকার কিংবা ভালবাসা দেখিয়ে বিভিন্নভাবে গ্রাহককে ঠকাতে চায়, ঠিক তেমনই সেই দোকানদারের উচিত সে যেন সত্য সরল বাক্য দ্বারা প্রেমপূর্ণভাবে গ্রাহককে সকল কথা যথার্থভাবে বুঝিয়ে তাঁর যাতে হিত হয়, তাই করে, লোভীব্যক্তির

দোকানে যেমন গ্রাহক বারে বারে আসে না, কেননা আগত সেই গ্রাহককে ঠকানোই সে নিজের কর্তব্য বলে মনে করে, এবং এই ধরনের দোকানদারকেই আজকাল চতুর এবং উপার্জনকারী বলে মানা হয়ে থাকে, এইরূপেই পরমাত্মা রূপী গ্রাহক বারে বারে আসেন না, এরূপ মনে করে আমার দ্বারা তাঁর যৎকিঞ্চিৎ যা সেবা করা সম্ভব তা নগণ্য, তাঁর সঙ্গে পুরোপুরী ভাবে তাঁর হিতের উপরে লক্ষ্য রেখে পূর্ণ সততার ব্যবহার করা উচিত।

সমস্ত সম্পত্তি পরমাত্মার, আমরা সকলেই তাঁর প্রজা, যোগ্যতা অনুসারে পরমাত্মা সকলকে অর্থ সম্পত্তির দায়িত্ব দিয়ে উহার সংরক্ষণ এবং যথাযথভাবে ব্যবহার করার জন্য আদশ দিয়েছেন।

অতএব কোন কাজই ছোট বা বড় নয়। যার কাছে বেশী অর্থ এবং বেশী কাজের দায়িত্ব রয়েছে, সে বড় এবং যার দায়িত্বে লঘু কাজ রয়েছে সে ছোট, তা নয়। ছোট বড় সকলকেই একদিন সমস্তই অন্যর জন্য ছেড়ে দিয়ে মালিকের ঘরে যেতে হবে। মালিকের কাজ যে বিশ্বস্তভাবে সম্পাদন করে গমন করে সে সুখপূর্বক গিয়ে থাকে, এবং তাঁর উন্নতি হয়, যদি মালিকের মনে ধরে তাহলে মালিকের সমকক্ষ অংশিদারও হতে পারে এবং যে বেইমানী করে মালিকের বস্তুকে নিজের মনে করে কর্তব্য ভূলে ছল কপট করে গমন করে সে দন্ড এবং অবনতির পাত্র হয়ে থাকে।

পিতার একাধিক পুত্র বয়েছে, দোকানে সকলে সমান অংশীদার কিন্তু প্রত্যেকের দায়িত্বে আলাদা আলাদা কাজ রয়েছে কেউ তদারকীর দায়িত্বে রয়েছে, কেউ দোকানদারী, কেউ রোকড়ের কাজ, কেউ বাড়ীর কাজকর্ম, আবার কেউ টাকা পয়সা আদায়ের কাজ করছে, সকলেই একই ফার্মের উন্নতির কাজে নিযুক্ত রয়েছেন। পিতা বিভিন্ন কাজ বিভিন্ন জনের দায়িত্বে সঁপে দিয়েছেন, তাঁরা সেই অনুযায়ী কাজ করছেন। অংশীদার হিসাবে এরা কেউ ছোট বা বড় নয়, কিন্তু নিজ নিজ দায়িত্বের আলাদা আলাদা কাজ না করে যদি সকলেই তদারকী বা দোকানদারীর কাজ করতে চায় তাহলে কাজে অব্যবস্থা দেখা দিবে।

এইরূপে পরমপিতা পরমাত্মার সকল সন্তান ভিন্ন ভিন্ন কার্য্য করে থাকে, যে তাঁর সেবক হয়ে নিঃস্বার্থ ভাবে তাঁর আদেশানুসারে কার্য্য করে থাকে সেই তাঁর অত্যধিক প্রিয়।

নাট্যশালার মালিক যদি নাটকে একজন সামান্য চাপরাশীর হয়ে অভিনয় করে তাহলে কি সে ছোট হয়ে যাবে ? যে কাজ যার দায়িত্বে রয়েছে তাঁর সেই কাজই করা উচিত। যার কাজ সুন্দর এবং স্বার্থরহিত হবে প্রভু তাঁর উপরেই প্রসন্ন হবেন।

অভিনয়ে যদি নাট্যশালার মালিক একজন সাধারণ আর্দালির অভিনয় করে তাহলে কি সে ছোট হয়ে যাবে ? যার দায়িত্বে যে কাজ রয়েছে তাঁর সেই কাজ করা উচিত। যার কাজ সুন্দর এবং স্বার্থরহিত, তাঁর উপরে প্রভূ প্রসন্ন হন।

অতএব প্রাণীমাত্রকে পরমাত্মার স্বরূপ এবং পূজনীয় মনে করে মিথ্যে, কপট এবং ছল পরিত্যাগ করে স্বার্থবুদ্ধি রহিত হয়ে নিজ নিজ কার্য্যদ্বারা সর্বব্যাপী পরমাত্মার পূজা করা উচিত। সর্বদা এরূপ মনোভাব রাখা উচিত যে কিভাবে আমি আমার সম্মুখে প্রত্যক্ষ্যভাবে অবস্থানকারী পরমাত্মার অধিক সেবা করতে পারি। এরূপ ভাবনা রাখলে ব্যবসায় আপনা আপনি সুধরাতে পারে। একজন ব্যবসায়ী দোকানদার তাঁর দোকানে বসে যে কোনও ধরনের ব্যবসায় করতে থেকেও সরলভাবে পরমাত্মার সেবা করে তাঁকে প্রসন্ন করতে পারে। ব্যবসায়ী, দালাল, উকিল, ডাক্তার জমিদার, কৃষক প্রভৃতি সকলেই নিজ নিজ আজীবিকার পেশায় নিযুক্ত থেকেও এরূপ বুদ্ধিদ্বারা পরমাত্মার সেবা করতে পারেন।

সবই উদ্দেশ্যের উপর নির্ভর করে থাকে। মালিকের মূলধন বজায় থাকে এবং সম্পর্কে আসা সকল মহাজনগণের সর্ব প্রকার যাতে সেবা সম্পন্ন হতে পারে, এই ভাবনায় যুক্ত হয়ে সকলের সঙ্গে ব্যবহার করা উচিত। নিজ নিজ কর্মদ্বারা গ্রাহকগণের সঙ্গে সরল ভাবে নিস্বার্থবুদ্ধি যুক্ত হয়ে সুখ প্রদান করাই হল স্বকর্মের দ্বারা পরমাত্মার পূজা করা এবং এই পূজারূপ ভক্তিদ্বারা পরমাত্মার প্রাপ্তি হতে পারে,

এতে কোন সন্দেহ নেই। এই ভাব জাগ্রত রাখার জন্য ভগবানের নাম-জপ করার আবশ্যকতা রয়েছে। যেমন বেউবিল ধ্বনির দ্বারা পুলিশ সাবধান হয়, তদনুরূপ নাম জপের বিউবিল বাজিয়ে মন-ইন্দ্রিয়সমূহকে সদা সাবধান রাখা উচিত এবং বুদ্ধি দ্বারা শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৪৬ নং মন্ত্রের বারেবারে মনন এবং বিচার করে নিজেকে তদনুরূপ করে গড়ে তোলার চেষ্টা করা উচিত। এরূপ হতে পারলে অনায়াসেই ব্যবসায় দ্বারা মুক্তি হওয়া সম্ভব।
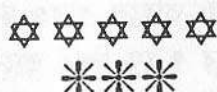
॥ শ্রীহরিঃ ॥

মানুষ কর্ম করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র

কেউ বলে থাকেন যে "সংসারে কর্মই প্রধান, যে যেরূপ কর্ম করে সে তেমনই ফল পেয়ে থাকে', অন্য পক্ষ বলেন যে "ঈশ্বরই সকলকে বানরের ন্যায় নাচিয়ে থাকেন"। এই দুইটি মতে পরস্পরের মধ্যে বিরোধ প্রতীত হয় । যদি কর্ম-ই প্রধান হয় এবং মনুষ্য কর্ম করার ক্ষেত্রে সর্বথা স্বতন্ত্র হয় তাহলে ঈশ্বর দ্বারা জীবসমূহকে বাজীকরের ন্যায় নাচানো সিদ্ধ হয় না এবং তাতে ঈশ্বরের কোন মহত্ব থাকে না । পক্ষান্তরে যদি ঈশ্বরই সমস্ত কিছু করিয়ে থাকেন, মনুষ্য কর্ম করার ক্ষেত্রে সর্বথা পরতন্ত্র, তাহলে কারও দ্বারা ঘটিত খারাপ কর্মের ফল, সে কেন ভোগ করবে ? যে ঈশ্বর তাকে দিয়ে কর্ম করিয়েছেন, ফল ভোগ করার জন্য তারই দায়ী হওয়া উচিত, কিন্তু এরূপ দেখা যায় না । এই ধরণের প্রশ্ন প্রায়ই করা হয়ে থাকে অতএব এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে ।

আমার মনে হয় জীব বাস্তবিক পক্ষে পরমেশ্বর এবং প্রকৃতির অধীণ । নুণ্যতম পক্ষে ফলে ভোগবার ক্ষেত্রে সে সর্বথা পরতন্ত্র । অর্থ, স্ত্রী, পুত্র, কীর্ত্তি প্রভৃতির সংযোগ বিয়োগ কর্মফলবশে হতে বাধ্য এতে কোনও সন্দেহ নেই । নবীন কর্ম করার ক্ষেত্রে যদিও সে পরতন্ত্র, কিন্তু কিছু অংশে স্বতন্ত্র রয়েছে, কিংবা এরূপে বলা যেতে পারে যে স্বেচ্ছায় সুযোগ পেয়ে সে অনধিকার স্বতন্ত্র আচরণ করতে আরম্ভ করে দেয়, সেইজন্য তাকে দন্ড ভোগও করতে হয় ।

বাঁদর বাজীকরের অধীন, তাঁর গলায় দঁড়ি পরানো রয়েছে মালিকের ইচ্ছা অনুযায়ী নৃত্য করাই হল তার কর্ত্তব্য । যদি সে মালিকের ইচ্ছার বিপরীত কিঞ্চিৎমাত্রও আচরণ না করে তাহলে মালিক প্রসন্ন হয়ে তাকে ভাল খাবার দেয় এবং স্নেহ করে থাকে । যদি কখনও সে মালিকের ইচ্ছানুসারে আচরণ না করে, প্রতিকূল আচরণ করে,

তাহলে মালিক তাকে প্রহার করে দন্ড দিয়ে থাকে। এই দন্ড দেওয়ার পিছনেও তার এই উদ্দেশ্য থাকে যে, সে যেন তাঁর অনুকূল হয়ে যায়। বাজীকর বাঁদরকে মারার সময়েও চায় না যে, বাঁদরের ক্ষতি হোক, কেননা এই অবস্থাতেও সে তাকে খেতে দেয়, তার পালন–পোষণ করে।

সন্তানের প্রতিও মাতা-পিতার এই ধরণের ব্যবহার করা হয়ে থাকে, কিন্তু বাজীকরের তুলনায় মাতা-পিতার ব্যবহার উচ্চ শ্রেণীর হয়ে থাকে। ভুল হলে বাজীকর যে দন্ড দিয়ে থাকে, তার পালন পোষণ করে এটা সে শুধু স্বার্থের জন্য করে থাকে। মাতা-পিতা নিজের স্বার্থ ছাড়াও সন্তানের হিতের দিকটি দেখে থাকে কেননা সে তাদের অংশজাত। কিন্তু পরমাত্মার স্থান তো এই দুই থেকে অনেক উঁচুতে, কেননা তিনি অহৈতুক প্রেমী এবং সর্বথা স্বার্থশূণ্য। তিনি যে বিধান করে থাকেন, তা শুধু আমাদের হিতের জন্যই করেন। বাস্তবিক পক্ষে আমরা সর্বথা তাঁর অধীন তথাপি তিনি দয়া করে আমাদের ইচ্ছানুযায়ী সৎকর্ম করার অধিকার দিয়ে রেখেছেন। তাঁর আজ্ঞানুসারে কর্ম করাই হল আমাদের সেই অধিকার। যদি আমরা সেই অধিকার ব্যতিক্রম করি তাহলে সেই পরম-পিতা অত্যন্ত স্নেহযুক্ত হয়ে আমাদের দোষ দূর করার জন্য আমাদের কুমার্গ থেকে সরিয়ে সুমার্গে নিয়ে আসার জন্য শাস্তি দিয়ে থাকেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে তাঁর দেওয়া দন্ড অতি ভয়ানক প্রতীত হলেও তা দয়া এবং প্রেমে পরিপূর্ণ থাকে।

এখানে এই প্রশ্ন হতে পারে যে সর্বশক্তিমান সর্বজ্ঞ ঈশ্বর মনুষ্যকে নিজের অধিকারের অতিক্রম কেন করতে দেন ? তিনি তো সর্বসমর্থ, পলকে অঘটন ঘটাতে পারেন, তাহলে তিনি মনুষ্যকে তাঁর অধিকারের বাহিরে দুষ্কর্মে প্রবৃত্ত হতে দেন কেন ?

এর উত্তর নীচের এই দৃষ্টান্ত দ্বারা বোঝানো হচ্ছে।

সরকার কোনও এক ব্যক্তিকে আত্মরক্ষার্থে বন্দুক রাখার লাইসেন্স প্রদান করেছেন, বন্দুক তাঁর অধিকারে রয়েছে, এবং খুসীমত সে বন্দুকের যথেচ্ছ প্রয়োগ করতে পারে। কিন্তু আইন অনুযায়ী নির্ধারিত

মর্য্যাদার মধ্যেই তা প্রয়োগ করার অধিকার রয়েছে, চুরী, ডাকাতি, খুন কিংবা এমন এরূপ কোন বেআইনী কাজ করার জন্য সে বন্দুক ব্যবহার করতে পারে না । যদি সে তা করে তবে তাঁর সেই কাজটি অন্যায় এবং নিয়ম বিরুদ্ধ হয়ে থাকে এবং পরিণামে তার লাইসেন্স বাজেয়াপ্ত হয় এবং সে শাস্তি পাবার অধিকারী হয়ে থাকে । কিংবা ধরুন যে, কোন এক রাজ্যে কোনও এক ব্যক্তিকে সরকার থেকে অধিকার দেওয়া হয়েছে এবং সেই অধিকার অনুযায়ী তাঁর কাজ হল নির্দিষ্ট সরকারী নিয়ম অনুযায়ী প্রজার সেবা সুসম্পন্ন করা । যদি সে নিয়ম অনুযায়ী যথাযথভাবে কাজ করে তবে সরকার প্রসন্ন হয়ে তাঁকে পুরস্কৃত করতে পারেন, তাঁর পদোন্নতি হতে পারে, এবং এভাবে ক্রমে ক্রমে এগিয়ে সে রাজ্যের পূর্ণ অধিকারীও হতে পরে । কিন্তু যদি সে তার অধিকারের অপপ্রয়োগ করে, আইনের বিরুদ্ধে কাজ করতে থাকে তাহলে তাঁর অধিকার কেড়ে নেওয়া হয় এবং সে শাস্তি পায় । তা সত্ত্বেও বন্দুক অথবা নিজের অধিকারের অপপ্রয়োগ করার সময় রাজা বা সরকার তাতে বাধা দেয় না । কার্য্য করার পরেই সে উপযুক্ত দন্ডের ভাগী হয়ে থাকে । এরূপে পরমাত্মাও আমাদের সৎকর্ম করার জন্য অধিকার দিয়ে রেখেছেন, কিন্ত আমরা যখন দুস্কর্ম করি তিনি তাতে বাধা দেন না, কর্ম করার পরই এর জন্য উপযুক্ত দন্ড দেওয়া হয়ে থাকে ।

এখানে পুণরায় এ প্রশ্ন উঠতে পারে যে, এই জগতের সরকার কিংবা রাজা তো সর্বজ্ঞ বা সর্বব্যাপী না হওয়ায় যারা আইন ভেঙ্গে অধিকারের অপপ্রয়োগ করে তাদের হাত ধরে বারণ করতে পারে না, কিন্তু পরমাত্মা তো সর্বজ্ঞ, ন্যায়কারী, সর্বান্তর্যামী, সর্বব্যাপী এবং সর্বশক্তিমান, মন, বাণী বা শরীরের কোন ক্রিয়া তার অগোচরে থাকে না, তিনি দুস্কর্মকারীর হাত ধরে জোর করে তাকে কেন নিরস্ত করেন না ? এর উত্তর এই যে, পরমাত্মার এভাবে হাত ধরে জোর করে নিরস্ত করার বিধান নেই, তিনি মনুষ্যকে তার জীবনে কর্ম করার জন্য স্বাধীনতা প্রদান করে রেখেছেন । কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে দয়া করে ভাল-মন্দ যাচাই করে দেখার মত বুদ্ধি বা বিবেকও প্রদান করেছেন, যাতে সে

ভাল- মন্দের বিচার করে নিজের কর্ত্তব্য স্থির করতে পারে এবং এটাও ঘোষণা করে রেখেছেন যে যদি কেউ অনধিকার–শাস্ত্র বিপরীত চেষ্টা করবে তাহলে সে অবশ্যই শাস্তি পাবে। কাজেই এটা প্রমাণীত হল যে, বাজীকরের বাঁদরের ন্যায় ঈশ্বরই সকলকে নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন, সকলেই তাঁর অধীন, কিন্তু যেমন বাঁদর ভূল করলে শাস্তি পায়, সেইরূপ যারা ঈশ্বরের আদেশ পালন করে না তারাও শাস্তি পেয়ে থাকে। অবশ্যই ঈশ্বর নিয়ন্ত্রিত করে থাকেন, কিন্তু তা সত্ত্বেও যেমন নৃত্য করার ক্ষেত্রে বাজীকরের ইচ্ছানুসারে নৃত্য করা বা না করায় বাঁদরের অধিকারে রয়েছে, এ ক্ষেত্রেও তাই। সরকার বা রাজা অধিকার প্রদান করেছেন কিন্তু তিনি এই অধিকারের অপপ্রয়োগ করার অনুমতি প্রদান করেন নি। ভগবানও মনুষ্য জীবন প্রদান করে সৎকর্মের দ্বারা ক্রমশঃ উন্নত হয়ে পরমপদ লাভ করার অধিকার আমাদের প্রদান করেছেন, কিন্তু পাপ করার জন্য তিনি আমাদের অনুমতি দেন নি। যখন একজন ন্যায় পরায়ণ সাধারণ রাজাও নিজের কোন অফিসারকে অধিকারের দুরুপযোগ করে পাপকার্য্য করার জন্য অনুমতি প্রদান করেন না, তাহলে ভগবান তো এরূপ আদেশ-ই কিভাবে দিতে পারেন ?

অতএব এই কথাটিও ঠিক যে মনুষ্য সর্বথা ঈশ্বরের অধীন, সঙ্গে সঙ্গে এটিও সত্য যে সে ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকারের সদুপযোগ করে পরম উন্নতি এবং তাঁর দুরুপযোগ করে অত্যন্ত অধোগতিও প্রাপ্ত হতে পারে।

এখন এই প্রশ্ন হতে পারে যে, "ভগবানের আদেশ না থাকলেও এবং পরিণামে দুঃখের সম্ভাবনা হলেও মনুষ্য ভগবদ্-ইচ্ছার বিরুদ্ধে পাপাচারণ করে কেন ? সে জেনে শুনে কিসের জন্য পাপকার্য্যে প্রবৃত্ত হয় ? এই প্রশ্নে বিচার করলে ইহাই প্রতীত হয় যে, পাপে প্রবৃত্ত হওয়ার কারণ হল অজ্ঞান। অজ্ঞানের দ্বারা আবৃত্ত হয়ে সকল জীব মোহগ্রস্ত হচ্ছে, **"অজ্ঞানেনাবৃতং জ্ঞানং তেন মুহ্যন্তি জন্তবঃ"**। (গীতা ৫/১৫)।

প্রকৃতির স্বরূপ দুইটি বিদ্যাত্মক এবং অবিদ্যাত্মক। এই দুইটির মধ্যে অবিদ্যাত্মক প্রকৃতির স্বরূপ হল অজ্ঞান। এই অজ্ঞান থেকে উৎপন্ন

অহংকার, আসক্তি প্রভৃতি দোষের বশীভূত হয়ে মনুষ্য পাপ-কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়। সংসারে অবিদ্যা প্রভৃতি পাঁচটি ক্লেশ মহর্ষি পাতঞ্জলিও স্বীকার করেছেন –

অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ ক্লেশাঃ । (যোঃ সাঃ ৩)

"অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ, দ্বেষ এবং অভিনিবেশ– এই পাঁচটিকে ক্লেশ বলা হয়।" এর মধ্যে প্রথম চারিটির উৎপত্তি একমাত্র অবিদ্যা থেকে হয়। সংসারের সমস্ত ক্লেশের মূলে রয়েছে এই পাঁচটি হেতু। অজ্ঞানজনিত এই পঞ্চক্লেশের জন্য মনুষ্য পরিণাম ভুলে গিয়ে পাপ করে থাকে।

সংক্ষেপে এই পাঁচটির ব্যখ্যা হল এই –

(১) অবিদ্যা – যার ফলে অনিত্যের মধ্যে নিত্য বুদ্ধি, অশুচির মধ্যে শুচি বুদ্ধি, দুঃখের মধ্যে সুখ-বুদ্ধি এবং অনাত্মার মধ্যে আত্ম-বুদ্ধি রূপ বিপরীত জ্ঞান হয়ে থাকে।

(২) অস্মিতা – অহংকার অর্থাৎ "আমি" ভাবকে অস্মিতা বলা হয়, যা হল সমস্ত বন্ধনের হেতু।

(৩) রাগ – আসক্তির এক নাম হল রাগ, এর দ্বারা মনুষ্য পাপে প্রবৃত্ত হয়।

(৪) দ্বেষ – মনের বিরুদ্ধে হওয়া কার্য্যের ফলে ভিতরে যে ভাবের উদয় হয় উহাকে দ্বেষ বলা হয়।

(৬) আসক্তি – দ্বেষ রূপী বীজের ফলে কাম-ক্রোধরূপী ভয়ানক অনর্থকারী বৃক্ষের উৎপত্তি হয়ে থাকে।

(৭) অভিনিবেশ – মৃত্যুভয়কে অভিনিবেশ বলে।

অর্জুনও ভগবানকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে–

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পূরুষঃ ।

অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ (গীতা ৩/৩৬)

"হে কৃষ্ণ ! তাহলে এই পূরুষ বলপূর্বক নিযুক্ত সদৃশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাহাদ্বারা প্রযুক্ত হয়ে পাপ আচরণ করে।"

এর উত্তরে ভগবান বলেছেন যে –

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণসমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ (গীতা ৩/৩৭)

"রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এই কাম-ই ক্রোধ । ইহাই মহা অশন অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় ভোগে অতৃপ্ত অত্যন্ত পাপী, এ বিষয়ে ইহাকেই তুমি শত্রু জান ।" এই কামরূপ শত্রুর নিবাস স্থান হল ইন্দ্রিয়–সমূহ, মন এবং বুদ্ধিতে । এই মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয় দ্বারাই জ্ঞানকে আচ্ছাদিত করে ইহা জীবাত্মাকে মূঢ় করে রেখেছে । অতএব এদের বশীভূত করে জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিনাশকারী এই পাপী কামকে মেরে ফেলা উচিত । কেননা কুকর্ম, অজ্ঞান–অবিদ্যাজনিত আসক্তি কিংবা কামনার ফলে হয়ে থাকে । এদের দ্বারা বশীভূত না হয়ে ভগবানের দেওয়া অধিকার অনুযায়ী যে পরিচালিত হয়, সে এখানে সর্বতোভাবে সুখী হয়ে, অবশেষে পরম সুখরূপ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হয় ।

কাজেই এটা প্রমাণিত হল যে মনুষ্য কর্ম করার ক্ষেত্রে পরতন্ত্র, কিন্তু ঈশ্বর প্রদত্ত স্বতন্ত্রতার ফলে কিছু অংশে স্বতন্ত্রও রয়েছে ।
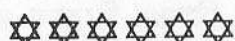
কর্মের রহস্য

জনৈক ব্যক্তি জানতে চেয়েছেন যে,"এটা যখন নিশ্চিত যে আমরা নিজেরই কৃত ফল ভোগ করে থাকি, কৃতকর্ম অনুযায়ী-ই আমাদের বুদ্ধি ভাল বা খারাপ হয়, তাহলে আমরা ইহা কিরূপে বলতে পারি যে, মনুষ্য কিছুই করতে পারে না, যা কিছুই করা হয়, সবই ঈশ্বর করে থাকে। আমাদের কর্মের ফলকে ঈশ্বর যখন কম বা বেশী করতে পারে না, তাহলে আমরা ঈশ্বরের ভজনা কেন করব ?"

এতে কোন সন্দেহ নেই যে, মনুষ্য নিজের কর্ম অনুসারে ফল ভোগ করে থাকে এবং প্রায়ই কর্ম অনুযায়ী তাঁর বুদ্ধি হয়ে থাকে। এটাও ঠিক যে কর্ম অনুযায়ী তৈরী হওয়া স্বভাব অনুসারে ঈশ্বরীয় প্রেরণার ফলেই মনুষ্য কোনও ক্রিয়া করতে সমর্থ হয়ে থাকে। ঈশ্বরীয় সত্ত্বা, শক্তি, চেতনা, স্ফুর্তি এবং প্রেরণার অভাবে ক্রিয়া অসম্ভব। এই ন্যায়দ্বারা সমস্ত কিছুই ঈশ্বর করিয়ে থাকেন। এটাও যুক্তিযুক্ত সিদ্ধান্ত যে ঈশ্বর **"কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথা কর্ত্তুম"** সমর্থ হলেও কর্ম সমূহের ফলকে কম বা বেশী করেন না। এসব সত্ত্বেও ঈশ্বরের ভজনার খুবই আবশ্যকতা রয়েছে। এই বিষয়ের বিবেচনা করার পূর্বে "কর্ম কি ?" "তাঁর ভোগ কি ভাবে হয়ে থাকে", কর্মফল ভোগ করার ক্ষেত্রে মনুষ্য স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র", প্রভৃতি বিষয়ে কিছু ভেবে দেখার আবশ্যকতা রয়েছে।

শাস্ত্রকারগণ তিন প্রকারের কর্ম বলেছেন – (১) সঞ্চিত, (২) প্রারব্ধ এবং (৩) ক্রিয়মান। এখন এ সম্বন্ধে আলাদা আলাদা ভাবে বিবেচনা করা হচ্ছে।

সঞ্চিত

অনেক জন্মথেকে এখন পর্যন্ত সংগ্রহীত হওয়া কর্মকে সঞ্চিত কর্ম বলা হয়। মন, বানী এবং শরীরদ্বারা মনুষ্য যে কর্ম করে, যে পর্যন্ত

উহা ক্রিয়ারূপে থাকে উহাকে ক্রিয়মান বলা হয় এবং উহা সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তৎক্ষণাৎ উহা সঞ্চিত হয়ে যায় । যেমন একজন কৃষক চিরকাল থেকে কৃষিকার্য্য করে আসছে, জমিতে যে ফসল উৎপন্ন হয়, সে তাহা একটি গুদামে জমা করে রাখে । এভাবে অনেক বৎসরের বিভিন্ন ধরণের ফসল তার গুদামে মজুত রয়েছে, পুনরায় ফসল হলে, সেই নুতন ফসল আবার সেই গুদামে জমা হয় । এখানে কৃষিকার্য্য করা হল কর্ম এবং ফসলের দ্বারা ভরে যাওয়া গুদাম হল তার সঞ্চিত কর্ম । এইরূপ কর্ম করা হল ক্রিয়ামান কর্ম এবং তা সমাপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়রূপী বৃহৎ ভান্ডারে জমা হয়ে যাওয়া হল সঞ্চিত কর্ম। মনুষ্যের এই অপার সঞ্চিত কর্মরাশী সমূহের মধ্যে থেকে, পুণ্য-পাপের সুবৃহৎ স্তুপের মধ্যে থেকে কিছু কিছু অংশ নিয়ে যে শরীর তৈরী হয়, তার মধ্যে অর্থাৎ শরীরে ভোগদ্বারা বিনষ্ট হওয়া কর্মসমূহের অংশের নাম হল প্রারদ্ধ । এইরূপে যে পর্যন্ত সঞ্চিত অবশেষে থাকে, সেই পর্যন্ত প্রারব্ধ তৈরী হতে থাকে । যে পর্যন্ত এইরূপে অনেক জন্মার্জিত সঞ্চিত কর্মের সর্বথা বিনাশ না হয়, সে পর্যন্ত জীবের মুক্তি হতে পারে না । সঞ্চিতের ফলে স্ফুরণা, স্ফুরণার ফলে ক্রিয়মান, ক্রিয়মানের ফলে পুণঃ সঞ্চিত এবং সঞ্চিতের অংশে প্রারব্ধ । এই প্রকারে কর্মপ্রবাহে জীব অনবরত আবর্ত্তিত হতে থাকে । সঞ্চিত অনুযায়ী-ই বুদ্ধির বৃত্তি উদয় হয়ে থাকে অর্থাৎ সঞ্চিতের ফলে সেই অনুযায়ী হৃদয়ে কর্মসমূহের জন্য প্রেরণা হয়ে থাকে । সাত্ত্বিক, রাজস অথবা তামসের স্ফুরণা কিংবা কর্মপ্রেরণার প্রধান কারণ হল একমাত্র সঞ্চিত । এখানে ইহা জেনে নেওয়া উচিত যে, সঞ্চিত কেবলমাত্র প্রেরণা করে থাকে, সেই অনুসারে কর্ম করার জন্য মনুষ্যকে বাধ্য করতে পারে না । কর্ম করার ক্ষেত্রে বর্তমান সময়ের কর্ম-ই যাহাকে পুরুষার্থ বলা হয়, প্রধান কারণ । পুরুষার্থ যদি সঞ্চিতের অনুকূল হয় তাহলে তা সঞ্চিত দ্বারা উৎপন্ন হওয়া কর্ম প্রেরণায় সহায়ক হয়ে, সেইরূপ কর্ম করিয়ে দেয়, যদি প্রতিকূল হয় তাহলে সেই প্রেরণাকে আটকে দেয় । যেমন ধরুন, কারও মনে খারাপ সঞ্চিতের ফলে চুরি করবার স্ফুরণা হল, অন্যের অর্থের

মানুষ সুখী হয়ে থাকে । পুত্রের মৃত্যুর ফলে রোদনকারী মনুষ্যের মুখমন্ডলেও চিত্তবৃত্তির পরিবর্তনের ফলে ক্ষণিকের জন্য হাসির চিহ্ন দেখা যায় । এটিও প্রারব্ধের ভোগ ।

প্রারব্ধ ভোগের আরও একটি শ্রেনী হল সুখ-দুঃখরূপ ইষ্ট অনিষ্ট বস্তুর প্রাপ্ত হওয়া । সুখ-দুঃখরূপ প্রারব্ধের ভোগ তিন ভাবে হয়ে থাকে, যাকে অনিচ্ছা, পরেচ্ছা এবং স্বেচ্ছা প্রারব্ধ বলা হয় ।

অনিচ্ছা – পথে চলার সময় কোনও বাড়ির দেওয়াল ভেঙ্গে গায়ে পড়া, বাজ (বিদ্যুত) পড়া, বৃক্ষ ভেঙ্গে পড়া, হঠাৎ ঘরের ছাদ ভেঙ্গে পড়া, অকস্মাৎ হাত দ্বারা বন্দুকের গুলি বেরিয়ে আক্রান্ত হওয়া প্রভৃতি দুঃখরূপ এবং পথে চলতে চলতে হঠাৎ মণি-মাণিক্য পাওয়া, লাঙ্গল দেওয়ার সময় হঠাৎ জমিতে পোতা অর্থ লাভ হওয়া প্রভৃতি সুখরূপ ভোগ-যা প্রাপ্ত করার জন্য মনে কোন ইচ্ছা ছিল না এবং অন্য কারও কোন ইচ্ছা ছিল না, এইরূপে অনায়াসে দৈবযোগে নিজে থেকে সুখ-দুঃখরুপ ভোগের প্রাপ্ত হওয়াকে অনিচ্ছা প্রারব্ধ বলা হয় ।

পরেচ্ছা – ঘুমন্ত মানুষের উপরে চোর-ডাকাতের দ্বারা আক্রমন হওয়া, জেনে শুনে কারও দ্বারা কষ্ট দেওয়া প্রভৃতি দুঃখরূপ এবং কুমার্গে গমনকারীর হাত ধরে কোনও সৎপুরুষের দ্বারা রক্ষা করা, কুপথ্য গ্রহণকারীর হাত ধরে কোনও কবিরাজ বা ডাক্তার দ্বারা তা না করতে দেওয়া, কোনও ইচ্ছা না থাকলেও অন্যের দ্বারা অর্থ লাভ করা প্রভৃতি সুখরূপী ভোগ–যা অন্যের ইচ্ছায় প্রাপ্ত হয়, তাকে পরেচ্ছা প্রারব্ধ বলা হয় । এখানে এই কথাটি বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে-একজনকে যদি কেউ আঘাত করে অথবা যদি কোন ব্যক্তি কারও ঘরে চুরি করে তবে এক্ষেত্রে তাঁর আঘাত প্রাপ্ত হওয়া কিংবা চুরি হওয়া এগুলি হল তাঁর প্রারব্ধের ভোগ কিন্তু যে আঘাত হেনেছে অথবা চুরি করেছে, সে অবশ্যই নবীন কর্ম করছে, এর ফল তাকে পরে গিয়ে ভোগ করতে হবে । কেননা কোনও কর্মের ভোগের হেতু পূর্ব থেকে নিশ্চিত করা হয় না, যদি হেতু নিশ্চিত করা হয়ে থাকে এবং যদি এরূপ বিধান (নিয়ম) করা হয় যে অমুক ব্যক্তি অমুক ব্যক্তির গৃহে চুরি করবে, অমুক

ব্যক্তিকে আঘাত করবে, তাহলে এই সকল ব্যক্তিগণ নির্দোশ বলে প্রমাণিত হন, কেননা তাঁরা ঈশ্বরের বিধানের দ্বারা চুরি, ডাকাতি প্রভৃতি করে থাকেন। যদি তাই হয় তাহলে এই সকল ব্যক্তির জন্য শাস্ত্রে দন্ডবিধান এবং এই সকল কর্মসমূহের ফলভোগের ব্যবস্থা কেন থাকবে ?

কাজেই এটা স্বীকার করতে হবে যে ফলভোগের সকল হেতু (নিমিত্ত) পূর্ব থেকে নিশ্চিত করা থাকে না। যে ক্রিয়ায় কোন অন্যায় বা স্বার্থ থাকে, যা আসক্তিপূর্বক করা হয়, সেই ক্রিয়াকে অবশ্যই নবীন বলা হয়। অবশ্য যদি ঈশ্বর কোন ব্যক্তি বিশেষকে কারও জীবননাশে হেতু করতে চান, তাহলে তিনি ফাঁসী দন্ডপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে ফাঁসীকাঠে ঝোলানোর মত ন্যায়যুক্ত কর্মে নিযুক্ত জল্লাদের ন্যায় কাহাকেও হেতু করতে পারেন। হতে পারে যার ফাঁসী হচ্ছে সেই ব্যক্তি, যে তাকে ফাঁষী দিচ্ছে তাকে পূর্বের কোন জন্মে জীবননাশ করে থাকতে পারে অথবা এটাও হতে পারে যে, তার সঙ্গে তাঁর কোন সম্বন্ধই নেই এবং সে শুধু ন্যায়যুক্ত কর্ম করছে।

স্বেচ্ছা – ঋতুকালে ভার্য্যাগমনাদি দ্বারা সুখ প্রাপ্ত হওয়া, এর ফলে সন্তানের জন্ম হওয়া, না হওয়া অথবা মরে যাওয়া, ন্যায়যুক্ত ব্যবসায়ে কষ্ট স্বীকার করা, এর দ্বারা অর্থ উপার্জন হওয়া, না হওয়া কিংবা হবার পর নষ্ট হয়ে যাওয়া প্রভৃতি হল স্বেচ্ছা প্রারব্ধ। এই সকল কর্ম করবার জন্য যে প্রেরণামূলক বাসনা হয়, তাঁর কারণ হল প্রারব্ধ। তদনন্তর ক্রিয়া হয়ে থাকে। ত্রিয়ার সিদ্ধ হওয়া অথবা না হওয়া হল সুকৃত-দুস্কৃত কর্মের ফল।

স্বেচ্ছা প্রারব্ধের ভোগসমূহের কারণ জানা এক অতি কঠিন জিনিষ। অতিশয় সুক্ষ্ম বিচার এবং বিভিন্ন তর্কের আশ্রয় গ্রহণ করেও নিশ্চিন্তরুপে এটা বলা খুবই কঠিন যে অমুক ফলভোগ আমার পূর্বজন্মকৃত অমুক কর্মের ভোগ যা সেই কর্মের প্রেরণার ফলে ঘটেছে অথবা এই জন্মেরই কর্ম তৎক্ষণাৎ সঞ্চিত থেকে প্রারব্ধ হয়ে এতে কারণ হয়েছে।

একজন মনুষ্য পুত্র প্রাপ্তির জন্য পুত্রেষ্টি অথবা অর্থলাভের জন্য কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান করেছে। তদনন্তর তাঁর পুত্র বা অর্থপ্রাপ্তি ঘটল। এই পুত্র অথবা অর্থ প্রাপ্তি বর্তমানের যজ্ঞের ফলে হয়েছে না পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলে হয়েছে, এর যথার্থ নির্ণয় করা কঠিন। হতে পারে যে পুত্র, অর্থ পূর্বজন্মকৃত কর্মের ফলরূপে পাওয়া গেছে এবং বর্তমান যজ্ঞের ফল ভবিষ্যতে পাওয়া যেতে পারে অথবা ক্রিয়াবৈগুণ্যের ফলে তাঁর ফল নষ্ট হয়ে থাকতে পারে। জনৈক ব্যক্তি রোগ নিবৃত্তির জন্য ঔষুধের সেবন করে, সে আরোগ্য লাভ করে, এর দ্বারা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হওয়া কঠিন যে এটা সেই ঔষধের ফলে হয়েছে অথবা ভোগ সমাপ্ত হওয়ার ফলে স্বত "কাকতালীয়" ন্যায়বৎ হয়েছে।* তথাপি ইহা অবশ্যই বুঝা উচিৎ যে যাহাই হোক না কেন, এগুলি স্বেচ্ছাকৃত কর্মের প্রারব্ধের ফল। কর্মের ফলভোগ বর্তমানে হোক কিংবা ভবিষ্যতে হোক, ইহা কোন নিয়ত ভাবে হয় না, সর্বথা ঈশ্বরের অধীন, এতে জীব সম্পূর্ণভাবে পরতন্ত্র। এই জন্মে পাপ কার্য্যকারী ব্যক্তিগণ অর্থ, পুত্র, সম্মান প্রভৃতি দ্বারা সুখী বলে মনে হয় (যদিও তাদের মধ্যে অনেকের অতি ভয়ানক মানসিক দুঃখ থেকে থাকে, যা আমাদের অজানা) এবং পূণ্য কার্য্যকারী ব্যক্তিগণ সাংসারিক বস্তু সমূহের অভাবের ফলে দুঃখী বলে মনে হয় (তাদের মধ্যে অনেকেই মানসিকরূপে সুখী থাকেন) যার ফলে পাপ-পূণ্যের ফল নিয়ে লোকের মনে সন্দেহ জাগে। এ ক্ষেত্রে এরূপ মেনে নেওয়া উচিত যে তাদের বর্তমানে খারাপ-ভাল-কর্মের ফল পরে ভূগতে হবে এবং এক্ষণে পূর্বজন্মকৃত কর্মের খারাপ ভাল কর্মের ফল বর্তমানে ভোগা হচ্ছে।

---

* রোগ পূর্বকৃত পাপের ফলেও হয় এবং বর্তমান সময়ের কুপথ্য প্রভৃতি সেবনাদির ফলেও হয়। কুপথ্য-প্রভৃতির ফলে হওয়া রোগ প্রায় ক্ষেত্রেই ঔষধের সেবন করলে নষ্ট হয়ে যায়, কিন্তু কর্মজন্য রোগ ভোগ সমাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত দূর হয় না, কিন্তু এর নির্ণয় করা কঠিন যে কোন রোগটি কর্মজন্য এবং কোনটি কুপথ্যজন্য। কাজেই সকল রোগে ঔষধ সেবন করা উচিত।

বলা হয়ে থাকে যে, যে কর্ম অধিক শক্তিশালী তাঁর ফল তৎক্ষণাৎ হয় এবং যা সাধারণ তাঁর ফল বিলম্বে হয়, কিন্তু এরূপ মনে হয় যে এই নিয়মও সর্বক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। অতএব এখানে ইহাই বলতে বাধ্য যে ত্রিকালদর্শী জগন্নিয়ন্তা পরমাত্মা ছাড়া, তর্ক-যুক্তির জোরে মনুষ্য স্বেচ্ছা প্রারব্ধ সমন্ধে কোন নির্ণয় করতে পারে না। কর্ম এবং কর্ম ফলের নিয়ন্ত্রণকারী যোগী ঈশ্বরকৃপার ফলে নিজের যোগশক্তিদ্বারা যৎকিঞ্চিৎ জানতে পারেন।

ক্রিয়মান – নিজের ইচ্ছায় যে সমস্ত ভাল-মন্দ নবীন কর্ম করা হয়ে থাকে, উহাকে ক্রিয়মান বলা হয়। ক্রিয়মান কর্মে প্রধান হেতু হল সঞ্চিত, কোথাও কোথাও নিজের বা পরের প্রারব্ধও হেতু হয়ে থাকে। ক্রিয়মান কর্মে মনুষ্য ঈশ্বরের নিয়মে আবদ্ধ থাকলেও ক্রিয়া করার ক্ষেত্রে সে প্রায়শ স্বতন্ত্র। নিয়মের পালন করা বা না করা হল তাঁর অধীকার। সেইজন্য সে ফলভোগ করার জন্য বাধ্য হয়ে থাকে।

যদি কেউ এরূপ বলে যে আমার দ্বারা যা ভাল-মন্দ কর্ম করা হচ্ছে, সে সবই ঈশ্বরেচ্ছা বা পারব্ধবশে হচ্ছে তবে তাঁর এরূপ বলা ভ্রান্তিমূলক। পাপ-পূণ্য করাবার পিছনে ঈশ্বর কিংবা প্রারব্ধকে হেতু মানলে প্রধানতঃ চারটি দোষ পরিলক্ষিত হয় যা নির্বিকার, নিরপেক্ষ, সমদর্শী, দয়ালু, ন্যায়কারী এবং উদাসীন ঈশ্বরের ক্ষেত্রে সর্বথা অনুপযুক্ত –

(১) যখন ঈশ্বর কিংবা প্রারব্ধ-ই ভাল-মন্দ করিয়ে থাকে তাহলে বিধি-নিষেধের নির্দেশকারী শাস্ত্রসমূহের কি আবশ্যকনা ? "সত্যং বদ, ধর্মং চর (তৈত্রিয় ১/১১/১), "মাতৃদেবো ভব", "পিতৃদেবো ভব", আচার্য্যদেবো ভব", (তৈত্রিয় ১/১১/২), এবং "সুরাং ন পিবেৎ", পরদারান্নাভি গচ্ছেৎ" প্রভৃতি বিধি-নিয়ম যুক্ত বাক্যের উল্লঙ্ঘন করে খুসীমত যথেচ্ছাচারি পাপপরায়ণ ব্যক্তি অনায়াসে এটা বলতে পারে যে আমরা তো প্রারব্ধের নিয়ন্ত্রকর্তা ঈশ্বরের প্রেরণায় এরূপ করছি। অতএব ঈশ্বরের উপরের শাস্ত্র-হননের দোষ প্রযোজ্য হয়।

(২) যখন ঈশ্বরই সর্ব প্রকারের কর্ম করিয়ে থাকেন, তাহলে সেই কর্মসমূহের ফল সুখ দুঃখ আমাদের কেন হবে ? যে ঈশ্বর কর্ম করিয়ে থাকেন তাকেই ফল ভোগের দায়িত্ব স্বীকার করা উচিত। এরূপ না করে সেই ঈশ্বর নিজের দোষ অপরের ঘাড়ে চাপাবার দোষে দোষী প্রমাণীত হন।

(৩) ঈশ্বর ন্যায়কারী এবং দয়ালু – এটা দোষযুক্ত হয়, কেননা কোনও ন্যায়কর্তা পাপের দন্ডবিধান করতে গিয়ে পুণরায় পাপ করবার ব্যবস্থা (বিধান) করতে পারেন না। যদি পাপ করবার ব্যবস্থা করে থাকেন তাহলে পাপীগণের জন্য পূণরায় দন্ড দেবার ব্যবস্থা করা অন্যায় প্রমাণিত হয়। উপরন্তু যদি ঈশ্বরই পাপ করিয়ে থাকেন–পাপে হেতু হন এবং দন্ডও দিয়ে থাকেন তাহলে তো তিনি অন্যায়ী হবার সঙ্গে সঙ্গে নির্দয়ী প্রমাণিত হন।

(৪) ঈশ্বরই যখন পাপীর জন্য পুণঃ পাপ করবার বিধান করেন তাহলে তো জীবর কখনও পাপ থেকে মুক্ত হবার কোন পথ থাকে না। পাপের ফল পাপ, তার ফলে পুণঃ পাপ, এই ভাবে জীব শুধু পাপ কার্য্যেই প্রবৃত্ত হতে বাধ্য থাকবে, ফলে প্রথমতঃ অব্যবস্থার দোষ এবং দ্বিতীয়তঃ ঈশ্বর জীবসমূহকে পাপবন্ধনে রাখতে চায়–এই দোষ হয়।

অতএব ঈশ্বর পাপ পূণ্য করিয়ে থাকেন–এরূপ স্বীকার করা ঠিক নয়, পাপ কর্মের জন্য তো ঈশ্বরের কখনও প্রেরণা হতে পারে না, পূণ্য কার্য্যের জন্য – সৎকর্মের জন্য ঈশ্বরের আদেশ রয়েছে, কিন্তু তা পালন করা, না করা বা বিপরীত আচরণ করা আমাদের অধিকারে রয়েছে। সরকারী অফিসার আইন অনুযায়ী পরিচালিত হয়ে প্রজা সংরক্ষণের অধিকারী কিন্তু ক্ষমতা পেয়ে তার সদুপয়োগ কিংবা দুরুপযোগ করা হল তাঁর অধিকার; যদিও আইন অনুযায়ী তাঁর ক্ষমতা নির্দিষ্ট রয়েছে এবং আইন ভাঙ্গলে দন্ড পাবার পাত্র হয়, সেইরূপে কর্ম করার ক্ষেত্রে মানুষের অধিকার প্রযোজ্য হয়ে থাকে।*

* এই বিষয়টি বিশেষভাবে 'মানুষ কর্ম করার ক্ষেত্রে স্বতন্ত্র না পরতন্ত্র' নিবন্ধে বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে দেখা উচিত।

ঈশ্বর সাধারণভাবে সৎ–মার্গের নিত্য–প্রেরক হওয়ার ফলে জীবের কল্যাণে সাহার্য্যকারী হন। পাপ–কর্ম হওয়ায় পিছনে প্রধান হেতু হল নিরন্তর বিষয়-চিন্তন, এর ফলেই রজোগুণসমুদ্ভূত কামের উৎপত্তি হয়, সেই কাম থেকেই ক্রোধ প্রভৃতি দোষ উৎপন্ন হয়ে জীবের অধোগতিতে কারণ হয়ে থাকে। ভগবান বলেছেন –

ধ্যায়তো বিষয়ান্ পুংসঃ সঙ্গস্তেষূপজায়তে।
সঙ্গাৎ সংজায়তে কামঃ কামাৎ ক্রোধোঽভিজায়তে॥
ক্রোধাদ্ভবতি সম্মোহঃ সম্মোহাৎ স্মৃতিবিভ্রমঃ।
স্মৃতিভ্রংশাদ্বুদ্ধিনাশো বুদ্ধিনাশাৎ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ২/৬২–৬৩)

"বিষয় চিন্তাকারী পুরুষের সেই সেই বিষয়ে আসক্তি উৎপন্ন হয় এবং আসক্তি হইতে সেই সেই বিষয়ের কামনা উৎপন্ন হয়, কামনায় বিঘ্ন হলে ক্রোধ উৎপন্ন হয়, ক্রোধ হইতে অবিবেক অর্থাৎ মূঢ়ভাব উৎপন্ন হয় এবং অবিবেক হইতে স্মরণ শক্তি ভ্রংষ্ট হয় এবং স্মৃতি নাশ হইতে বুদ্ধি অর্থাৎ জ্ঞানশক্তির নাশ হইয়া যায় এবং বুদ্ধিনাশ হওয়াতে ঐ পুরুষ স্বীয় শ্রেয় সাধন হইতে পতিত হয়।"

এতে ইহা প্রমাণিত হল যে, পাপকর্ম হওয়ার পিছনে বিষয়চিন্তন জনিত-রাগ অর্থাৎ আসক্তিই হল প্রধান কারণ, ঈশ্বর কিংবা প্রারব্ধ নয়। চিন্তন বা স্ফুরণা ক্রিয়মান অনুসারে–নবীন কর্মের নবীন সঞ্চিত অনুসারে প্রথমে হয়ে থাকে। অতএব পাপকার্য্য থেকে বাঁচাবার জন্য নবীন শুভকর্ম করার আবশ্যকতা রয়েছে, নবীন শুভকর্মের ফলে শুভসঞ্চিত হয়ে শুভ চিন্তন হবে, যার ফলে শুভকর্ম করাতে এবং অশুভ কর্ম না করাতে সহায়তা পাওয়া যাবে। সেইজন্য অর্জুনের প্রশ্নের উত্তর দেবার সময় ভগবান পুরুষার্থ দ্বারা পাপকর্মের মূল রাগময় (আসক্তিময়) রজোগুণ থেকে উৎপন্ন কামকে নাশ করবার জন্য আদেশ দিয়েছেন। অর্জুন ভগবানকে জিজ্ঞাসা করলেন যে–

অথ কেন প্রযুক্তোহয়ং পাপং চরতি পুরুষঃ ।
অনিচ্ছন্নপি বার্ষ্ণেয় বলাদিব নিয়োজিতঃ ॥ (গীতা ৩/৩৬)

"হে কৃষ্ণ তাহলে এই পুরুষ বলপূর্বক নিযুক্ত সদৃশ অনিচ্ছাসত্ত্বেও কাহার দ্বারা প্রযুক্ত হয়ে পাপ আচরণ করে ।"

এর উত্তরে ভগবান বলিলেন যে –

কাম এষ ক্রোধ এষ রজোগুণ সমুদ্ভবঃ ।
মহাশনো মহাপাপ্মা বিদ্ধ্যেনমিহ বৈরিণম্ ॥ (গীতা ৩/৩৭)

"হে অর্জুন ! রজোগুণ হইতে উৎপন্ন এই কাম-ই হল ক্রোধ, ইহা (ই) মহা অশন অর্থাৎ অগ্নির ন্যায় ভোগে অতৃপ্ত এবং অত্যন্ত পাপী, এ বিষয়ে ইহাকে (ই) তুমি শত্রু জান ।"

এর পরের বর্ণনায় তুলনাত্মকরূপে ভগবান বলছেন যে ধূমদ্বারা অগ্নি, ময়লাদ্বারা দর্পণ এবং জরায়ুদ্বারা যেরূপ গর্ভ আবৃত থাকে তদনুরূপভাবে জ্ঞানকে আবৃতকারী এই কামের নিবাশস্থান হল মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়সমূহ । এই ইন্দ্রিয়সমূহকে বশীভূত করে জ্ঞান–বিজ্ঞাননাশক পাপী কামকে মেরে ফেলার জন্য তিনি আদেশ দিয়েছেন । যদি কাম জয় করতে জীব সমর্থ না হত, তাহলে ভগবানের দিক থেকে জীবের প্রতি এরূপ আদেশ দেওয়া সম্ভব হত না । অতএব ভগবানের আজ্ঞানুসারে শুভকর্ম, শুভসংগতি করলে ক্রিয়মান (কর্ম) শুদ্ধ হয় । এই ক্রিয়মান-ই হল সঞ্চিত এবং প্রারব্ধের হেতুভূত । কাজেই মনুষ্যের উচিত যে সে যেন ক্রিয়মান (কর্ম) শুভ করার চেষ্টা করে, কেননা ইহা করার ক্ষেত্রে সে স্বতন্ত্র ।

ত্রিবিধ কর্মের ভোগ করা ব্যতিত উহা বিনষ্ট হয় কি না ?

এখন ইহা বুঝে নেওয়া আবশ্যক যে উপর্যুক্ত তিন প্রকারের কর্মের ফলভোগ করা হলেই তা নাশ হয়, না এদের নাশ করার অন্য কোনও উপায় আছে ? এদের মধ্যে প্রারব্ধ কর্মের নাশ তো ভোগ দ্বারাই হয়ে থাকে, আপ্তপুরুষের বাক্য যেমন ব্যর্থ হয় না, সেইরূপ প্রারব্ধ কর্মের ফল না ভুগলে উহা নাশ হতে পারে না । এই ভোগ

পূর্বোক্ত অনিচ্ছা, পরেচ্ছা বা স্বেচ্ছাতেও হতে পারে এবং প্রায়শ্চিত্ত দ্বারাও হতে পারে। সেবা এবং দন্ডভোগ–দুইটি-ই হল এ থেকে মুক্ত হবার উপায়। সঞ্চিত এবং ক্রিয়মান কর্মের বিনাশ হয় নিস্কাম ভাব নিয়ে করা যজ্ঞ, দান, তপ, সেবা প্রভৃতির দ্বারা এবং প্রাণায়াম, শ্রবণ, মনন, নিদিধ্যাসন (সৎসঙ্গ, ভজন, ধ্যান) প্রভৃতি পরমেশ্বরের উপাসনার দ্বারা। এর ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে জ্ঞান উৎপন্ন হয় এবং এর ফলে সঞ্চিত তো যেরূপে শুস্ক ঘাস অগ্নির সংযোগ ভস্মীভূত হয় সেরূপে ভস্মিভূত হয়* এবং কোন স্বার্থ না থাকার ফলে কোনও সাংসারিক পদার্থের কামনা এবং কর্ম করার আসক্তি তথা অহংবুদ্ধি না থাকার ফলে সকাম নবীন কর্ম হতে পারে না।

উত্তম কর্মসমূহ থেকে নিস্তার পাওয়া তো খুবই সহজ, তা ভগবানকে অর্পণ করামাত্রেই নিস্তার পাওয়া সম্ভব। যেমন, এক ব্যক্তি অপর এক ব্যক্তিকে কিছু অর্থ ঋণরূপে দিয়ে রেখেছে। তাঁর কাছ থেকে অর্থ ফিরিয়ে নেওয়া- ফিরিয়ে নেবার ইচ্ছার হৃদয় থেকে ত্যাগ করলে সে এ থেকে মুক্ত হতে পারে। "এই অর্থের স্বত্তঃ ত্যাগ করিলাম"– এভাবে ত্যাগ করলেই সে মুক্ত হয়। কিন্তু যাকে অর্থ ফেরত করতে হবে, সে এভাবে ছাড়া (মুক্ত) পেতে পারে না। এইরূপে যে সকল পাপ কর্মের জন্য আমাদের দন্ডভাগ করতে হবে, শুধুমাত্র "আমরা এই দন্ডভোগ করতে চাই না" এরূপ বললেই রেহাই পাওয়া যাবে না। এরজন্য তো হয় দন্ডভোগ করতে হবে অথবা নিস্কাম কর্ম এবং নিস্কাম উপাসনা প্রভৃতি করতে হবে।

কৃত পাপ এবং সকাম পূণ্য কর্ম সমূহ একে অপরের দ্বারা বিনষ্ট হয় না, অর্থাৎ একের দ্বারা অপরের ফলভোগ হওয়া সম্ভব নয়।এই দুইয়ের জন্য আলাদা আলাদা ভাবে ফলভোগ করতে হয়। যেমন ধরুন শ্যামলালের কাছ থেকে রামলালের কিছু টাকা পাওয়া রয়েছে।

---

* যথৈধাংসি সমিদ্ধোহগ্নির্ভস্মসাৎ কুরুতেহর্জুন।
জ্ঞানাগ্নিঃ সর্বকর্মাণি ভস্মসাৎ কুরুতে তথা ॥ (গীতা ৪/৩৭)

শ্যামলাল তাকে টাকা ফিরিয়ে দেয়নি । ফলে একদিন রেগে গিয়ে রামলাল শ্যামলালকে জুতো পেটা করল । শ্যামলাল কোর্টে নালিশ জানাল । রামলাল জানাল যে "আমি শ্যামলালের কাছ্ থেকে ১০০০ টাকা পাব । আমি অবশ্যই একে জুতো দিয়ে দুবার আঘাত করেছি । আমার এই অপরাধের জরীমানা স্বরূপ যথোপযুক্ত অর্থ বাদ দিয়ে বাদবাকি টাকা ফিরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন।" তার কথা শুনে মেজিস্ট্রেট হেঁসে উঠলেন । তিনি বললেন যে এর জন্য দেওয়ানী কোর্টে আলাদা ভাবে মামলা করতে হবে । যদি তুমি টাকা ফেরৎ না পাও তাহলে দেওয়ানী কোর্টে মামলা করে তুমি একে জেলে পাঠাতে পারো, কিন্তু এখানে তো জুতো মারার জন্য তোমাকে আলাদা ভাবে দন্ড ভোগ করতে হবে ।" ঠিক এইভাবেই পাপ-পূণ্যের ফলভোগ আলাদা আলাদা ভাবে ভূগতে হয় । সকাম পূণ্য দ্বারা পাপের এবং পাপের দ্বারা সকাম পূণ্যের ফল একে অপরের দেওয়া নেওয়া হয় না ।

কর্মের ফল কে দেয় ?

কেউ কেউ স্বীকার করেন যে কর্মের ফল কর্ম অনুযায়ী আপনা আপনি হয়ে থাকে, এর নিয়ামক কোন ঈশ্বর নেই, এবং ঈশ্বরের কোন আবশ্যকতাও নেই । কিন্তু এরূপে মেনে নেওয়া ভূল । এরূপে স্বীকার করলে অনেক বাঁধার সৃষ্টি হয় এবং এটা যুক্তিসঙ্গত নয় । শুভাশুভ কর্মের বিভাগ করে তদনুসারে ফলের ব্যবস্থাদানকারী নিয়ামকের অভাবে কর্মের ভোগ হওয়া-ই সম্ভব নয় । কেননা জড় হওয়ার ফলে কর্ম নিয়ামক হতে পারে না, তারা তো শুধু হেতুমাত্র । এবং পাপকর্মকারী পুরুষ নিজে থেকে পাপের ফল দুঃখ ভোগ করতে চায় না, ইহা নির্বিবাদ এবং লোকপ্রসিদ্ধ । কোন লোক চুরি বা ডাকাতি করল । সেই চুরী বা ডাকাতি কর্ম জড় হওয়ায় তার জন্য দন্ডদানের ব্যবস্থা করতে পারে না, এবং সে নিজে দন্ড চায় না, সেইজন্য কোন শাসক বা রাজা তার জন্য দন্ডবিধানের ব্যবস্থা করে থাকে । এইরূপে কর্মের নিয়মন, বিভাগ এবং ব্যবস্থা করার জন্য কোনও নিয়ামক বা ব্যবস্থাপক ঈশ্বরের

আবশ্যকতা রয়েছে । এর মানে এই নয় যে রাজা এবং ঈশ্বরে সাদৃশ্য রয়েছে । রাজা সর্বান্তর্যামী এবং সর্বথা নিরপেক্ষ স্বভাবযুক্ত তথা স্বার্থহীন, নির্ভ্রান্ত না হওয়ার ফলে প্রমাদ, পক্ষপাত, অনভিজ্ঞতা বা স্বার্থের বশীভূত হয়ে অনুচিত ব্যবস্থাও করতে পারেন, কিন্তু সমদর্শী, সর্বান্তর্যামী, সুহৃদ, নিরপেক্ষ, দয়ালু এবং ন্যায়কারী হওয়ার ফলে ঈশ্বর দ্বারা কোন ভূল হতে পারে না । রাজা স্বার্থবশে ন্যায় করে থাকে, ঈশ্বর দয়ার ফলে জীবের উপকার করার জন্য ন্যায় করে । যদি বলা হয় যে, ঈশ্বরের যখন কোনও স্বার্থই নেই তাহলে তিনি নিজেকে ঝগড়ায় জড়ান কেন ? এর উত্তর এই যে ঈশ্বরের নিকটে এটা কোন ঝগড়া নয় । যেমন কোন সুহৃদ পুরুষ পক্ষপাতরহিত হয় অন্যের ঝগড়ার মিমাংসা করে থাকেন, কিন্তু নিজে মান-সম্মান, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কিছুই চান না, এর ফলে সংসারে তার গুরুত্ব বজায় থাকে । এইরূপে ঈশ্বর সমগ্র সংসারের হিতের জন্য নিঃস্বার্থরূপে নিজের সৌহার্দর জন্য-ই ন্যায় করে থাকেন ।

ঈশ্বর যদি নিয়ামক না হন তাহলে তো কর্মের ভোগই হতে পারে না । এক্ষেত্রে আরও একটি দিকের প্রতি বিশেষভাবে লক্ষ্য করা উচিত । একজন লোক এমন এমন পাপ করেছে যার ফলে তাঁর কুকুর যোনিতে জন্ম হওয়া উচিত । তাঁর কর্মসমূহ জড় হওয়ার ফলে তাকে সেই যোনি দিতে পারে না (কেননা বিবেকযুক্ত পুরুষের সাহায্য ছাড়া গাড়ী, রথ প্রভৃতি জড় যানবাহন নিজে নিজে যাত্রীসাধারণকে তাদের গন্তব্য স্থানে পৌছে দিতে পারে না) এবং যদি সে নিজে যেতে চায়, তবুও যেতে পারে না, কেননা তার মধ্যে এমন কোন শক্তি নেই । যখন আমরা সতর্ক অবস্থাতেও সর্বথা অপরিচিত স্থানে যেতে পারি না, তাহলে বিবেক ছাড়া যোনির পরিবর্তন করা অসম্ভব ।

যদি বলা হয় যে সেই সময়ে অজ্ঞানের পর্দা দূর হয়ে যায়, তাহলে ইহাও যুক্তিযুক্ত নয়, কেননা মৃত্যুকালে তো দুঃখ এবং মোহ-র আধিক্যের ফলে অধিকাংশ জীবের ভ্রান্তের ন্যায় অবস্থা হয় । যোগী বা জ্ঞানীর ন্যায় স্থিতি হয় না । যদি অজ্ঞানের পরদা সরে গিয়ে এমনিতেই

তাকে জীবন্মুক্ত বলে মেনে নেওয়া হয়, তাহলে ইহাও যুক্তিসঙ্গত নয়, কেননা ভোগ, প্রায়শ্চিত্ত বা উপাসনা ছাড়া পাপের বিনাশ হয়ে হঠাৎ করে কাহারও জীবন্মুক্ত হয়ে যাওয়া যুক্তিযুক্ত নয়। সাধারণ সাংসারিক জ্ঞানের দ্বারা যোনীপ্রবেশ প্রভৃতি ক্রিয়া সম্ভব নয় এবং প্রত্যক্ষ ভাবে দুঃখরূপ হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে অভিষ্ট নয় এবং এতে সে সমর্থও নয়। অতএব এটা প্রমাণীত হল যে কর্ম-অনুযায়ী ফলভোগ করাবার জন্য সৃষ্টির স্বামী নিয়ন্ত্রনকর্ত্তা ঈশ্বরের আবশ্যকতা রয়েছে এবং নিয়ন্ত্রনকর্ত্তা সেই ঈশ্বর অবশ্যই রয়েছেন।

ঈশ্বর-ভজনার আবশ্যকতা কেন ?

ইহা মেনে নেওয়া হল যে শুভাশুভ কর্ম অনুযায়ী ফলাফল ঈশ্বর-ই দিয়ে থাকেন এবং তিনি উহা কম-বেশীও করতে পারেন না, তাহলে তাঁর ভজনার কি আবশ্যকতা ? এবারে এই প্রশ্নে বিবেচনা করা হচ্ছে। প্রথমত ঈশ্বর-ভজনা হল একটি সর্বোত্তম উপাসনারূপ কর্ম, পরম সাধন, সর্বোচ্চ বস্তু। ইহা করলে সেই অনুযায়ী বুদ্ধিতে স্ফুরণা হয়, এবং স্ফুরণার ফলে বারংবার ঈশ্বরের-ভজন-স্মরণ হতে থাকে, ফলে অন্তঃকরণ শুদ্ধ হয়ে জ্ঞানের পরম দিব্য প্রকাশ জাগরিত হয়। জ্ঞানাগ্নি দ্বারা সঞ্চিত কর্মরাশি দগ্ধ হয়ে পূর্ণজন্ম গ্রহণের কারণ নষ্ট করে দেয়। কাজেই ভজনা করা পরম আবশ্যক।

দ্বিতীয়তঃ এটা জেনে নিয়েও ভজনা করা অবশ্যই প্রয়োজন যে ইহা আমাদের জীবনের পরম কর্ত্তব্য। নিজের কর্ত্তব্য মনে করে মানুষ মাতা-পিতার সেবা করে থাকে। উপরন্তু যিনি মাতা-পিতারও পরম পিতা, যিনি পরম সহৃদ , যিনি আমাদের সকল প্রকারের সুবিধা প্রদান করেছেন, যিনি নিরন্তর আমাদের উপরে অকারণ কৃপা করে রেখেছেন, কল্যাণকারী যে ঈশ্বরের কাছ থেকে আমরা নিত্য কল্যাণকারী আদেশ পেয়ে থাকি, যিনি আমাদের জীবনের জ্যোতি, অন্ধের হাতের লাঠি, নিমজ্জমান ব্যক্তির যিনি আশ্রয় এবং পথ ভ্রষ্ট নাবিকের যিনি একমাত্র

ধ্রুবতারা, তাঁকে স্মরণ করা আমাদের প্রারম্ভিক এবং অন্তিম একমাত্র কর্ত্তব্য।

ঈশ্বরের স্মরণ না করা একটি বড় কৃতঘ্নতা, আমরা যখন মাতা, পিতা কিংবা গুরুজনের উপকারের ঋণও শোধ করতে পারি না, তাহলে সেই পরম সুহৃদ, ঈশ্বরের উপকার কিভাবে শোধ করতে পারি ? কাজেই এক্ষেত্রে তাকে ভুলিয়ে দেওয়া অতিশয় কৃতঘ্নতা– নিচাতিনীচকর্ম।

ঈশ্বর সব কিছু করতে পারেন "কর্ত্তুমকর্ত্তুমন্যথাকর্ত্তুম", তিনি সমর্থ। কিন্তু তিনি তা করেন না, নিজের নিয়মের নিজে রক্ষা করে থাকেন; এবং পাপ থেকে ক্ষমা তথা পূণ্যকর্মের ফল পাবার জন্য আমাদেরও ভজনাকে কেন কাজে লাগানো উচিত ? ভজনার প্রতাপে পাপ নিজে থেকে নষ্ট হয়ে যায়, সূর্য্য উদয়ের আভাসমাত্রে অন্ধকার বিনষ্ট হয়।

জবহিঁ নাম মনমেঁ ধর্য্যো, ভয়ো পাপকো নাস।
জৈসে চিনগী আগকি, পরী পুরানে ঘাস॥

"শুকনো ঘাসের উপরে অগ্নি স্ফুলিঙ্গ পড়লে যেমন তা ভস্মীভূত হয়, তেমনি হৃদয়ে নাম ধারণ করলে সকল পাপ বিনষ্ট হয়।"

কিন্তু ভগবানের ভজনাকারির এই মনোভাব পোষণ করা উচিত নয় যে এই ভজনার দ্বারা পাপ বিনষ্ট হবে। ভগবানের রহস্য বোঝে এমন ভক্ত অপরাধ ক্ষমা করাবার জন্যও ভজনাকে কাজে লাগায় না। যে ঈশ্বর ভজনার দ্বারা মায়ারূপী সংসার নিজেই নষ্ট হয়ে যায়, এই রহস্য যে জানে সেই পুরুষ কি কখনও তুচ্ছ, সাংসারিক দুঃখের নিবৃত্তির জন্য ভজনাকে কাজে লাগাতে পারে ? যদি সে তা করে তবে সে খুবই ভুল করে। বন্ধুরূপে রাজাকে পেয়ে তার কাছে দশ টাকার নালিশ থেকে ছাড় পাবার প্রার্থনা করার ন্যায় অত্যন্ত হীন কার্য্য। সেইজন্য ভজনাকে কখনও সাংসারিক কাজের বিনিময়ে খরচ করা উচিত নয়, উপরন্তু কর্ত্তব্য মনে করে ঈশ্বর ভজনা সদা-সর্বদা করে যাওয়া উচিত। কেননা ভজনার আদি, মধ্য এবং অন্তে শুধুমাত্র কল্যাণ-ই ভরে রয়েছে।

****

মৃত্যু-কালে করণীয় কি ?

হিন্দু জাতিতে মনুষ্যের মৃত্যু-কালে ঘরের লোকজন তাঁর পরলোক সুধরাতে গিয়ে এমন কিছু কিছু কাজ করে ফেলে যার ফলে মৃত্যু পথযাত্রী সেই ব্যক্তির খুবই কষ্ট হয় । অতএব নিম্নলিখিত বিষয়ের প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখা উচিত ।

(১) রোগী যদি দু-তিন তলা উঁচু ঘরে থাকে তাহলে তাকে নিচে নামিয়ে আনার আবশ্যকতা নেই ।

(২) যদি খাটে শুয়ে থাকে, তাহলে সেখানেই রাখা উচিত ।

(৩) যদি খাটে মরা সম্বন্ধে মনে কোন খুঁত থেকে থাকে এবং নীচে নামিয়ে শোয়াবার আবশ্যকতা মনে হয় তাহলে অনুমান করে মৃত্যুর ২/৪ দিন আগেই তাকে খাট থেকে নামিয়ে বালু বিছিয়ে তার উপরে শুইয়ে দেওয়া উচিত । বালু যেন নরম হয়, যাতে তা তাঁর শরীরকে কষ্ট না দেয় । দুই চার দিন কিংবা দু চার প্রহর সম্বন্ধে ডাক্তার কবিরাজের কাছ থেকে, রোগীর চিহ্ন দেখে এবং ঘরের বৃদ্ধ অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের সঙ্গে আলোচনা করে আন্দাজ করে নিন । যদি রোগী সেরে ওঠে তাহলে পুনরায় খাটে শোয়ানোয় কোন আপত্তি নেই, যদি আন্দাজ মত সময়ের পূর্বেই রোগীর মৃত্যু হয় তাহলেও কোন ক্ষতি নেই, উপরন্তু মৃত্যু কালে খাঁট থেকে নীচে নামিয়ে শোয়ানোর কষ্ট থেকে সে বেচে গেল । যদি দুই চার দিন আগে রোগী বুঝতে পারে তাহলে তাঁর নিজে থেকেই নীচে শোয়াবার জন্য বলে দেওয়া উচিত ।

(৪) যদি মৃত্যুর পূর্বে রোগীর এমন অবস্থা থাকে যে স্নান করালে অযথা রোগীর কষ্ট বৃদ্ধি পারে, তাহলে স্নান করাবার আবশ্যকতা নেই ।

যদি মল প্রভৃতি পরিস্কার করবার প্রয়োজন হয় তাহলে গামছা ভিজিয়ে ধীরে ধীরে তা পরিস্কার করে দেওয়া উচিত।

(৫) এই অবস্থায় তুলসী, গঙ্গাজল দেওয়া অতি উত্তম, কিন্তু গিলতে যদি ক্লেশ হয় তাহলে তুলসীপাতা পিষে গঙ্গাজল মিশিয়ে রোগীকে দেওয়া উচিত। একবারে এক তোলার বেশী জল পান করানো উচিত নয়। পাঁচ দশ মিনিট পরে পুণরায় দেওয়া যেতে পারে। দীর্ঘদিন ধরে রাখার ফলে গঙ্গাজল যাতে বিস্বাদ না হয়ে পড়ে, স্বয়ং আগে চেখে নিয়ে তারপর রোগীকে দেওয়া উচিত। যদি জলে গন্ধ হয় বা তিক্ততা জন্মে তবে তা দেওয়া উচিত নয়। নূতন গঙ্গাজল অন্য কোথাও থেকে আনিয়ে নেওয়া উচিত। গঙ্গাজলে শুদ্ধি অশুদ্ধি বা স্পর্শা-স্পর্শের কোন বিধান নেই। যদি রোগী মুখ বন্ধ করে নেয়, তাহলে কোন কিছুই দেওয়া উচিত নয়।

(৬) রোগীর পাশে বসে ঘরের অভাব অভিযোগ নিয়ে চিন্তা করা ঠিক নয় এবং পরিবার পরিজনের কথাও তাকে মনে করাতে নেই। মা, স্ত্রী, পতি, পুত্র কিংবা অন্য কোন স্নেহের ব্যক্তিকে তাঁর নিকটে বসে নিজের দুঃখ বর্ণনা করা বা কান্নাকাটি করা উচিত নয়। তাঁর মনের অনুকূল সর্ব প্রকারে কল্যাণকারী সেবা করা উচিত।

(৭) ডাক্তারি বা যাতে অপবিত্র বস্তুর মিশ্রণ রয়েছে এমন ঔষধ দেওয়া উচিত নয়।

(৮) যে পর্যন্ত হুঁশ থাকে, গীতার পাঠ এবং তার অর্থ শোনানো উচিত। হুঁশ না থাকলে ভগবানের নাম শোনানো উচিত। যদি গীতা পঠনকারী না হয় তাহলে প্রারম্ভ থেকেই ভগবানের নাম শোনানো উচিত।

(৯) যদি রুগী ভগবানের সাকার বা নিরাকার কোনও রূপের প্রেমী হন, তাহলে সাকাররূপের প্রেমীকে ভগবানের ছবি বা মূর্ত্তি দেখানো উচিত এবং তাঁর রূপ ও প্রভাবের বর্ণনা করে শোনানো উচিত। নিরাকারের প্রেমীকে নিরাকার ব্রহ্মের শুদ্ধ, বোধস্বরূপ,

জ্ঞানস্বরূপ, সৎ, চিৎ, ঘন, নিত্য, অজ, অবিনাশ প্রভৃতি বিশেষণের সঙ্গে আনন্দ শব্দ যোগ করে তাকে শোনানো উচিত।

(১০) যদি কাশী প্রভৃতি তীর্থে নিয়ে যেতে হয় তাহলে তাকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া উচিত। যদি তাঁর ইচ্ছা থাকে, সেখানে পৌছানো নিয়ে সন্দেহ না থাকে, ডাক্তার কবিরাজ অনুমতি দেন এবং সেই পরিমাণ অর্থ খরচের সঙ্গতি থাকে তাহলে সেখানে নিয়ে যাওয়া উচিত।

(১১) প্রাণ বেরিয়ে যাবার পরও কমপক্ষে ১৫/২০ মিনিট কাহাকেও খবর করবেন না। ভগবানের নাম কীর্তন করে যাওয়া উচিত যাতে সেখানকার বায়ুমন্ডল সাত্বিক থাকে। কান্নাকাটির আওয়াজ যাতে না হয়, কেননা সেই সময়ের কান্নাকটি প্রাণীর পক্ষে ভাল নয়।

(১২) গৃহের বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের কান্নাকটি করা উচিত হয়। অন্য লোকদেরও তাদের নিকটে গিয়ে শুধু শুধু সহানুভূতির শব্দ বলে কাঁদাবার চেষ্টা করা উচিত নয়।

(১৩) শোক-চিহ্ন বার দিন পর্যন্ত-ই ধারণ করা উচিত।

(১৪) বার বছরের কম বয়সের ছেলে বা মেয়ের মৃত্যু হলে শোক পালন করা উচিত নয়।

(১৫) মৃতকের নিমিত্ত শোকসভা না করে নিজের সাবধানতার জন্য সভা-সমাবেশ করা উচিত। এটা মনে রাখা উচিত যে এভাবে একদিন আমার-ও মৃত্যু হবে।

(১৬) জীবন্মুক্ত পুরুষের মৃত্যুতে শোক করা উচিত নয়, এরূপ করা হল তাদের অপমান করা।

সমাপ্ত

॥ শ্রীহরিঃ ॥

গীতাপ্রেস, গোরক্ষপুর থেকে প্রকাশিত বাংলা গ্রন্থ-সমূহের সূচীপত্র